মাতৃবন্দনা

দেশাত্মবোধক সঙ্গীত ও কবিতার সঙ্কলন

(১৭৪১—১৯৪৭)

মুখবন্ধ

ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

ভূমিকা

ডক্টর শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
বিদ্যাবিনোদ, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণ-স্মৃত্যতীর্থ কর্তৃক
সঙ্কলিত ও সম্পাদিত

এস্. সি. সরকার এণ্ড সন্স (প্রাইভেট) লিমিটেড
১সি, কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা-১২

প্রকাশক : প্রভাসচন্দ্র সরকার
এস্. সি. সরকার এণ্ড সন্স (প্রাইভেট) লিমিটেড
১সি, কলেজ স্কোয়ার,
কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ
আশ্বিন, ১৩৬৭

প্রচ্ছদ : বিভূতি সেনগুপ্ত
ব্লক ও মুদ্রণ : রিপ্রোডাকসন
সিণ্ডিকেট
কলিকাতা-৬

মুদ্রাকর : বাণেশ্বর মুখোপাধ্যায
কালিকা প্রেস (প্রাইভেট) লিমিটেড
২৫, ডি. এল. রায় ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

মুখবন্ধ

দেশাত্মবোধ, ইংরেজীতে যাহাকে Patriotism বলে, তদ্দ্বারা অনুপ্রাণিত হইতে গেলে প্রথম আবশ্যক হইতেছে দেশের প্রতি ভালবাসা—দেশের জনসাধারণের প্রতি এবং দেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে একটা নাড়ীর টান অনুভব করা। 'আমাদের দেশ' আর পাঁচটা দেশের মত ভগবানের সৃষ্টি, এবং ভগবানের পক্ষপাতিতা কাহারও প্রতি নাই ; তথাপি, আমার দেশের কিছু-না-কিছু বৈশিষ্ট্য, কিছু-না-কিছু স্বাতন্ত্র্য, এবং আমার চোখে কিছু-না-কিছু সৌন্দর্য ও মহত্ত্ব নিশ্চয়ই তাহার আছে ; সেই সম্বন্ধে সচেতন হওয়া দেশাত্মবোধে দীক্ষিত হইবার প্রথম সোপান। যাঁহারা প্রাচীন ভারতের হিন্দু বা ব্রাহ্মণ্য সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, তাঁহারা এ সম্বন্ধে সাবহিত ছিলেন। বৈদিক যুগে, অথর্ববেদে যে পৃথিবী সূক্ত পাই, তাহাতে অপূর্ব সুন্দর ভাষায় পৃথিবীর নাম করিয়া মাতৃভূমির মনোহর প্রশস্তি আছে। মহাভারতকার কবিও ভারতের প্রশস্তি তাঁহার অমর মহাকাব্যে গাহিয়া গিয়াছেন। আমরা প্রাচীন ও মধ্যযুগে নিজ মাতৃভূমি ভারতবর্ষ ছাড়া অন্য দেশের কথা তেমন জানিতাম না, এবং সে সম্বন্ধে আমাদের সেই জন্য তেমন আগ্রহও ছিল না। ভারতবর্ষের মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব যে একটি বিরাট ও বিশ্বয়কর ব্যাপার, তাহা আমরা ধরিয়াই লইয়াছিলাম যে, এবং এ-বিষয়ে কোনও প্রশ্ন উঠিতে পারিত না।

তাহার পরে এক অখণ্ড সমগ্র ভারতের স্থলে বিভিন্ন প্রদেশের সম্বন্ধে আমাদের চেতনা জাগরিত হইল। ইহার প্রধান কারণ, বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ, এবং সেই-সমস্ত ভাষাকে অবলম্বন করিয়া স্থানীয় Patriotism বা দেশাত্মবোধ।

পূর্বে অখণ্ড ভারতের সংস্কৃতির বাহন একমাত্র সংস্কৃত-ভাষা সকলের নিকটে সম্মান পাইত, এবং সে সম্মান হইতে সংস্কৃত এখনও বঞ্চিত হয় নাই। প্রাচীন ভারতে যাহারা দ্রাবিড় বা

নিষাদ বা কিরাত ভাষা বলিত এবং যাহারা সংস্কৃতের দুহিতৃ-স্থানীয় নানা প্রকারের প্রাকৃত ভাষা বলিত, তাহারা সংস্কৃতের ছত্রচ্ছায়ায় মিলিত হইত, এবং ভারতবর্ষের একত্ব ও অখণ্ডত্ব স্বীকার করিত। কিন্তু দক্ষিণের প্রাচীন তমিল কবিরা নিজেদের ভাষা সম্বন্ধে প্রথম সচেত হইলেন, এবং প্রাচীন বাঙ্গালা, প্রাচীন কোশলী, প্রাচীন রাজস্থানী, প্রাচীন মারাঠী, প্রাচীন ব্রজভাষা, প্রাচীন মৈথিল প্রভৃতির উদ্ভবের সঙ্গে-সঙ্গেই, লোকে সেই সব ভাষার সম্বন্ধে এবং সেই ভাষাগুলির অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র ভারতের বিশেষ বিশেষ অংশ সম্বন্ধে একটু অধিক সচেতন হইতে লাগিল। ইহার ফলে, বিভিন্ন আধুনিক ভাষার প্রশস্তি প্রায় সহস্র বৎসর পূর্ব হইতে আমরা পাইতেছি। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিতে পারা যায় যে, এখন হইতে প্রায় ৯০০ বৎসর পূর্বে বাঙ্গালা দেশে এক অজ্ঞাতনামা কবি বাঙ্গালা-ভাষার এবং আনুষঙ্গিক রূপে বঙ্গভূমির গৌরব গাহিয়া গিয়াছেন—

"ঘনরসময়ী গম্ভীরা বক্রিমসুভগা উপজীবিতা কবিভিঃ।
অবগাঢ়া চ পুনীতে গঙ্গা বঙ্গালবাণী চ॥"

পরবর্তী কালে মুসলমান-শাসনের সময়ে তীর্থযাত্রা প্রভৃতি হিন্দু অনুষ্ঠানের সাহায্যে ভারতের একত্ব ও অখণ্ডত্ব সম্বন্ধে আমাদের বোধ জীয়াইয়া রাখিবার চেষ্টা আমরা করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু দেশ খণ্ড, ছিন্ন, ও বিক্ষিপ্ত থাকায়, সমগ্র ভারতের কল্পনা এবং তাহার রূপ আমরা ভুলিতে বসিয়াছিলাম। তাহার পরে, ইংরেজের আমলে প্রথম দিকে যে শান্তি ও পূর্বাপেক্ষা সুশাসন পাইলাম, তাহাতে দেশাত্মবোধের কথা আমরা প্রায় ভুলিয়া গেলাম। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে-সঙ্গেই এবং ভারতবর্ষের বাহিরে ইয়োরোপ এবং অন্যান্য নানা দেশে ভারতের প্রাচীন বিদ্যা ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা, আস্থা এবং প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হইবার অন্যতম ফলস্বরূপ, নিজেদের

পরাধীন অবস্থা সম্বন্ধে এবং ভারতবর্ষকে আবার গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার আকাঙ্ক্ষা বিষয়ে আমাদের আগ্রহ দেখা দিল। আমরা স্বাধীন ভারতের কল্পনা দেখিতে লাগিলাম—যে ভারত এক এবং অখণ্ড, এবং যাহা একটা বিকশিত শতদল পদ্মের মত, এই পদ্মের প্রত্যেকটি পর্ব ভারতের প্রত্যেক প্রান্তীয় ভাষা ও প্রান্তীয় সংস্কৃতিকে আশ্রয় করিয়া বিদ্যমান।

আমাদের জাতীয় আন্দোলন আরম্ভ হইল। এ সম্বন্ধে বিগত খ্রীষ্টীয় শতকের দ্বিতীয় পাদে আমরা প্রথম উদ্বুদ্ধ হইলাম এবং এই উদ্বোধনের যুগে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার "বন্দে মাতরম্" গান রচনা করিলেন। কংগ্রেসের স্থাপনার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, নাগরী প্রচারিণী সভা প্রভৃতি জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি স্থাপিত হইতে লাগিল। তাহার পরে আসিল বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন, এবং সমগ্র দেশে স্বাজাত্যবোধ এবং দেশাত্মবোধের বন্যা বহিল। এই বন্যা প্রথম বাঙ্গালা দেশকে প্লাবিত করিল, এবং পরে ভারতের অন্য সমস্ত অঞ্চলে বিস্তার লাভ করিল। স্বাধীনতার জন্য সত্যকার চেষ্টা আরম্ভ হইল। বাঙ্গালায় ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে স্ব-স্ব ভাষায় "জাতীয় সংগীত" "রাষ্ট্র গীত" রচনার নূতন যুগ আসিল। জাতীয় আন্দোলন কেবল বিদেশী শাসনকে ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই আসে নাই, ইহার একটি গঠনমূলক দিক ছিল যদ্দ্বারা বঙ্গদেশ ও ভারতের ভাষা ও সাহিত্য, শিল্প ও কলা, বিজ্ঞান ও যন্ত্রশিল্প প্রভৃতির পক্ষে পূর্ণ উন্নতির যুগ আসিল। এই যুগে বাঙ্গালাভাষাতে তাহার কতকগুলি অবিনশ্বর সম্পদ, দেশাত্ম-বোধের গান ও কবিতা রচিত ও প্রচারিত হইল। এইগুলির মাধ্যমে বাঙ্গালার মনের এক অভিনব এবং অপূর্ব প্রকাশ আমরা পাইলাম।

স্বদেশী আন্দোলনের যুগে এইরূপ জাতীয় সংগীতের কতক-গুলি সংগ্রহ বাহির হইয়াছিল। "মাতৃবন্দনা" পুস্তকে

সংকলয়িতা সেগুলির একটি তালিকা দিয়াছেন (পৃ ২০৪-২০৫)। তন্মধ্যে যোগীন্দ্রনাথ সরকারের “বন্দে মাতরম্” এবং নলিনীরঞ্জন সরকারের “বন্দনা” এই দুইখানি সর্বাপেক্ষা লোকপ্রিয় হয়।

কিন্তু আজকাল স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পর আমাদের সংস্কৃতি এবং চিন্তাধারা নানা দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইতেছে বলিয়া আমরা এই সকল জাতীয় সংগীত বা স্বাধীনতা-সংগীতের চর্চা করি না, এবং এগুলিকে প্রায় ভুলিতে বসিয়াছি।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় এইরূপ দেশবন্দনা-মূলক কবিতা সংগ্রহ করিয়া এবং সেগুলিকে প্রকাশ করিয়া দেশের প্রভূত হিতসাধন করিলেন। অনেকগুলি গান চিরতরে মনে রাখিবার, জাতীয় স্মৃতিতে সর্বকালের জন্য গাঁথিয়া রাখিবার। সেরূপ কতকগুলি গান ও কবিতা প্রায় লুপ্ত হইয়া যাইতেছিল, এবং শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় পুনরায় সংগৃহীত করিয়া তাঁহার এই উপযোগী সংগ্রহ-গ্রন্থ “মাতৃবন্দনা”তে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। বিগত শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে এতাবৎকাল পর্যন্ত জাতীয়তা-বিষয়ে যতগুলি শ্রেষ্ঠ কবিতা ও গান বাহির হইয়াছিল, সেগুলির প্রায় সমস্তই এই পুস্তকে পাওয়া যাইবে। কবি ও রচয়িতাদের জীবনী ও পরিচয় পরিশিষ্টে দেওয়ায়, এই উপাদেয় পুস্তকের মূল্য যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে।

এই পুস্তকের জন্য আমি কল্যাণীয় শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্রকে অভিনন্দিত করি, এবং আশা করি, এই পুস্তকখানি সাধারণ্যে যথোচিত সমাদর লাভ করিবে॥

মহালয়া, ১৩৭০।১৮৮৫,
১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৬৩।
“সনৎসভা”
(বিধান-পরিষৎ)
কলিকাতা॥

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

ভূমিকা

কংগ্রেস আন্দোলনের আরম্ভের সঙ্গে ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনের আরম্ভ নয়। ইহার প্রস্তুতি চলিতেছিল অনেক-দিন পূর্ব হইতে। বাঙলা দেশে দেখিতে পাই, এই ক্ষেত্র প্রস্তুতি চলিতেছিল সাহিত্য ও সঙ্গীতের মাধ্যমে। কংগ্রেস আন্দোলনের অন্ততঃ অর্ধশতাব্দী পূর্ব হইতে বাঙলা দেশের কবিগণ তাঁহাদের কবিতার ভিতর দিয়া দেশবাসিগণকে স্বদেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কবিহৃদয় অত্যন্তভাবে সংবেদনশীল; একটি জাতীয় জীবনে ভাবিকালে যাহা ঘটিবে বা ঘটা উচিত, তাহা তাঁহারা সাধারণ মানুষের বহুপূর্বে তাঁহাদের হৃদয় স্পন্দনের মধ্যে লাভ করিতে পারেন। সেই স্পন্দন তাঁহাদের রচিত সাহিত্যের মধ্যে প্রকাশিত হয় গভীর প্রেরণারূপে। জাতীয় জীবন এই প্রেরণা দ্বারা জ্ঞাতে অজ্ঞাতে প্রভাবিত হইতে থাকে, এই প্রভাবই পরবর্তী কালে সক্রিয়রূপ গ্রহণ করিয়া একটি যুগান্তকারী ব্যাপক জাতীয় আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে।

ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধের শেষ দিকে ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার মধ্যেই আমরা স্বাদেশিকতার প্রথম স্পন্দন অনুভব করিতে পারি। তাঁহার পরে আসিলেন রঙ্গলাল—আসিলেন মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র—যে-জাতীয় কাব্য-মহাকাব্যই তাঁহারা রচনা করুন—তাহার অন্তঃপ্রেরণার ভিতরে নিহিত ছিল গভীর জাতীয়তাবাদ—স্বদেশ-প্রেমের উন্মাদনা; সেই অন্তঃ-প্রেরণা ওতপ্রোতভাবে মিলিয়া গিয়াছে তাঁহাদের কবিকৃতির সঙ্গে। প্রাচীন বিষয়বস্তুকেও ঊনবিংশ শতাব্দীর জাতীয়তাবাদ ও স্বদেশ-প্রেমের উপরে এইভাবে গ্রথিত করিয়া তবে তাঁহারা তাঁহাদের কাব্যকে প্রাণবন্ত করিয়া তুলিতে পারিয়াছিলেন।

তাহার পরে আসিল কংগ্রেস আন্দোলন—আসিল হিন্দু-মেলার আন্দোলন—স্বদেশী আন্দোলন। কর্মের সঙ্গে ভাবের আবেগ দেখা দিল, কর্মের ইন্ধনরূপেও ভাবসম্বেগের প্রয়োজন

দেখা দিল ; কত আত্মত্যাগ—কত অত্যাচার দুঃখ-লাঞ্ছনাকে হাসিমুখে বরণ—কত সুখদুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষার উন্মথন আলোড়ন—সব কিছু প্রকাশ লাভ করিতে লাগিল অসংখ্য গানে গানে। এই গানের মধ্যে নাগরিকের সঙ্গে পল্লিবাসিগণ আসিয়া কণ্ঠ মিলাইলেন, শিক্ষিতের সঙ্গে অর্ধশিক্ষিত অশিক্ষিত সবাই আসিয়া কণ্ঠ মিলাইলেন। স্বদেশী সঙ্গীতে সমস্ত বাঙলা দেশের নগর-পল্লি—মাঠ-ঘাট—নদী-প্রান্তর ভরিয়া গেল। সেই সঙ্গীতের সঙ্গে যাঁহার পরিপূর্ণ পরিচয় না ঘটিবে, বাঙলা দেশের জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে তাঁহার পরিচয়ও অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

সেই পরিচয় দান করিবার জন্যই বিভিন্ন যুগের স্বদেশী সঙ্গীতের এই সঙ্কলন 'মাতৃবন্দনা'। বাঙলা দেশ মাতৃপূজার দেশ ; দেশকে এখানে প্রথম হইতেই চৈতন্যময়ী প্রেমময়ী দেবী বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। পৌরাণিক মাতৃপূজা এবং নব-দীক্ষায় লব্ধ দেশমাতৃকার পূজা এখানে অবাধে মিলিয়া মিশিয়া একেবারে এক হইয়া গিয়াছে। সংকলিত গানগুলির মধ্যে বাঙলার জাতীয় জীবনের এই বৈশিষ্ট্য চমৎকার প্রকাশ লাভ করিয়াছে। সাহিত্যিক বিচারের মাপ কাঠিতে সবগুলি সঙ্গীত উচ্চ সাহিত্যগুণসম্পন্ন না হইতে পারে ; কিন্তু এই গানগুলিই এক সময়ে আশায় উদ্দীপনায় বজ্রকঠিন কর্মে জীবনের সর্বস্ব-পণের সঙ্কল্পে অসংখ্য নরনারীকে অনুপ্রেরিত করিয়া তুলিয়াছিল। সেই ইতিহাসকে মনের সামনে জীবন্ত করিয়া রাখিতে হইলে এই সঙ্গীতগুলিকেও স্মরণ করিতে হইবে। যাঁহারা এই সঙ্গীতগুলিকে বিভিন্ন আকর হইতে সঙ্কলিত করিয়া এবং শোভনভাবে প্রকাশ করিয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন, তাঁহারা একটি মহৎ জাতীয়-কর্তব্যই পালন করিলেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১৫. ৯. ১৯৬৩

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

নিবেদন

আমাদের পূর্ব্বসূরিগণ পরাধীন ভারতবাসীকে স্বাধীনতার জন্য উদ্বুদ্ধ ও উত্তেজিত করিতে যে অজস্র সঙ্গীত ও কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা আমরা প্রায় বিস্মৃত হইয়া যাইতেছিলাম। ভারত আজ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে; কিন্তু ঐ সকল জাতীয় সঙ্গীতের প্রযোজনীয়তা এখনও শেষ হইয়া যায় নাই। বহিঃশত্রুর আক্রমণে ও পুনরাক্রমণ সম্ভাবনায় ভারত আজ চরম সঙ্কটের সম্মুখীন। জাতির এই সঙ্কটকালে দেশবাসীর মধ্যে স্বদেশভক্ত কবিকুলের ঐ সমস্ত দেশাত্মবোধক সঙ্গীত ও কবিতার বহুল প্রচারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বোধ হয় সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না। যুগে যুগে দেশে দেশে জাতীয় বিপদের সময় এইরূপ সঙ্গীত ও কবিতাবলী মানুষের মনে বিদ্যুৎ-প্রবাহের ন্যায় প্রবল উৎসাহ ও কর্ম্মশক্তি জাগ্রত করিয়াছে। আমাদের এই ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ বঙ্গদেশেও ইহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে তত্ত্ববোধিনী সভা, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, হিন্দুমেলা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান বঙ্গদেশে যে অখণ্ড জাতীয়তাবোধ ও স্বাদেশিকতার ভাববন্যা জাগ্রত করিয়াছিল, বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাংলার কবিকুল ও জনসাধারণ বহু সঙ্গীত এবং কবিতা রচনা করিয়া তাহাকে আরও প্রাণবন্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। সেই সকল সঙ্গীত ও কবিতার দ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধি ভিন্নও কতকগুলি সঙ্গীত ও কবিতা যুগোত্তর মহিমায় মহিমান্বিত হইয়া, সর্ব্বকালেই বঙ্গদেশে জনসাধারণের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা জাগ্রত করিয়াছে। এইরূপ সঙ্গীত ও কবিতার কিছু কিছু সঙ্কলন-পুস্তক বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পুস্তক-প্রকাশকদ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে। সেগুলি পূর্ণাঙ্গ না হইলেও আজ দুষ্প্রাপ্য অথবা অপ্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের নাম পুস্তকের শেষে প্রদত্ত হইল।

বহু দিন হইতেই আমার একখানি পূর্ণাঙ্গ দেশাত্মবোধক সঙ্গীত ও কবিতার সঙ্কলন-পুস্তক প্রকাশ করিবার ইচ্ছা ছিল। বর্ত্তমান সঙ্কট-সময়ে এই পুস্তক প্রকাশ করার প্রয়োজনীয়তা বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করিয়া ইহার সঙ্কলন সম্পূর্ণ করিলাম। এই "মাতৃবন্দনা" পুস্তকে ১৭৪১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট পর্য্যন্ত খ্যাত ও অখ্যাত বহু ব্যক্তির সঙ্গীত ও কবিতা সংগৃহীত হইয়াছে। আকর গ্রন্থ ভিন্নও নানাস্থান হইতে

বহু অনুসন্ধান করিয়া অনেক কবির সঙ্গীত ও কবিতা এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। সময় ও সুযোগ অথবা যোগাযোগের অভাবে কতকগুলি সঙ্গীত ও কবিতা অনুমতি ব্যতীত মুদ্রিত হইয়াছে। আশা করি, ইহার উত্তরাধিকারিগণ এ জন্য আমাকে পরোক্ষে অনুমতি দিয়া অনুগৃহীত করিবেন।

এই পুস্তকে একটিমাত্র দেশাত্মবোধক সংস্কৃত-সঙ্গীত প্রদত্ত হইয়াছে। উহা মদীয় পরম পূজ্যপাদ পিতৃদেব মহামহোপাধ্যায়-মহাকবি-ভারতাচার্য্য-পদ্মভূষণ ৺হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় রচিত 'মিবারপ্রতাপম্' নামক মহানাটক হইতে উদ্ধৃত।

আমি এই পুস্তকে সংক্ষিপ্তভাবে প্রায় সকল কবিরই পরিচয় দিয়াছি। বহু লেখালেখি ও অনুসন্ধান করিয়াও যাঁহাদের নাম এবং পরিচয় সংগ্রহ করিতে পারি নাই, তাঁহাদের নাম ও পরিচয় দেওয়া এবং ক্রমানুসারে মুদ্রণও সম্ভবপর হয় নাই।

এই পুস্তক সঙ্কলনে সর্ব্বশ্রী প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, বিশু মুখোপাধ্যায়, সনৎকুমার গুপ্ত, চিত্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ও তারকেশ্বর চট্টোপাধ্যায় আমাকে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাদের এই ঋণ কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি।

প্রকাশক এস. সি. সরকার এণ্ড সন্স-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সরকার এবং অন্যতম কর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীঅমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই পুস্তক প্রকাশে যথেষ্ট যত্ন লইয়াছেন, এ জন্য তাঁহাদিগকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

এই গ্রন্থ পড়িয়া ইহার পাঠক-পাঠিকা যদি স্বদেশপ্রেমের প্রেরণা লাভ করেন, তাহা হইলে আমার বিপুল পরিশ্রম সার্থক হইবে।

৪১, দেব লেন, ইন্টালী
কলিকাতা-১৪
১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ

শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

সূচীপত্র

আমার দুর্গোৎসব

(বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তর' হইতে উদ্ধৃত)

"এসো মা! নবরাগ-রঙ্গিণি, নববলধারিণি, নবদর্পে দর্পিণি, নব স্বপ্নদর্শিনি!—এসো মা, গৃহে এসো—ছয় কোটি সন্তানে একত্রে, এককালে, দ্বাদশ কোটি কর যোড করিয়া, তোমার পাদপদ্ম পূজা করিব। ছয় কোটি মুখে ডাকিব, মা প্রশ্বতি অম্বিকে! ধাত্রি ধরিত্রি ধনধান্যদায়িকে, নগাঙ্কশোভিনি নগেন্দ্রবালিকে! শরৎসুন্দরি চারুপূর্ণ চন্দ্রভালিকে! ডাকিব—সিন্ধুসেবিতে সিন্ধুপূজিতে সিন্ধুমথনকারিণি! শত্রুবধে দশভুজে দশপ্রহরণধারিণি! অনন্তশ্রী অনন্তকালস্থায়িনি! শক্তি দাও সন্তানে. অনন্তশক্তিপ্রদায়িনি। তোমায় কি বলিয়া ডাকিব মা? ঐ ছয় কোটি মুণ্ড ঐ পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত কি।—এই ছয় কোটি কণ্ঠে ঐ নাম করিয়া হুঙ্কার করিব—এই ছয় কোটি দেহ তোমার জন্য পতন করিব—না পারি, এই দ্বাদশ কোটি চক্ষে তোমার জন্য কাঁদিব। এসো মা গৃহে এসো—যাঁহার ছয় কোটি সন্তান—তাঁহার ভাবনা কি?

দেখিতে দেখিতে আর দেখিলাম না—সেই অনন্ত কালসমুদ্রে—সেই প্রতিমা ডুবিল! অন্ধকারে সেই তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশি ব্যাপিল, জলকল্লোলে বিশ্বসংসার পূরিল! তখন যুক্তকরে, সজল নয়নে, ডাকিতে লাগিলাম, উঠ মা হিরণ্ময়ি বঙ্গভূমি! উঠ মা! এবার সুসন্তান হইব, সৎপথে চলিব—তোমার মুখ রাখিব। উঠ মা, দেবি দেবানুগৃহীতে—এবার আপনা ভুলিব—ভ্রাতৃবৎসল হইব, পরের মঙ্গল সাধিব—অধর্ম, আলস্য, ইন্দ্রিয়ভক্তি ত্যাগ করিব—উঠ মা—একা রোদন করিতেছি, কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষু গেল মা! উঠ, উঠ, উঠ মা, বঙ্গজননী।

মা উঠিলেন না। উঠিবেন না কি?"

সং গচ্ছধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্‌।
দেবা ভাগ্যং যথা পূর্ব্বে সংজানানা উপাসতে॥

তোমরা সকলে একত্র মিলিত হও, এক বাক্যে উচ্চারণ কর, তোমাদের মন ও মত এক হউক, পূর্ব্বে দেবগণ এইরূপ একমত হইয়া যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিতেন।

সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহ চিত্তমেষাম্‌।
সমানং মন্ত্রমভিমন্ত্রয়ে বঃ সমানেন বো হবিষা জুহোমি॥

ইঁহাদের মন্ত্র এক, সমিতি এক, হৃদয় এক, চিত্ত এক। সমান মন্ত্রে ইঁহারা অভিমন্ত্রিত। তোমাদিগকে সমান হবিঃ সংযোগে আমি হোম করিতেছি।

সমানী ব আকূতি সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি॥

তোমাদেব অভিপ্রায় এক হউক, হৃদয় এক হউক, মন এক হউক এবং তোমরা সর্ব্ব বিষয়ে সকল স্থানে একতা লাভ কব।

—ঋগ্‌বেদ-সংহিতা, দশম মণ্ডল, ১৯১ স্থক্ত।
২য়, ৩য়, ৪র্থ ঋক্‌।

ঋগ্‌ভিঃ পাঠ্যমভূদ্‌ গীতং সামভ্যঃ সমপদ্যত।
যজুর্ভ্যোঽভিনয়া জাতা রসাশ্চাথর্ব্বণঃ স্মৃতাঃ॥

ঋগ্‌বেদ পাঠ করা হয়, সামবেদ হইতে গীত জন্মিয়াছে, যজুর্ব্বেদ হইতে অভিনয় উৎপন্ন হইয়াছে এবং অথর্ব্ববেদে রসসমূহ কথিত হইয়াছে।

জপকোটিগুণং ধ্যানং ধ্যানকোটিগুণো লয়ঃ।
লয়কোটিগুণং গানং গানাৎ পরতরং নহি॥

জপ হইতে কোটি গুণ অধিক ধ্যান, ধ্যান হইতে কোটি গুণ অধিক লয, লয হইতে কোটি গুণ অধিক গান এবং গান হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই।

সঙ্গীতকেন রম্যেণ সুখং যস্য ন চেতসি।
মনুষ্যবৃষভো লোকে বিধিনৈব স বঞ্চিতঃ॥

মনোহর সঙ্গীতে যাহার চিত্ত আনন্দিত না হয়, এই পৃথিবীতে সে মনুষ্যাকৃতি বৃষভ। ভগবানই তাহাকে আনন্দ হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন।

সংসারদুঃখদগ্ধানামুত্তমানামনুগ্রহাৎ।
প্রভুণা শঙ্করেণাত্র গীতবাদ্যং প্রকাশিতম্‌॥

সংসারতাপে দুঃখিত দগ্ধচিত্ত সজ্জন লোকের প্রতি অনুগ্রহবশতঃ ভগবান্‌ শঙ্কর এই পৃথিবীতে গীত ও বাদ্য প্রচার করিয়াছেন।

মাতৃভাষা

নানান্ দেশে নানান্ ভাষা ।
বিনা স্বদেশীয় ভাষা পুরে কি আশা ॥
কত নদী সরোবর, কিবা ফল চাতকীর,
ধারাজল বিনে কভু ঘুচে কি তৃষা ?
বরিষে ঘন চাতকী কত কি করিছে মনে ।
তৃষায় অনল করে জল জল,
জলধর জল হর কেনে ।
শুনি গরজ গভীর, পুলক হয় শরীর ;
বিহনে জীবন, কেমনে জীবন,
আর বল কি সে বাঁচিবে প্রাণে ॥

—রামনিধি গুপ্ত

স্বদেশ

জান না কি জীব তুমি, জননী জনম-ভূমি
যে তোমায় হৃদয়ে রেখেছে !
থাকিয়া মায়ের কোলে, সন্তানে জননী ভোলে,
কে কোথায় এমন দেখেছে ?
ভূমেতে করিয়া বাস, ঘুমেতে পূরাও আশ,
জাগিলে না দিবা বিভাবরী ।
কত কাল হরিয়াছ, এই ধরা ধরিয়াছ
জননী-জঠর পরিহরি ॥

যার বলে বলিতেছ, যার বলে চলিতেছ,
যার বলে চালিতেছ দেহ।
যার বলে তুমি বলী, তার বলে আমি বলি,
ভক্তিভাবে কর তারে স্নেহ ॥
প্রসূতি তোমার যেই তাহার প্রসূতি এই,
বসুমাতা মাতা সবাকার।
কে বুঝে ক্ষিতির রীতি, তোমার জননী ক্ষিতি,
জনকের জননী তোমার ॥
কত শস্য ফলমূল, না হয় যাহার মূল
হীরকাদি রজত-কাঞ্চন।
বাঁচাতে জীবের অসু, বক্ষেতে বিপুল বসু
বসুমতী করেন ধারণ ॥
সুগভীর রত্নাকর, হইয়াছে রত্নাকর
রত্নময়ী বসুধার বরে।
শূন্যে করি অবস্থান, করে করে কর দান,
তরণি ধরণীরাণী-করে ॥
ধরিয়া ধরার পদ, পেয়ে পদ নদী, নদ
জীবনে জীবন রক্ষা করে।
মোহিনী মোহীর মোহে, বহ্নি বারি বন্ধু দোঁহে
প্রেমভাবে চরে চরাচরে ॥
প্রকৃতির পূজা ধর, পুলকে প্রণাম কর,
প্রেমময়ী পৃথিবীর পদে।
বিশেষতঃ নিজ দেশে, প্রীতি রাখ সবিশেষে,
মুগ্ধ জীব যার মোহমদে ॥
ইন্দ্রের অমরাবতী, ভোগেতে না হয় মতি
স্বর্গভোগ উপসর্গ সার।
শিবের কৈলাসধাম, শিবপূর্ণ বটে নাম
শিবধাম স্বদেশ তোমার ॥

মিছে মণি-মুক্তা-হেম,   স্বদেশের প্রিয় প্রেম
তার চেয়ে রত্ন নাই আর।
সুধাকরে কত সুধা,   দূর করে তৃষ্ণা ক্ষুধা,
স্বদেশের শুভ সমাচার ॥
ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে,   দেখ দেশবাসিগণে,
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
কতরূপ স্নেহ করি,   দেশের কুকুর ধরি,
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া ॥
স্বদেশের প্রেম যত,   সে-ই মাত্র অবগত,
বিদেশেতে অধিবাস যার।
ভাব তুলি ধ্যানে ধরে   চিত্রপটে চিত্র করে
স্বদেশের সকল ব্যাপার ॥
স্বদেশের শাস্ত্রমতে,   চল সত্য ধর্ম্মপথে,
স্থির প্রেম কর অবধান।
বাস করি এই বর্ষে   এই ভাবে এই বর্ষে
হর্ষে কর বিভুগুণ গান ॥
উপদেশ বাক্য ধর,   দেশে কেন দ্বেষ কর
শেষ কর মিছে সুখ আশা।
তোমার যে ভালবাসা,   সে হলো না ভালবাসা
আর কোথা পাবে ভাল বাসা ?
এ বাসা ছাড়িবে যবে,   আর কি হে আশা রবে ?
প্রাপ্ত হ'য়ে আশা-নাশা বাসা।
কেবা আর পায় দেখা,   এলে একা যাবে একা
পুনর্ব্বার নাহি আর আসা ॥

—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

আমরা

আকাশ-পরশী গিরি দমি' গুণ-বলে,
নির্ম্মিল মন্দির যারা সুন্দর ভারতে ;
তাদের সন্তান কি হে আমরা সকলে ?
আমরা,—দুর্ব্বল, ক্ষীণ, কুখ্যাত জগতে !
পরাধীন, হা বিধাতঃ ! আবদ্ধ শৃঙ্খলে ;
কি হেতু নিবিল জ্যোতিঃ মণি-মরকতে ?
ফুটিল ধুতুরা-ফুল মানসের জলে
নির্গন্ধে—কে কবে মোরে ? জানিব কি মতে ?
বামন দানবকুলে, সিংহের ঔরসে
শৃগাল, কি পাপে মোরা কে কবে আমারে ?
রে কাল ! পূরিবি কি রে পুনঃ নব-রসে
রসশূন্য দেহ তুই ? অমৃত-আসারে
চেতাইবি মৃতকল্পে ? পুনঃ কি হরষে
শুক্লকে ভারত-শশী ভাতিবে সংসারে ?

—মাইকেল মধুসূদন দত্ত

স্বাধীনতা

স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে কে বাঁচিতে চায় ?
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে কে পরিবে পায় ?
কোটিকল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে নরকের প্রায় ;
দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গসুখ তায় হে স্বর্গসুখ তায় !
এ কথা যখন হয় মানসে উদয় হে মানসে উদয় ;
পাঠানের দাস হবে ক্ষত্রিয়-তনয় হে ক্ষত্রিয়-তনয় ;
তখনি জ্বলিয়া উঠে হৃদয়-নিলয় হে হৃদয়-নিলয় !
নিবাইতে সে অনল বিলম্ব কি সয় হে বিলম্ব কি সয় ?
অই শুন ! অই শুন ! ভেরীর আওয়াজ হে ভেরীর আওয়াজ !

সাজ সাজ সাজ বলে, সাজ সাজ সাজ হে সাজ সাজ সাজ !
চল চল চল সবে সমর-সমাজ হে সমর-সমাজ ;
রাখহ পৈতৃক ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের কাজ হে ক্ষত্রিয়ের কাজ।
আমাদের মাতৃভূমি রাজপুতানার হে রাজপুতানার ;
সকল শরীরে ছুটে রুধিরের ধার হে রুধিরের ধার।
সার্থক জীবন আর বাহুবল তার হে বাহুবল তার ;
আত্মনাশে যেই করে দেশের উদ্ধার হে দেশের উদ্ধার !
কৃতান্ত কোমল কোলে আমাদের স্থান হে আমাদের স্থান ;
এসো তায় সুখে সবে হইব শয়ান হে হইব শয়ান।
কে বলে শমন-সভা ভয়ের নিধান হে ভয়ের নিধান ?
ক্ষত্রিয়ের জ্ঞাতি যম, বেদের বিধান হে বেদের বিধান।
স্মরহ ইক্ষ্বাকুবংশে কত বীরগণ হে কত বীরগণ ;
পরহিতে দেশহিতে ত্যজিল জীবন হে ত্যজিল জীবন ;
স্মরহ তাঁদের সব কীর্ত্তি-বিবরণ হে কীর্ত্তি-বিবরণ।
বীরত্ব-বিমুখ কোন্ ক্ষত্রিয়-নন্দন হে ক্ষত্রিয়-নন্দন ?
অতএব রণভূমে চল ত্বরা যাই হে চল ত্বরা যাই ;
দেশহিতে মরে যেই তুল্য তার নাই হে তুল্য তার নাই।
যদিও যবনে মারি চিতোর না পাই হে চিতোর না পাই—
স্বর্গসুখে সুখী হব, এস সব ভাই হে এস সব ভাই !

—রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বদেশ-রক্ষা

বাঁচিয়ে কি ফল যদি স্বাধীনতা যায় ?
পড়িবে কি সিংহরাজ শৃগালের পায় ?
স্বদেশ-রক্ষার তরে, সমরে কি কেহ ডরে,
শত গুণে হয় বলী স্বদেশ-রক্ষায়।

—দীনবন্ধু মিত্র

নীলকর

হে নিরদয় নীলকরগণ,
আর সহে না প্রাণে এ নীল দাহন।
দাদনের সুকৌশলে, শ্বেত-সমাজের বলে,
লুটেছে সকল তোহে কি আর আছে এখন।
দীন জনে দুঃখ দিতে, কাহার না লাগে চিতে,
কেবল নীলের হেরি পাষাণ সমান মন।
বৃটন স্বভাবে শেষে, কালি দিলে বঙ্গে এসে,
তরিলে জলধি-জল, পোড়াতে স্বর্ণ-ভবন।

-দীনবন্ধু মিত্র

উন্নতি উন্নতি উল্লাস-ভারতী

"উন্নতি, উন্নতি"—উল্লাস-ভারতী
কেন দিবারাতি বল রে!
কিসের উন্নতি? দেশের দুর্গতি,
দেখে শুনে তবু ভোল রে!
বটে জলে স্থলে, ভারত-মণ্ডলে
যেন মন্ত্রবলে, ধোঁয়া-যন্ত্র চলে,
একই দিবসে কাশী যাও চলে,
তাই কি উল্লাসে গল রে?
চঞ্চলা দামিনী বিমানচারিণী
তব বার্ত্তা বহে আসিয়া অবনী,
এ নব বিভব অদ্ভুত কাহিনী;—
তাই কি বিস্ময়ে টল রে?
কিন্তু একবার ভেবে দেখ সার,
এত যন্ত্র দেশে, যন্ত্রী কেবা তার?

স্বত্ব-অধিকার তাহে কি তোমার ?
মিছা আশা-দোলে দোল রে ?
নদী সিন্ধুনীরে পোত-থরে থরে,
গর্ব্ভে গুরুভার, চলে গর্ব্বভরে,
তা' দেখে পুলকে ভাব কি অন্তরে,
দেশের দারিদ্র্য গেল রে।
কিন্তু রে অবোধ, সে পোত কাহার ?
স্বত্ব-অধিকার তাহে কি তোমার ?
যাদের বাণিজ্য, তাদের ব্যাপার,
ব্যাপারী ধবল দল রে।
চিনির বলদ তোমরা কেবল,
কেরাণী-মুহুরী সরকারের দল।
কাকের কি লাভ পাকিলে শ্রীফল,
উচ্ছিষ্ট খোসা সম্বল রে !

—মনোমোহন বসু

পরাধীনতা

দিনের দিন সবে দীন ভারত হ'য়ে পরাধীন।
অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তা-জ্বরে জীর্ণ,
অনশনে তনু ক্ষাণ।
সে সাহস বীর্য্য নাহি আর্য্যভূমে,
পূর্ব্ব গর্ব্ব সর্ব্ব খর্ব্ব হ'ল ক্রমে,
চন্দ্র-সূর্য্য-বংশ অগৌরবে ভ্রমে,
লজ্জা-রাহু-মুখে লীন।
অতুলিত ধনরত্ন দেশে ছিল,
যাদুকর-জাতি মন্ত্রে উড়াইল,

কেমনে হরিল কেহ না জানিল,
এম্নি কৈল দৃষ্টিহীন।
তুঙ্গদ্বীপ হ'তে পঙ্গপাল এসে,
সার শস্য গ্রাসে, যত ছিল দেশে,
দেশের লোকে ভাগ্যে খোসা-ভুষি শেষে,
হায় গো রাজা কি কঠিন!
তাঁতি-কর্ম্মকার, করে হাহাকার,
সূতা, জাঁতা ঠেলে অন্ন মেলা ভার,
দেশী বস্ত্র, অস্ত্র বিকায় নাক আর,
হলো কি দেশের দুর্দ্দিন!
আজ যদি এ রাজ্য ছাড়ে তুঙ্গরাজ,
কলের বসন বিনা কিসে রবে লাজ,
ধর্‌বে কি লোক তবে দিগম্বরের সাজ,
বাকল টেনা ডোর কপিন্‌।
ছুঁচ্‌-সূতা পর্য্যন্ত আসে তুঙ্গ হ'তে,
দিয়াশলাই-কাটি, তাও আসে পোতে,
প্রদীপটি জ্বালিতে, খেতে, শুতে, যেতে,
কিছুতে লোক নয় স্বাধীন।

—মনোমোহন বসু

ভারত-বিলাপ

বল এই কি সেই ভারত ! বল এই সেই ভারত হে ॥

যে ভারত-বৃক্ষে, ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ
ফলেছিল সুশোভিত কত ।
যে ভারতের বস্তু চন্দ্র-সূর্য্য-তারা,
অগ্নি-বায়ু-বারি-বজ্র-বিদ্যুৎধারা,
যে ভারতের ছিল অধীনেতে ধরা,
যে ভারতের কীর্ত্তি গায় মহাভারত ।
যে ভারতে শত শত মুনি-ঋষি,
যাগ-যজ্ঞে রত ছিলেন অহর্নিশি,
যে ভাবতে ছিলেন সর্ব্বাপদবিনাশী,
তত্ত্বদর্শী মহেশাদি দেব যত ।
যে ভাবতে ছিল বেদাদি প্রধান,
সে ভারতে ছিল ব্রহ্ম-অনুষ্ঠান,
যে ভারতে সদা হ'ত সামগান,
যে ভারত ছিল নিত্যোৎসবে রত ।
যে ভারতে ছিল সর্ব্ব কর্ম্মে ধর্ম্ম,
আহারে বিহারে ব্যবহারে ধর্ম্ম,
জীবনে ধর্ম্ম, মরণে ধর্ম্ম,
যে ভারতে কর্ত্তেন ধর্ম্মরাজ রাজত্ব ।
এই কি সেই তেজঃপুঞ্জ আর্য্যস্থান ?
কার্য্য দেখে কিছুই হয় না অনুমান,
মনে হ'লে পরে জ্বলে উঠে প্রাণ,
ব'লব কি আর মনে রইল মনোগত ।

বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়

এই কি সেই আর্য্যস্থান

এই কি সেই আর্য্যস্থান আর্য্যস্থান,
(ও যার) তপোবলে যোগবলে কাঁপিত দেবতার প্রাণ !
সদা (ও যার) হেরে বীর্য্যবল স্বর্গমর্ত্ত্য রসাতল,
সভয়ে কাঁপিত গিরি-সাগরের জল।
দিগ্ দিগন্তরে শূন্যভরে উড়িত বিজয়-নিশান।

—কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ

মানুষ, না পশু ?

আজো আছে পশুদের দলে, পরস্পরে সভ্যভব্য বলে,
নিজের পেটের দায় অন্যকে ধরিয়া খায়,
সবে একা চায় ভূমণ্ডলে।
রাজা আর রাজ-অনুচর বিষম কঠোর স্বার্থপর,
কেবল নিজের তরে নিদারুণ কর্ম্ম করে,
বাধাইয়া দারুণ সমর !
পরের দেশেতে ঢুকে পরের ছেলের বুকে
মারে রুখে আগুনের গুলি।
কেন রে কি দোষ তার করিয়াছে রে পামর ?
মানুষে মানুষে যাও ভুলি ?
এ পশুত্বে, বীরত্বের নামে, আজো সবে পূজে ধরাধামে,
ভীষণ রক্তের নদী বহিতেছে নিরবধি,
রাক্ষসেরা মেতেছে সংগ্রামে।
কতই অর্থের নাশ, কতই হৃদয়-হ্রাস,
বুদ্ধির বিষম অপচয় !
তবু স্বার্থ সাধিবারে, মানুষে মানুষে মারে
পর-দুঃখে অন্ধ দুরাশয় !

চারদিকে হাহাকার শ্রবণে পশে না তাঁর,
বদ্ধকালা পাহাড় পাথর ;
অতি ধীর বীর ইনি, বিশ্বজয়ী বিশ্বজিনি
প্রজার শোকেতে কেন হবেন কাতর ?
যুগান্তরে লোক সবে শুনিয়া অবাক হবে—
মানুষে করিত বধ মানুষের প্রাণ,
মুখে তারা ভাই ভাই, মনে মনে প্রীতি নাই,
কারো প্রতি কারো নাই আন্তরিক টান।

—বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী

অত্যাচার

বাধাবিঘ্ন কত শত শত, করিতে মা তোর চরণবন্দন।
চাহি মা ! গাহিতে তব গুণগান, কিন্তু তাহে রাজশাসন ভীষণ।
বন্দে মাতরম্ ধ্বনি যে বা করে, রাজদ্রোহী নাকি হয় সে বিচারে,
বাঁধে তারে চবে, রাখে কারাগারে, পলে পলে করে কত নির্যাতন।
কহিতে ভারত-জননীর জয়, শ্বেতাঙ্গের হয় অশান্তির উদয়,
যে কহে, তাহার যাতনা অপার, মা বলিতে কার এত বিড়ম্বন !
কে আছে মা তোর ভকত-সন্তান, কে সঁপেছে তব পদে মন প্রাণ,
শত গুপ্তচরে করে তার সন্ধান, কত অপরাধী যেন সেই জন !
বুক ফেটে যায়, মুখ ফুটে তাই, বলিতে ভারতে কারো সাধ্য নাই,
নিত্য নীরবে সহিতেছে সবে, মলিন বদনে মরম বেদন।

—গিরিশচন্দ্র সেন

জন্মভূমি

ধন্য ধন্য জন্মভূমি আনন্দ-ভবন,
নয় নয় তুল্য তার নন্দন-কানন।
স্বর্গ স্বর্গ করে লোকে সার তার নাম
প্রকৃত সুখের স্বর্গ জনমের ধাম।
হয় হোক্ জন্মভূমি সৌন্দর্য্যবিহীন,
থাক্ তার চারি পাশে বিজন বিপিন,
না থাক্ নিকটে নদ-নদী-সরোবর,
না রোক্ সেখানে কোন খাদ্য পরিকর,
তবু তার কাছে সুরপুর কোন্ ছার,
যেখানে জনম যার তাই ভাল তার।
তিলেক রহিতে নারে প্রবাসী যেখানে,
নিবাসী সর্ব্বদা রয় হরিষে সেখানে।

-কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

বন্দে মাতরম্

বন্দে মাতরম্
সুজলাং সুফলাং মলয়জ-শীতলাম্
শস্যশ্যামলাং মাতরম্।
শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীম্,
ফুল্ল-কুসুমিত-দ্রুমদল-শোভিনীম্,
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্।
সপ্তকোটিকণ্ঠ-কলকল-নিনাদ-করালে,
দ্বিসপ্তকোটিভুজৈর্ধৃতখরকরবালে,
অবলা কেন মা এত বলে!

বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীম্,
রিপুদল-বারিণীং মাতরম্ ।
তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম্ম,
তুমি হৃদি, তুমি মর্ম্ম,
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে ।
বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারি প্রতিমা গড়ি
মন্দিরে মন্দিরে ।
ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণ-ধারিণী,
কমলা কমল-দল-বিহারিণী,
বাণী বিদ্যাদায়িনী
নমামি ত্বাম্,
নমামি কমলাং অমলাং অতুলাম্,
সুজলাং সুফলাং মাতরম্ !
বন্দে মাতরম্ ।
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাং
ধরণীং ভরণীং মাতরম্ ।

—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ভারত-সঙ্গীত

(মোগলেরা মহারাষ্ট্র আক্রমণ করিলে তখন মাধবাচার্য্য নামক একজন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার নিমিত্ত নগরে নগরে বীরত্ব ও উৎসাহবর্দ্ধক গান করিয়া বেড়াইতেন। এই প্রবাদ অবলম্বন করিয়া নিম্নের সঙ্গীতটী লিখিত হইয়াছে।)

"আর ঘুমাইও না, দেখ চক্ষু মেলি,
দেখ দেখ চেয়ে অবনীমণ্ডলী
কিবা সুসজ্জিত, কিবা কুতূহলী,
বিবিধ মানব-জাতিরে লয়ে।
মনের উল্লাসে, প্রবল আশ্বাসে,
প্রচণ্ড বেগেতে, গভীর বিশ্বাসে,
বিজয়ী পতাকা উড়ায়ে আকাশে,
দেখ হে ধাইছে অকুতোভয়ে।
হোথা আমেরিকা—নব অভ্যুদয়,
পৃথিবী গ্রাসিতে করেছে আশয়,
হয়েছে অধৈর্য্য নিজ বীর্য্যবলে,
ছাড়ে হুহুঙ্কার, ভূমণ্ডল টলে,
যেন বা টানিয়া ছিঁড়িয়া ভূতলে
নূতন করিয়া গড়িতে চায়।
মধ্যস্থলে হেথা আজন্ম পূজিতা
চির-বীর্য্যবতী বীর-প্রসবিতা,
অনন্ত যৌবনা যুনানীমণ্ডলী,
মহিমা-ছটাতে জগত উজলি,
সাগর ছেঁচিয়া, মরু-গিরি দলি,
কৌতুকে ভাসিয়া চলিয়া যায়।
আরব্য, মিশর, পারস্য, তুরকী,
তাতার, তিব্বত, অন্য কব কি,

চীন, ব্রহ্মদেশ, অসভ্য জাপান,
তারাও স্বাধীন, তারাও প্রধান,
দাসত্ব করিতে করে হেয় জ্ঞান,
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।

বাজ্‌ রে শিঙ্গা বাজ্‌ এই রবে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,'
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।

এই কথা বলি মুখে শিঙ্গা তুলি
শিখরে দাঁড়ায়ে গায়ে নামাবলী,
নয়ন-জ্যোতিতে হানিয়ে বিজলী
গায়িতে লাগিল জনেক যুবা।

আয়ত লোচন, উন্নত ললাট,
সুগৌরাঙ্গ তনু, সন্ন্যাসীর ঠাট,
শিখরে দাঁড়ায়ে গায়ে নামাবলী,
নয়ন-জ্যোতিতে হানিল বিজলী,
বদনে ভাতিল অতুল আভা।

নিনাদিল শৃঙ্গ করিয়া উচ্ছ্বাস,
"বিংশতি কোটি মানবের বাস,
এ ভারত-ভূমি যবনের দাস?
রয়েছে পড়িয়া শৃঙ্খলে বাঁধা!

আর্য্যাবর্ত্তজয়ী পুরুষ যাহারা,
সেই বংশোদ্ভব জাতি কি ইহারা?
জন কত শুধু প্রহরী-পাহারা,
দেখিয়া নয়নে লেগেছে ধাঁধা!

ধিক্ হিন্দুকুলে! বীরধর্ম্ম ভুলে,
আত্ম-অভিমান ডুবায়ে সলিলে,

দিয়াছে সঁপিয়া শত্রু-করতলে,
সোনার ভারত করিতে ছার !
হীনবীর্য্য সম হয়ে কৃতাঞ্জলি,
মস্তকে ধরিতে বৈরী-পদধূলি,
হ্যাদে দেখ ধায় মহাকুতূহলী
ভারতনিবাসী যত কুলাঙ্গার !
এসেছিল যবে আর্য্যাবর্ত্তভূমে,
দিক্ অন্ধকার করি তেজোধূমে,
রণরঙ্গ-মত্ত পূর্ব্ব পিতৃগণ
যখন তাহারা করেছিলা রণ,
করেছিলা জয় পঞ্চনদগণ,
তখন তাহারা কজন ছিল ?
আবার যখন জাহ্নবীর কূলে
এসেছিলা তারা জয়ডঙ্কা তুলে,
যমুনা-কাবেরী-নর্ম্মদা-পুলিনে,
দ্রাবিড়-তৈলঙ্গ দাক্ষিণাত্য-বনে,
অসংখ্য বিপক্ষ পরাজয়ি রণে,
তখন তাহারা কজন ছিল ?
এখন তোরা যে শত কোটি তার,
স্বদেশ উদ্ধার করা কোন্ ছার,
পারিস্ শাসিতে হাসিতে হাসিতে,
সুমেরু অবধি কুমারী হইতে,
বিজয়ী পতাকা ধরায় তুলিতে,
বারেক জাগিয়ে করিলে পণ।
তবে ভিন্ন জাতি-শত্রু-পদতলে,
কেন রে পড়িয়া থাকিস্ সকলে,
কেন না ছিঁড়িয়া বন্ধন-শৃঙ্খলে,
স্বাধীন হইতে করিস্ মন ?

অই দেখ্‌ সেই মাথার উপরে
রবি-শশী-তারা দিন দিন ঘোরে,
ঘুরিত যেরূপে দিক্‌ শোভা ক'রে
ভারত যখন স্বাধীন ছিল।
সেই আর্য্যাবর্ত্ত এখন (ও) বিস্তৃত,
সেই বিন্ধ্যগিরি এখন (ও) উন্নত,
সেই ভাগীরথী এখন (ও) ধাবিত,
পুরাকালে তারা যেরূপ ছিল।
কোথা সে উজ্জ্বল হুতাশন-সম
হিন্দু-বীরদর্প, বুদ্ধি, পরাক্রম?
কাঁপিত যাহাতে স্থাবর-জঙ্গম,
গান্ধার অবধি জলধি-সীমা?
সকলি ত আছে, সে সাহস কই?
সে গম্ভীর জ্ঞান, নিপুণতা কই?
প্রবল তরঙ্গে সে উন্নতি কই?
কোথা রে আজি সে জাতি-মহিমা?
হয়েছে শ্মশান এ ভারত-ভূমি!
কারে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছি আমি,
গোলামের জাতি শিখেছে গোলামি!
আর কি ভারত সজীব আছে?
সজীব থাকিলে এখনি উঠিত,
বীর-পদভরে মেদিনী দুলিত,
ভারতের নিশি প্রভাত হইত,
হায় রে সে দিন ঘুচিয়া গেছে।"
এই কথা বলি অশ্রুবিন্দু ফেলি,
ক্ষণমাত্র যুবা শৃঙ্গনাদ ভুলি,
পুনর্ব্বার শৃঙ্গ মুখে নিল তুলি,
গর্জ্জিয়া উঠিল গম্ভীর স্বরে—

"এখন (ও) জাগিয়া ওঠ রে সবে,
এখন (ও) সৌভাগ্য উদয় হবে,
রবিকরসম দ্বিগুণপ্রভাবে,
ভ'রতের মুখ উজ্জ্বল করে ॥
একবার শুধু জাতিভেদ ভুলে,
ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র মিলে,
কর দৃঢ় পণ এ মহীমণ্ডলে,
তুলিতে আপন মহিমা-ধ্বজা !
জপ, তপ, আর যোগ-আরাধনা,
পূজা, হোম, যাগ, প্রতিমা অর্চ্চনা,
এ সকলে এবে কিছুই হবে না,
তূণীর কৃপাণে কর্‌রে পূজা।
যাও সিন্ধুনীরে, ভূধর-শিখরে,
গগনের গ্রহ তন্ন তন্ন ক'রে,
বায়ু, উল্কাপাত, বজ্রশিখা ধ'রে,
স্বকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হও।
তবে সে পারিবে বিপক্ষ নাশিতে,
প্রতিদ্বন্দ্বী সহ সমকক্ষ হ'তে,
স্বাধীনতারূপ রতনে মণ্ডিতে,
যে শিরে এক্ষণে পাদুকা বও
ছিল বটে আগে তপস্যার বলে
কার্য্যসিদ্ধি হ'ত এ মহীমণ্ডলে,
আপনি আসিয়া ভক্ত-রণস্থলে,
সংগ্রাম করিত অমরগণ।
এখন সে দিন নাহিক রে আর,
দেব-আরাধনে ভারত উদ্ধার,
হবে না, হবে না,—খোল্ তরবার ;
এ সব দৈত্য নহে রে তেমন।

অস্ত্র পরাক্রমে হও বিশারদ,
রণরঙ্গ-রসে হও রে উন্মাদ,
তবে সে বাঁচিবে, ঘুচিবে বিপদ,
জগতে যদ্যপি থাকিতে চাও।
কিসের লাগিয়া হলি দিশেহারা,
সেই হিন্দুজাতি, সেই বসুন্ধরা,
জ্ঞান, বুদ্ধি, জ্যোতিঃ তেমতি প্রখরা.
তবে কেন ভূমে পড়ে লুটাও ?
অই দেখ সেই মাথার উপরে
রবি-শশী-তারা দিন দিন ঘোরে,
ঘুরিত যেরূপ দিক্ শোভা ক'রে,
ভারত যখন স্বাধীন ছিল ;
সেই আর্য্যাবর্ত্ত এখন (ও) বিস্তৃত,
সেই বিন্ধ্যাচল এখন (ও) উন্নত,
সেই জাহ্নবীবারি এখন (ও) ধাবিত,
কেন সে মহত্ত্ব হবে না উজ্জ্বল।
বাজ্ রে শিঙ্গা বাজ্ এই রবে,
শুনিয়া ভারতে জাগুক্ সবে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,
ভারত শুধু কি ঘমায়ে রবে ?

—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কালচক্র

বারেক এখনও কি রে দেখিবি না চাহিয়া,—
উন্নত গগন-পরে, ব্রহ্মাণ্ড উজ্জ্বল ক'রে
উঠেছে নক্ষত্র কত নব জ্যোতি ধরিয়া।
মানবে দেখায়ে পথ, চলেছে তড়িৎবৎ
প্রভাতিয়া ভবিষ্যৎ, ভূমণ্ডল ভাতিয়া।
হেরে সে নক্ষত্র-ভাতি, দেখ রে মানব-জাতি
ছুটেছে তাদের সনে, আনন্দ উৎসাহ-মনে
নিজ নিজ উন্নতির জয়পত্র বাঁধিয়া।
চলেছে চাহিয়া দেখ, বোদ্ধা, যোদ্ধা এক এক
কাল-পরাজয় করি দেবমূর্ত্তি ধরিয়া।
জলধি, পৃথিবী, মেরু, প্রতাপে হয়েছে ভীরু,
অবাধে পরিছে পাশ পদতলে পড়িয়া।
চলেছে বুধমণ্ডলী নরে করে কুতূহলী,
চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-তারা ছিঁড়িয়া আনিছে তা'রা
শূন্য হ'তে ধরাতলে জ্ঞানডোরে বাঁধিয়া।
আকাশপাতাল-গত পঞ্চভূত আদি যত—
প্রকৃতি ভয়েতে দ্রুত দেখাইছে খুলিয়া।
দেবতা অসুরগণ ক্রমে হয় অদর্শন,
ঈশ্বরেরই সিংহাসন উঠিতেছে কাঁপিয়া।
সরস্বতী কুতূহলা, সাহিত্য-দর্শন-কলা
স্বহস্তে সহস্র মালা দিতেছেন তুলিয়া।
কমলা অজস্রধারে ভাঙ্গিয়া নিজ ভাণ্ডারে,
ধনরাশি স্তূপাকারে দিতেছেন ঢালিয়া।
কবিকুল কোলাহলে মুখে জয়ধ্বনি বলে,
উন্নতি-তরঙ্গ-সঙ্গে ছুটিছে অশেষ রঙ্গে,
স্বজাতি-সাহস-কীর্ত্তি উচ্চৈঃস্বরে গাহিয়া।

অই দেখ অগ্রে তার পরিয়া মহিমা-হার
চলেছে ফরাসী-জাতি ধরা স্তব্ধ করিয়া।
অস্থির বানানলে—স্থাপিতে অবনীতলে,
সমাজ-শৃঙ্খলামালা নব সূত্রে গাঁথিয়া।
চলেছে রে দেখ চেয়ে শত বাহু প্রসারিয়ে
অর্দ্ধ সসাগরা ধরা অলঙ্কারে ভূষিয়া।
আমেরিকাবাসিগণ, নদ, গিরি, প্রস্রবণ,
জলনিধি উপকূল লৌহজালে বাঁধিয়া।
অই শোন্ ঘোর নাদে পূরাতে মনের সাধে,
পুরুষিয়া মল্লবেশে উঠিতেছে গর্জ্জিয়া।
বিনতা-নন্দন-সম ধ'রে নিজ পরাক্রম
দেখ্ রে আসিছে রুষ বসুনতী গ্রাসিয়া।
ইতালী উতলা হ'য়ে স্বকিরীট শিরে ল'য়ে
আবার জাগিছে দেখ্ হুহুঙ্কার ছাড়িয়া।
বিস্তারিয়া তেজোরাশি দেখ্ রে বৃটনবাসী
আচ্ছন্ন করেছে ধরা, মরুদ্বীপ সসাগরা,
যত দূর প্রভাকর-কর আছে ব্যাপিয়া।
প্রকাশি অসীম বল শাসিছে জলধি-তল,
শিরে কোহিনূর বাঁধা মদগর্ব্বে মাতিয়া।
তবুও বারেক কি রে দেখিবি না চাহিয়া—
হতভাগ্য হিন্দুজাতি!—শোভে কি নক্ষত্র ভাতি,
উন্নত গগন পরে ধরাতল ভাতিয়া।
ছিল সাধ বড় মনে ভারত-ও ওদেরি সনে
চলিবে উজলি মহী করে কর বাঁধিয়া;
আবার উজ্জ্বল হ'বে নব প্রজ্বলিত ভবে
ভারত উন্নতি-স্রোতে চলিবে রে ভাসিয়া।
জন্মিবে পুরুষগণ বীর যোদ্ধা অগণন,
রাখিবে ভারত-নাম ক্ষিতি-পৃষ্ঠে আঁকিয়া।

সে আশা হইল দূর, নীরব ভারতপুর ;
একজনও কাঁদে না রে পূর্ব্বকথা ভাবিয়া।
এ ক্ষিতিমণ্ডল-মাঝ আর্য্য কি রে নাহি আজ
শুনায় সে রব কেহ উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া।
সে সাধ ঘুচেছে হায় !
আয় মা জননি আয়, লয়ে তোর মৃতকায়,
মিটাই মনের সাধ মনে মনে কাঁদিয়া ॥

—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারত-ভিক্ষা

(যুবরাজের কলিকাতায় আগমন-উপলক্ষে রচিত)

পূর্ব্ব সহচরী রোম সে আমার
মরিয়া বাঁচিয়া উঠিল আবার—
গিরীশেরও দেখি জীবন-সঞ্চার—
আমি কি একাই পড়িয়া রব ?
কি হেন পাতক করেছি তোমায়,
বল্ ওরে বিধি বল্ রে আমায় ?
চিরকাল এই ভগ্নদণ্ড ধরি'
চিরকাল এই ভগ্নচূড়া পরি'
দাসমাতা বলি বিখ্যাত হ'ব !
হা রোম,—তুই বড় ভাগ্যবতী !
করিল যখন বর্ব্বরে দুর্গতি,
ছন্ন কৈল তোর কীর্ত্তিস্তম্ভ যত,
করি ভগ্নশেষ রেণু সমাবৃত

দেউল, মন্দির, রঙ্গ-নাট্যশালা,
গৃহ, হর্ম্ম্য, পথ, সেতু, পয়োনালা,
ধরা হ'তে যেন মুছিয়া নিল।
মম ভাগ্যদোষে মম জেতৃগণ
কক্ষ, বক্ষ, ভালে পদাঙ্ক-স্থাপন
করিয়া আমার, দুর্গ নিকেতন,
রাখিলা মহীতে—কলঙ্কমণ্ডিত,
কাশী, গয়াক্ষেত্র, নিতান্ত ঘৃণিত
(শরীরে কালিমা—দীনতা-প্রতিমা)
ধরণীর অঙ্গে যেন গাঁথিল!
"হায় পানিপথ, দারুণ প্রান্তর,
কেন ভাগ্য সনে হ'লিনে অন্তর ?
কেন রে, চিতোর তোর সুখ-নিশি
পোহাইল যবে, ধরণীতে মিশি
অচিহ্ন না হ'লি—কেন রে রহিলি
জাগাতে ঘৃণিত ভারত-নাম ?
"নিবিছে দেউটি বারাণসী তোর,
কেন তবে আর এ কলঙ্ক ঘোর
লেপিয়া শরীরে এখনও রহেছ
পূর্ব্বকথা কি রে সকলি ভুলেছ ?
অরে অগ্রবন, সরযূ পাতকী,
রাহুগ্রাস-চিহ্ন সর্ব্ব অঙ্গে মাখি,
কেন প্রক্ষালিছ অযোধ্যাধাম ?
"নাহি কি সলিল, রে যমুনে গঙ্গে,
তোদের শরীরে—উথলিয়া রঙ্গে,
কর অপসৃত এ কলঙ্করাশি,
তরঙ্গে তরঙ্গে অঙ্গ বঙ্গ গ্রাসি,
ভারতভুবন ভাসাও জলে।

"হে বিপুল সিন্ধু, করিয়া গর্জ্জন
ডুবাইলে কত রাজ্য, গিরি, বন,
নাহি কি সলিল ডুবাতে আমায় ?
আচ্ছন্ন করিয়া বিন্ধ্য, হিমালয়,
লুকায়ে রাখিতে অতল জলে ?"

—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারত-বিলাপ

অহে বঙ্গবাসী, জান কি তোমরা ?
অলকা জিনিয়া কেন মনোহরা
কার রাজধানী ? কি জাতি ইহারা ?—
এ সুখ-সৌভাগ্য ভোগে ধরায়।
নাহি যদি জান, এস এইখানে,
চলেছে দেখিবে ত্রিদিব বিমানে
রাজপুরুষেরা বিবিধ বিধানে—
গরবে মেদিনী ঠেকেনা পায়।
অদূরে বাজিছে "রুল ব্রিটানিয়া"
শকটে শকটে মেদিনী ছাইয়া
চলেছে দাপটে ব্রীটনবাসীরা—
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব আছে কোথায় !
হায় রে কপাল ! ওদেরি মতন
আমরাই কেন করিতে গমন
না পারি সতেজে—বলিতে আপন
যে দেশে জনম, যে দেশে বাস ?

ভয়ে ভয়ে যাই, ভয়ে ভয়ে চাই,
গৌরাঙ্গ দেখিলে, ভূতলে লুটাই,
ফুটিয়ে ফুকারি' বলিতে না পাই—
এমনি সদাই হৃদযে ত্রাস !
কি হবে বিলাপ করিলে এখন,
স্বাধীনতা-ধন গিয়াছে যখন,
চোরে শিরোমণি করেছে হরণ,
তখনি সে সাধ ঘুচে গিয়েছে।
সাজে না এখন অভিলাষ করা,
আমাদের কাজ শুধু পায়ে ধরা,
মস্তকে করিয়ে দাসত্ব ভরা
ছুটিতে হইবে ওদেরি পাছে।
হায় বসুন্ধরা ! তোমার কপালে
এই কি ছিল মা, পড়ে' কালে কালে
বিদেশীর পদে জীবন-গোঁয়ালে,
পুরাতে নারিলে মনের আশা।
রূপে অনুপম নিখিল ধরায়
করিয়া বিধাতা সৃজিলা তোমায়,
দিলা সাজাইয়া অতুল ভূষায়—
তোর কিনা আজি এ হেন দশা
হায় রে বিধাতা ! কেন দিয়াছিলি
হেন অলঙ্কার ? কেন না গঠিলি
মরুভূমি করে',—অরণ্যে রাখিলি,
দাসত্ব যাতনা হত না তায়।
না হলে এখানে করিত না গতি
পাঠান, মোগল, পারস্য, দুর্ম্মতি,
হরিতে ভারত কিরীটের ভাতি,
অভাগা হিন্দুরে দলিতে পায় !

এই যে দেখিছ পুরী মনোহর,
শত গুণ আরো শোভিত সুন্দর,
এই ভাগীরথী করে থর থর
ধাইত তখন কতই সাধে!
গাইত তখন কতই সুস্বরে
এই সব পাখী তরু শোভা করে',
কতই কুসুম পরিমল ভরে
ফুটিয়া থাকিত কত আহ্লাদে!
আগেকার মত উঠিত তপন,
আগেকার মত চাঁদের কিরণ
ভাসিত গগনে, গ্রহ-তারাগণ
ঘুরিত আনন্দে ঘেরিয়া ধরা।
যখন ভারতে অমৃতের কণা
হতো বরিষণ, বাজাইত বীণা
ব্যাস-বাল্মীকি,—বিপুল বাসনা
ভারত-হৃদয়ে আছিল ভরা।
যখন ক্ষত্রিয় অতীব সাহসে
ধাইত সমরে মাতি' বীর রসে,
হিমালয়-চূড়া গগন পরশে
গায়িত যখন ভারত নাম।
ভারতবাসীরা প্রতি ঘরে ঘরে
গায়িত যখন স্বাধীন অন্তরে
স্বদেশ-মহিমা পুলকিত স্বরে,—
জগতে ভারত অতুল ধাম।
ধন্য ব্রিটানিয়া! ধন্য তোর বল,
এ হেন ভূভাগ করে' করতল;
রাজত্ব করিছ ইঙ্গিতে কেবল,
তোমার তেজের নাহি উপমা।

আগে ছিল রাণী ধরা—রাজধানা,
স্মরণে যেন গো থাকে সে কাহিনী,
এবে সে কিঙ্করী হয়েছে দুখিনী
বলিয়ে দম্ভ করো না গরিমা।
তোমারো ত বুকে কত কত বার
রিপু পদাঘাত ক'রেছে প্রহার,
কালেতে না জানি কি হ'বে আবার
এই কথা সদা করিও ধ্যান।
ভয়ে ভয়ে লিখি, কি লিখিব আর,
নহিলে শুনিতে এ বীণা-ঝঙ্কার—
বাজিত গর্বজে, উথলি আবার
উঠিত ভারতে ব্যথিত প্রাণ।

—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায

কত কাল পরে

কত কাল পরে বল ভারত রে! দুখ-সাগর সাঁতারি পার হবে?
অবসাদ-হিমে ডুবিয়ে ডুবিয়ে, ও কি শেষ-নিবেশ রসাতল রে।
নিজ বাসভূমে, পরবাসী হলে, পর দাসখতে সমুদায় দিলে।
নিজ অন্ন পরে, কর পণ্যে দিলে. পরিবর্ত্ত ধনে দুরভিক্ষ নিলে।
তুমি অন্ধ হয়ে, পরস্বর্গ সুখে, তুমি আজও দুখে, কালও দুখে!
নিজ ভাল বুঝে, পর মন্দ নিলে, ছিল আপন যা ভাল তাও দিলে!
পর হাতে দিয়ে, ধনরত্ন সুখে, বহ লৌহ-বিনির্ম্মিত হার বুকে।
পর ভীষণ আসন, আনন রে, পর পণ্যে ভরা তনু আপন রে।
পর দীপশিখা, নগরে, নগরে, তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে।
ঘুচি কাঞ্চন-ভাজন, শোধ শিরে, হ'লো ইন্ধন কাচ প্রচার ঘরে।

খনিখাত খুঁড়ে, খুঁজিয়ে খুঁজিয়ে, পুঁজিপাত নিলে যুটিয়ে লুটিয়ে।
লভিয়ে বলবুদ্ধি, পরের বসে, হৃত জীবন চা-অহিফেন চষে।
শিখিলে যত জ্ঞান. নিশীথে জেগে, উপযুক্ত হল পরসেবা লেগে।
হলো চাকরী সার, যথায় তথায়, অপমান সদায় কথায় কথায়।
শুনিবে বল কে, তব আপন কে, পর-দাস-দশায় বধিব সবে।
অহ! কে কহিবে এ সুদীর্ঘ কথা, সমসিন্ধু অপার অগাধ ব্যথা।
বিধি বাদী হলে, পরমাদ রটে, পরমাদ হিতে হতবোধ ঘটে।
কি ছিলে কি হলে, কি হতে চলিলে, অবিবেক বশে কিছু না বুঝিলে
নয়নে কি সহে, এ কলঙ্ক-দুখ, পর রঞ্জন অঞ্জনে কাল মুখ।
নিজ শোণিত শোষি. পরে পুষিলে, তুষিতে কুল-শীল-স্বধর্ম্ম দিলে।
পর বেশ নিলে পর দেশ গেলে. তবু ঠাঁই মিলে নাহি দাস ব'লে।
মন চায় কথায় কৌপীন পরি, তব দুখ গেয়ে সব দেশ ঘুরি!
শিখিলে পর শিক্ষিত জ্ঞান যত, কিছু না, কিছু না, শুধু বাক্য-গত।
কহিতে বুক চায়, দু'ভাগ হতে, নয়নে উথলে জলস্রোত শতে।
কত নিগ্রহ নিত্য অশেষ মতে, সহিতেছ নিরন্তর ঘট-পথে।
তব নির্ভর নিত্য পরের করে, অশনে বসনে গমনের তরে।
মিলি কার্য্য করে, পশু কাটগণে, তব যুদ্ধ কচায়ন ভ্রাতৃগণে।
যদি দেয় পরে স্বরগের সুখে, তব শ্লাঘ্য নহে স্ববশের দুখে।
বন বর্ব্বরও স্ববশত্ব খুঁজে, তবু ভারত সে সব নাহি বুঝে।
তব আশ কিসে? তুমি নাশ তরে, হয় এর করে, নয় ওর করে।
অহ! যে দিকে আঁখি পড়ে ফিরিতে, নিরক্ষে শুধু পঞ্জর চারি ভিতে
কি হলে, কি হলো শূরবাসা জনে, উনমত্ত সুরা রসনে ব্যসনে।
র'লো কাগজ সার ধনার ঘরে, সুদবৃত্তি হলো দিনপাত তরে।
যত ক্ষত্রকুল দরবান হ'লো, দ্বিজ পাচক ঘোটকরান হ'লো।
সব জ্ঞান রলো পুঁথি পদতলে, হ'লো পল্লবগ্রাহক বিজ্ঞদলে।
র'লো ধর্ম্ম কি, ভক্ষ-অভক্ষ নিয়ে, তমজালে বিকীর্ণ সুদিন হিয়ে।
অলসে অবশে পরগ্রাস রসে, ক্রমে দীন দশা দিবসে দিবসে।
হয় লাজ মনে গত আর্য গনে, গণিকে যত এ সব হীন জনে।

ছি ! ছি ! আজি এ কুৎসিত বেশ পরে, কি সুখে সকলে ঘুম যাও ঘরে।
ধর প্রীতি মনে যদি দেশ বলে, ভাস রে সকলে, ভাস অশ্রুজলে।
ত্যজ রে ত্যজ, আত্মসুখের কথা, ত্যজ আমোদ-ভোগ-বিলাস বৃথা।
পর কষ্ট বিভূতি শরীরগণে, চল চৌদিক সাধন আহরণে।
গত কালের তাবত পাপফলে, ধৌত আজি সবে নয়নের জলে।
খুইয়ে নিজ দেশ মলিন মুখে, ভজনায় কি পৌরুষ স্বার্থসুখে।
যদি মানুষ, মানুষ নাহি হ'লে ফললাভ কি মানুষ নাম নিলে ?
যদি কাপুরুষ হয়ে কিছু নাহি হ'বে কর জীবনধাবণে ক্ষান্ত সবে।
ডুবি যাক্ জলে তবে বাস যথা, ভুলি যাক্ সবে তব নামকথা।
কভু যেন কেহ নাহি পায় কবে, খুঁজি ভারত নামক দেশ ভবে।

—গোবিন্দচন্দ্র রায়

স্বদেশ *

স্বদেশ আমার, কিবা জ্যোতির মণ্ডলী !
ভূষিত ললাট তব ; অস্তে গেছে চলি
সে দিন তোমার ; হায় সেই দিন যবে
দেবতা সমান পূজ্য ছিলে এই ভবে !
কোথায় সে বন্দ্যপদ ! মহিমা কোথায় !
গগনবিহারী পক্ষী ভূমিতে লুটায় !
বন্দীগণ বিরচিত গীত-উপহার
দুঃখের কাহিনী বিনা কিবা আছে আর ?
দেখি দেখি কালার্ণবে হইয়া মগন
অন্বেষিয়া পাই যদি বিলুপ্ত রতন

* হেনরী লুইস্ ভিভিয়ান ডিরোজিও রচিত "To India—My Motherland" কবিতার বঙ্গানুবাদ।

কিছু যদি পাই তার ভগ্ন অবশেষ
আর কিছু পরে যার রহিবে না লেশ !
এই শ্রমের এই মাত্র, পুরস্কার গণি ;
তব শুভ ধ্যায় লোকে, অভাগা জননী ।

—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অনূদিত

দুঃখ

মলিন মুখ-চন্দ্রমা ভারত তোমারি,
রাত্রি-দিবা ঝরিছে লোচন-বারি ।
চন্দ্র জিনি কান্তি নিরখিয়ে, ভাসিতাম আনন্দে,
আজি এ মলিন মুখ কেমনে নেহারি !
এ দুঃখ তোমার হায় সহিতে না পারি !

—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

আক্ষেপ

লজ্জায় ভারত যশ গাইব কি ক'রে ।
লুঠিতেছে পরে এই রত্নের আকরে ॥
সাধিনে রতন পাই, তাহাতে যতন নাই ।
হারাই আমোদে মাতি অবহেলা ক'রে ॥
দেশান্তর-জনগণ, ভুঞ্জে ভারতের ধন,
এ দেশের ধন হায় বিদেশীর তরে ॥
আমরা সকলে হেলা, হেলা করি নিজ মাতা,
মায়ের কোলের ধন নিয়ে যায় পরে ॥

—গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারত-বন্দনা

মিলে সবে ভারত-সন্তান, একতান মন-প্রাণ,
গাও ভারতের যশোগান।
ভারত-ভূমির তুল্য আছে কোন্ স্থান?
কোন্ অদ্রি হিমাদ্রি সমান?
ফলবতী বসুমতী, স্রোতঃস্বতী পুণ্যবতী,
শত খনি রত্নের নিধান।
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়, কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয়॥
রূপবতী সাধ্বী সতী, ভারত-ললনা,
কোথা দিবে তাদের তুলনা?
শর্ম্মিষ্ঠা-সাবিত্রী-সীতা, দময়ন্তী পতিরতা,
অতুলনা ভারত-ললনা।
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়, কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয়॥
বশিষ্ঠ-গৌতম-অত্রি মহামুনিগণ,
বিশ্বামিত্র-ভৃগু-তপোধন।
বাল্মীকি-বেদব্যাস, ভবভূতি-কালিদাস,
কবিকুল ভারতভূষণ।
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়, কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয়॥
বীরযোনি এই ভূমি বীরের জননী;
অধীনতা আনিল রজনী,

সুগভীর সে তিমির, ব্যাপিয়া কি রবে চির,
দেখা দিবে দীপ্ত দিনমণি ॥
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়, কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয় ॥
ভীষ্ম-দ্রোণ-ভীমার্জ্জুন নাহি কি স্মরণ,
পৃথুরাজ আদি বীরগণ ?
ভারতের ছিল সেতু, যবনের ধূমকেতু,
আর্ত্তবন্ধু দুষ্টের দমন ॥
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়, কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয় ॥
কেন ডর, ভীরু, কর সাহস আশ্রয় ;
যতো ধর্ম্মস্ততো জয় ।
ছিন্ন ভিন্ন হীনবল, ঐক্যেতে পাইবে বল,
মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে কি ভয় ?
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়, কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয় ॥

—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

নীরব ভারত

নীরব ভারতে কেন ভারতীর বীণা।
সোনার প্রতিমা আজি শোকে মলিনা।
কুঞ্জে কুঞ্জে যার কোকিল-কণ্ঠে খেলিত সুধা-তরঙ্গে,
সে কবি-নিকুঞ্জ আজি, শ্মশান-সমানা।
বীর-রাগমদে যেই তানে গর্জ্জিত ভারতী,
আজি সে দীপক-রাগ, শ্রবণে শুনি না!

—কালীপ্রসন্ন ঘোষ

জাগ রে জাগ রে সবে

গাও রে ভারত-সঙ্গীত, সবে প্রাণ ভ'রে
ভারতীর আরতিতে ভক্তিপূত বীণা করে
মিলি আজি প্রাণে প্রাণে জনম তীর্থস্থানে
জননীর নাম-গানে, ভাস আনন্দ সাগরে।
কত আর ঘুমে র'বে জাগ রে জাগ রে সবে
ঐ শুন বাজে ভেরী আশার মোহন স্বরে।
সাধনায় সিদ্ধি ফলে, সাধিলে মন্ত্রবলে
এ কথা কণ্ঠ খুলে, ঘোষ সবে ঘরে ঘরে।
গিরি বিদরে যদি, শুষে যায় সিন্ধু-নদী
তথাপি মন্ত্রযোগে সাধিবে মন্ত্র অন্তরে।
হৃদয়ে আরাধনা, রসনার উদ্দীপনা,
আহুতি প্রাণমন, শক্তির সোপান পরে॥

—কালীপ্রসন্ন ঘোষ

দুখিনী মা

নয়ন-জলে গেঁথে মালা পরাব দুখিনী মায়।
ভক্তি-কমল কলি দিব মায়ের রাঙ্গা পায় ॥
শিখ হৃদি উচ্চ শিক্ষা, মাতৃমন্ত্রে লহ দীক্ষা,
ত্যজ স্বার্থ মাগি ভিক্ষা, রহ জননী সেবায় ॥
যে নামে দুরিত হরে, রাখ যত্নে হৃদে ধরে,
অবনী তারে আদরে, জননী প্রসন্না যায় ॥

—[illegible]শচন্দ্র [illegible]োষ

প্রার্থনা

না জাগিলে সব ভারত-ললনা
এ ভারত আর জাগে না জাগে না।
অতএব জাগ, জাগ গো ভগিনি,
হও "বীরজায়া, বীর প্রসবিনী।"
শুনাও সন্তানে, শুনাও তখনি,
বীর-গুণগাথা, বিক্রম-কাহিনী,
স্তন্য দুগ্ধ যবে পিয়াও, জননি,
বীর গর্ব্বে তার, নাচুক ধমনী।
তোরা না করিলে এ মহা সাধনা,
এ ভারত আর জাগে না, জাগে না।

—দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়

আশা

হ'বে কি ভারতে পুনঃ এমন সুদিন,
ভারত-সন্তান কি রে হইবে স্বাধীন ?
ভীষ্ম, কর্ণ, ভীমার্জ্জুন, অশ্বত্থামা আর্য্য দ্রোণ,
জামদগ্ন্য বার পুনঃ জন্মিবে কি কোন দিন ?
কাঁপিবে বিমান পৃথ্বী, পুনঃ বিক্রমে নবীন,
রহিবে না পুণ্যভূমি চির পরাধীন।

—দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়

শেষ-ভিক্ষা

(যবন কর্ত্তৃক সিন্ধু আক্রমণ সময়ে)

দ্বিজ হও, ক্ষত্র হও, বৈশ্য, শূদ্র আর,
যে করেছ একদিন অস্ত্র ব্যবহার।
সেই রণবেশে সাজ, করে খর অসি ভাজ,
নতুবা যবন-হস্তে আর নাই রে নিস্তার।
বধিবে শিশুর প্রাণ, না রবে নারীর মান,
নরাধম, পাত্রাপাত্র করে না বিচার।
বীররক্ত যার শিরায় সে কাপুরুষের প্রায়,
কেমনে দেখিবে এই পাপ ব্যবহার।
অসহায়া রমণীর, রক্ষাহেতু দিবে শির,
যে থাক এমন বীর, ধর রাখি* তার।
এস দলে দলে জুটে, রণক্ষেত্রে যাও ছুটে,
বীর পুত্র, বীর ধর্ম্ম রাখ আপনার।

—দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়

* রক্ষাবন্ধনী

হৃদয়-উচ্ছ্বাস

নির্ব্বাণ আশার দীপ, সব অন্ধকার।
পারি না বহিতে এ পাপ জীবন আর।
রোগে শোকে জীর্ণ জরা, জীয়ন্তে হয়েছি মরা,
মিছে কেন বসুন্ধরা, বহ এ দেহের ভার।
নিজ দেহে দেহ ঠাঁই, মাটি হয়ে মিশে যাই,
লুপ্ত হোক একবারে, শেষ-চিহ্ন অভাগার।
ভালবাসা স্নেহপ্রীতি. মুছে ফেল পূর্ব্ব-স্মৃতি,
বাসিয়াছ যারা ভাল নিজ গুণে আপনার;
কাঁদায়েছি কাঁদিয়াছি, এই শেষ-ভিক্ষা যাচি,
স্মরিও না হতভাগ্যে ফেলিও না অশ্রুধার।
অশ্রুযোগ্য নয় সে যে, কর্ম্মক্ষেত্র যেই ত্যজে,
না উৎসর্গী দেহ-প্রাণ, করিতে দেশ-উদ্ধার।

—দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়

কুলাঙ্গার

"আর্য্য!" আজি এ ভারতে,
নিষ্ঠুর! এ নাম কেন ধ্বনিলে আবার?
মরুভূমে পিপাসায়,
যে জন জ্বলিছে, হায়!
"সুশীতল জল" কাণে কেন কহ তার?
কেন মৃগ-তৃষ্ণিকার কর আবিষ্কার?

ইতিহাসে?—অবিশ্বাস!
ইতিহাস নহে,—অনুমানের সাগর!
তব ইতিহাস কয়,
এই সেই আর্য্যালয়

আমরা সেই বীর্য্যবান্ আর্য্যের কুমার ;
চন্দ্র-সূর্য্য-বংশে, এই জোনাকী-সঞ্চার ?

না, না,—এ যে অসম্ভব !
অসম্ভব,—এই সেই আর্য্যাবর্ত্ত নহে,
কুরুক্ষেত্র মহারণ,
হ'ল যেথা সংঘটন,
সেই আর্য্যাবর্ত্ত—কেন করিব প্রত্যয়—
একটি······ভয়ে কম্পিত হৃদয় !

ছিল যেই—পুণ্যভূমি,
অনন্ত ঐশ্বর্য্য-খনি,—প্রাচুর্য্য-ভাণ্ডার ;
যাহার মলয়ানিলে,
যাহার জাহ্নবী-জলে,
বহিত, ভাসিত, চির-আনন্দ অপার,
আজি তথা দুর্ভিক্ষের ধ্বনি হাহাকার !

এই নহে আর্য্যাবর্ত্ত ;
আমরাও নহি সেই আর্য্যের কুমার ;
তাহাদের বীর্য্যবল,
ছিল যেন দাবানল,
পৃষ্ঠে তূণ, করে ধনুঃ, কক্ষে তরবার,
আমাদের অশ্রুজল, ভিক্ষাপাত্র সার !
কি দোষে না জানি, হায় !
বিধাতার কাছে দোষী আমরা সকল,
তেজোহীন, বীর্য্যহীন,
ততোধিক পরাধীন ;
আমাদের, হায় ! কোন্ পাপের এ ফল ?
করে ভিক্ষাপাত্র,—কণ্ঠে দাসত্ব-শৃঙ্খল !

স্থষ্টিকর্তা !—বল নাথ !—
সর্ব্বশক্তিমান্ তুমি, তবে কি কারণ,
প্রত্যেক পবন-ঘায়,
উঠিতে পড়িতে হায় !
এই ক্ষুদ্র বালিরাশি করিলে সৃজন,—
আর্য্যবংশে কুলাঙ্গার—কলঙ্ক-অর্পণ ?

বিদরে হৃদয়, নাথ !
বল, হায়, কি মঙ্গল করিলে সাধন ?
তীব্র আর্য্য-বংশ-রবি,
বাল্মীকি কল্পনা-ছবি,
অনন্ত রাহুর গ্রাসে করিয়া অর্পণ ?
এই গ্রাসমুক্ত, নাথ ! হবে কি কখন ?

হায় ! যেই আর্য্যনাম
আছিল জগৎপূজ্য ;—আছিল অচল
অটল হিমাদ্রি-সম,
সিন্ধু জিনি' পরাক্রম,
আজি সে বাতাস-ভরে করে টলমল,
আজি সেই নাম ওই পদ্মপত্রে জল !

—নবীনচন্দ্র সেন

হায় মা !

হায় ! মা ভারতভূমি ! বিদরে হৃদয়,
কেন স্বর্ণপ্রসূ বিধি করিল তোমারে ?
কেন মধুচক্র বিধি করে সুধাময়
পরাণে বধিতে হায় ! মধুমক্ষিকারে ?
পাইত না অনাহারে ক্লেশ মক্ষিকায়,
যদি মকরন্দ নাহি হ'ত সুধাসার ,
স্বর্ণপ্রসবিনী যদি না হইতে হায়,
হইতে না রঙ্গভূমি অদৃষ্ট-ক্রীড়ার !
আফ্রিকার মরুভূমি, সুইস্ পাষাণ
হ'তে যদি, তবে মাতঃ ! তোমার সন্তান
হইত না এইরূপ ক্ষীণ কলেবর ;
হইত না এইরূপ নারী-সুকুমার ।
ধমনীতে প্রবাহিত হ'ত উগ্রতর
রক্তস্রোত ; হ'ত বক্ষ বীর্য্যের আধার ।
আজি এ ভারতভূমি হইত পূরিত
সজীব পুরুষ-রত্নে, দিগ্-দিগন্তর
ভারত-গৌরব-সূর্য্যে হ'ত বিভাসিত ;
বাঙ্গালার ভাগ্য আজি হ'ত অন্যতর !

-নবীনচন্দ্র সেন

উৎসর্গ

অরুণ উদিল, জাগিল অবনী ;
জাগিল ভারত দুঃখিনী জননী ;
উঠ মা জননি ! উঠ মা জননি
এই রব যেন কোটি কণ্ঠে শুনি !

ঘোর কোলাহলে ডাকিছে সকলে,
উঠ গো উঠ গো প্রিয় জন্মভূমি !
বিশ কোটি শিশু চারিদিকে যার,
কিসের বিষাদ, কি অভাব তার ?
ঘোর কোলাহলে ওই সবে বলে,
আর ঘুমাইও না ভারত-জননি !

তনু পুলকিত ; ভূত ভবিষ্যৎ
হৃদয়ে উদিত আজ যুগপৎ ।
দেখে বর্ত্তমান সকলেই ম্লান,
কিন্তু আমি দেখি নূতন জগৎ ।
বর্ত্তমান পারে, দেখি দুই ধারে,
অপরূপ দৃশ্য ; দেখি শত শত
ভারতের প্রজা, ভারত-সন্তান,
ওই উচ্চ রবে করিতেছে গান ।
বিশ কোটি লোকে হেথা মগ্ন শোকে
তাদের আনন্দ দেখি অবিরত ।

ওই যে বাল্মীকি, ওই কালিদাস,
ওই ভবভূতি, ওই বেদব্যাস,
ওই যে শঙ্কর, বুদ্ধির সাগর,
তর্কযুদ্ধে বীর নাস্তিকের ত্রাস ।
আরো শত শত নাম করি কত,
ভারত-আকাশে সবে সুপ্রকাশ ।
নাচ্ রে লেখনী, জাগ্ রে হৃদয়,
আজ শত সূর্য্য প্রাণেতে উদয় !
উর গো ভারতি ! ভাল ক'রে সতি,
ভারত-সৌভাগ্য করিব প্রকাশ !

উঠ গো দুর্ব্বল শিশুদের মাতা,
ভাবনা কি তোর বিশ কোটি সুতা ?
বারেক উঠিয়া, নয়ন মুছিয়া,
ভূত ভবিষ্যতে, যে সব জনতা—
নিজ পুত্র বলে' দেখাও সকলে ;
দুটি রত্ন ল'য়ে কর্ণিলিয়া মাতা
করে অহঙ্কার, তুমি গো জননি !
রত্নগর্ভা নিজে, এত রত্নমণি
সকলি তোমার, তবে অহঙ্কার,
কেন না করিবে হ'য়ে হর্ষযুতা ?

চাই না সভ্যতা, চাষা হ'য়ে থাকি,
দেও ধর্ম্মধন, প্রাণে পুরে রাখি।
হায় জন্মভূমি ! পুণ্যভূমি তুমি,
দেও পুণ্যবারি, দগ্ধ প্রাণে মাখি।
তুমি যার তরে, খ্যাত এ সংসারে
আন সে বিশ্বাস, তাই ল'য়ে থাকি।
সভ্যতা সভ্যতা ক'রে লোকে ধায়,
কই তা'তে সুখ ? মরীচিকা প্রায়—
প্রতিপদে দূরে, ওই যায় সরে
তোমার সন্তানে ওই দিল ফাঁকি !

দেখে অধীনতা ঘোর কাল-রাতি,
সব শত্রু মিলে জ্বালিয়াছে বাতি ;
যাহা কিছু ছিল, সকলি হরিল,
পড়িয়া রহিল শুধু তোর খ্যাতি !
সভ্যতার নামে, আসি আর্য্যধামে
নর-শত্রু যত, করিছে ডাকাতি !

যাক্ এ সভ্যতা, দেও সে বিশ্বাস,
দেও সে নির্ম্মল হৃদয়-আকাশ ;
দেও সে বৈরাগ্য, ভারত-সৌভাগ্য,
আমি পুনরায় ধর্ম্ম ল'য়ে মাতি !

যার আছে ভাষা, দিক্ সে রসনা ;
কবি যদি থাকে, দিক্ সে কল্পনা ;
শিবরাত্রি মত, থাক্ অবিরত,
জ্বালায়ে সলিতা ব'সে যত জনা।
হ'বে না কথাতে, কেবল লেখাতে,
করিতে হইবে কঠোর সাধনা।
চরিত্রের শোভা চাই দেখিবারে,
ভারত-সন্তান তবে বলি তারে ;
নতুবা লিখিতে, অথবা বলিতে,
আমিও তো পারি তাতে কি বলো না ?

ও রে পতিব্রতা বিধবা হইয়ে,
যে রূপেতে থাকে ব্রহ্মচর্য্য লয়ে,—
আয় সে প্রকার, থাকি শুদ্ধাচার,
মৃত-স্বাধীনতা-ধনে উদ্দেশিয়ে।
যদি দিন আসে, তবে রে উল্লাসে,
নাচিব গাহিব সকলে মিলিয়ে !
যত দিন নাহি সেই দিন আসে,
থাক্ অমানিশি ভারত-আকাশে ;
আশার সলিতা, রাবণের চিতা,
জ্বালায়ে সকলে থাকি রে বসিয়ে !

—শিবনাথ শাস্ত্রী

গভীর নিশীথে

গভীর রজনী ! ডুবেছে ধরণী,
জাগ্ রে জাগ্ রে সাধের লেখনী !
প্রাণপ্রিয় ভাই ভারত-সন্তান !
জাগ্ রে সকলে শোন্ করি গান।
ভারতের গতি, ভারত-নিয়তি,
ভেবে আজ কেন, উথলিল প্রাণ !

কা'র কথা ভাবি, কোন্ দিক দেখি,
সব অন্ধকার যে দিকে নিরখি !
কোটি কোটি লোক অজ্ঞান-আঁধারে
চিরমগ্ন, যেন আছে কারাগারে ;
দারিদ্র্য-ভাবনা, অসহ্য যাতনা,
শোণিত শুষিছে তাদের সংসারে,
নির্ব্বাক্ হইয়া কাঁদে পরস্পরে !

অভদ্র কি ভদ্র লোক শত শত
অনাহারে শীর্ণ দেখি অবিরত ;
না যেতে যৌবন তাদের নয়নে
বিষাদ নিরাশা দেখি এক সনে ;
দারিদ্র্য-যাঁতায় প্রাণ পিষে যায়,
চূর্ণ আশা যত কঠোর ঘর্ষণে,
সে মুখ ভাবিলে ঘুমাই কেমনে ?

আজ কি ঘুমায়ে থাকি জাগরণে,
কাজ কি বিশ্রামে খাটি প্রাণপণে,
এ ঘোর দুর্দ্দশা ঘুমালে কি যায় !
বিন্দু বিন্দু রক্ত পড়ুক ধরায়,
তিল তিল ক'রে আয় যাই ম'রে ;

বল বুদ্ধি মন   মিলিয়া সবায়
আয় ধরে দিই   ভারতের পায় !

উৎসাহেতে পুড়ে   মরিব আকালে,
তাও যদি হয়,   হোক্ রে কপালে !
বুঝিয়াছি বেশ,   দিতে হবে প্রাণ,
তবে রে জাগিবে   ভারত-সন্তান !
আয় জন কত   ধরি এই ব্রত
খাটিয়া জীবন   করি অবসান,
তবে যদি জাগে   ভারত-সন্তান !

আয় রে বোম্বাই !   আয় রে মান্দ্রাজ !
বৃথা গণ্ডগোলে   নাহি কোন কাজ,
ভারতের তোরা   অমূল্য রতন
আয় সবে মিলে   করি জাগরণ ;
মিলে পরস্পরে,   দেশের উদ্ধারে
আয় দেখি সবে   করি প্রাণপণ,
দেখি রে দুর্দ্দশা   না যায় কেমন !

ভাই মহারাষ্ট্র !   তোমার কপালে,
পৌরুষের আভা   আছে চিরকালে।
দাঁড়াও আসিয়া   কাছে একবার,
মুখ দেখে আশা   বাড়ুক আমার ;
সাহসের কথা,   শুনে যাক্ ব্যথা,
প্রিয় ভারতের   হোক রে উদ্ধার ;
জয় মহারাষ্ট্র   জয় রে তোমার !
আয় রাজপুত,   আয় প্রিয় শিখ,
জাতি-ধর্ম্ম-ভেদ   সকলি অলীক,
ভারত-রুধির   সবার শরীরে,
ভাই ব'লে নিতে   তবে শঙ্কা কি রে !

আয় ভাই ব'লে দিব প্রাণ খুলে,
ভাই হ'য়ে রব তোদের মন্দিরে,
ক'রো না রে ঘৃণা ভীরু বাঙ্গালীরে।

পাইয়াছি শিক্ষা, পেয়েছি ত মান,
তোরা ভাই সব আছিস্ অজ্ঞান।
তা ব'লে ভেবো না করিব মমতা,
আর বলিব না সুশিক্ষার কথা,
তোদের যে গতি আমারো সে গতি,
তো'দিকে ফেলিয়া চাই না সভ্যতা,
সবে এক হ'য়ে থাকিব সর্ব্বথা।

শেষে ডেকে বলি ওরে যুন ভাই,
প্রাচীন শত্রুতা প্রয়োজন নাই।
দেশের দুর্দ্দশা দেখ্ হলো ঢের,
তোরা ত সন্তান প্রিয় ভারতের।
সে শত্রুতা ভুলে আয় প্রাণ খুলে,
—পুতে রাখ্ কথা মশ্লেম্, কাফের—
বল শুধু—"মোরা প্রিয় ভারতের!"

ভারতের তোরা, তোদের আমরা,
আয় পূর্ণ হলো আনন্দের ভরা!
সবে এক দশা তবে অহঙ্কার,
তবে রে শত্রুতা শোভে না যে আর!
মিলি ভাই ভাই জয়ধ্বনি গাই,
ঘুরিয়া বেড়াই শুভ সমাচার,—
"আমাদের মাতা বাঁচিল আবার!"

—শিবনাথ শাস্ত্রী

মাতৃস্তোত্র

নমো নমঃ জননী,
অশেষ-গুণধারিণী।
নিত্য-সরসা চিত্ত-হরষা
রৌদ্র-কনক-বরণী।
শষ্প-শ্যামলা, কুন্দ-ধবলা,
অম্বু-মেখলা-ধারিণী।
নিত্য-নবীনা, চিত্ত-দ্রাবিণা,
সপ্তস্বর-সুভাষিণী।
তুঙ্গ-হৃদয়া, দিক্-বলয়া,
স্নিগ্ধ মলয়শ্বাসিনী।
দীপ্তি-প্রোজ্জ্বলা, চন্দ্রকুণ্ডলা,
অক্ত-বিলোল-লোচনী।
স্রোত-মধুরা, নীর-ক্ষীরধারা,
সন্তাপ-জরানাশিনী।
জ্যোৎস্না-মধুর-হাসিনী।
পল্লী-শোভনা, মল্লী-ভরণা,
দ্রুম-চামরধারিণী।
লোক-বন্দিতা, দেব-বন্দিতা,
জ্ঞান-বিজ্ঞান-বাদিনী।
লক্ষ-প্রসূতা, মোক্ষ-জ্ঞানদা,
অযুত-সুতশালিনী।
কৃত্য-কুশলা, চিত্ত বহুলা,
চিত্ত-বেদনহারিণী,
জয়দে, জয়দায়িনী ;
নমো নমঃ জননী।

—গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

সঙ্কল্প

এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন,
এক কার্য্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন।
আসুক সহস্র বাধা, বাধুক প্রলয়,
আমরা সহস্র প্রাণ রহিব নির্ভয়।
আমরা ডরাইব না ঝটিকা-ঝঞ্ঝায়;
অযুত তরঙ্গ বক্ষে সহিব হেলায়;
টুটে তো টুটুক এই নশ্বর জীবন,
তবু না ছিঁড়িবে কভু সুদৃঢ় বন্ধন।
আসুক সহস্র বাধা, সহস্র প্রলয়,
আমরা সহস্র প্রাণ রহিব নির্ভয়।

—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

আহ্বান

চল্ রে চল্ সবে ভারত-সন্তান, মাতৃভূমি করে আহ্বান!
বীরদর্পে পৌরুষ গর্ব্বে সাধ্ রে সাধ্ সবে দেশের কল্যাণ।
পুত্র ভিন্ন মাতৃদৈন্য কে করে মোচন?
উঠ, জাগ সবে, বল মাগো, তব পদে সঁপিনু পরাণ!
এক তন্ত্রে কর তপ, এক মন্ত্রে জপ,
শিক্ষা-দীক্ষা-লক্ষ্য-মোক্ষ এক, এক সুরে গাও সবে গান।
দেশ দেশান্তে যাও রে আন্তে, নব নব জ্ঞান।
নব ভাবে, নবোৎসাহে মাতো, উঠাও রে নবতর তান।
লোক-রঞ্জন, লোক-গঞ্জন না করি দৃক্‌পাত;
যাহা শুভ, যাহা ধ্রুব, ন্যায়, তাহাতে জীবন কর দান।
দলাদলি সব ভুলি, হিন্দু-মুসলমান;
এক পথে, এক সাথে চল, উড়াইয়ে একতা-নিশান।

—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারত-গান

দিবস বিগত, তবুও, ভারত !
নহিল বিগত দুখ তোমার ?
রজনী আইল, আবার ছাইল
　　শোকের উছাস মুখ তোমার ।
পূরব আকাশে আঁধার ধায়,
বদন তোমার আঁধার তায়,
তপত করিছে শীতল বায়
　　দুখ-নিপীড়িত বুক তোমার ।
শিশির-শীকর ঝরে ধীরে ধীরে
শরীর তোমার ভাসে আঁখি-নীরে,
আরো কত দিন, ওরে দুখিনি রে,
　　দুখ-নীরে পড়ি দিবি সাঁতার !

—রাজকৃষ্ণ রায়

ভারত-বিলাপ

কি গাইব আজি, হায়, কি আছে ভারতে আর ?
হু-হু করে প্রাণ-মন, ধূ ধূ করে চারি ধার !
যে দিকে ফিরাই আঁখি, অনিমেষে চেয়ে থাকি,
শূন্যময় সব দেখি, শূন্যে রব হাহাকার ।
ভারত—ভারত নয়, কেবল শূন্যতাময়,
কায়ার কেবল ছায়া, নাহিক জীবন ;—
তাই আজি খেদে কই,—বেদের ভারত কই ?
অধীন ভারতে, হায়, এ যে শুধু অশ্রুধার !

—রাজকৃষ্ণ রায়

আক্ষেপ

হায় কি তামসী নিশি ভারত-মুখ ঢাকিল।
সোনার ভারত আহা ঘোর বিষাদে ডুবিল॥
শোক-সাগরেতে ভাসি, ভারত-মা দিবানিশি,
স্মরি পূর্ব্ব যশোরাশি, কান্দিতেছে অবিরল;
কে এখন নিবারিবে, জননীর অশ্রুজল!

—উপেন্দ্রনাথ দাস

বীণা

বাজ্ রে গম্ভীরে বীণা একবার,
ভারতের জয় কর্ রে ঘোষণা,
জলদ নির্ঘোষে উঠাও ঝঙ্কার,
ঘোর রবে বীণা বাজ্ রে আমার!

ওরে তন্ত্রি, রাখ, প্রেম-গুঞ্জরণ,
বিরহের গান গেও না এখন।
মৃত-সঞ্জীবনী-সঙ্গীত উঠাও,
জাগাও, নিদ্রিত ভারতে জাগাও।

সে গম্ভীর নাদে ডুবাও অম্বর,
কাঁপাও জলধি, পর্ব্বত-কন্দর,
কর মৃতদেহে শোণিত-সঞ্চার,
ঘোর রবে বীণা বাজ্ রে আমার!

মা'র এ দুর্দ্দশা দেখা নাহি যায়!
সকলই জাগিল, উঠিয়া বসিল,
মহিমার তাজ মাথায় পরিল,
ভারত কি তবে,—প্রাণ ফেটে যায়—

ভারত কি তবে রহিবে নিদ্রায় ?
ভারত কি তবে লুটাবে ধূলায় ?
ধ্বনিত করিয়া কানন-কান্তার,
ঘোর রবে বীণা বাজ্ রে আমার

বাজ্ ঘোর রবে ঘন ঘন বীণ,
গাও চিরদিন রবে না কুদিন !
হে ভারতবাসী, হে আর্য্যতনয়,
চেয়ে দেখ, প্রাচী আজ প্রভাময়

নিদ্রা পরিহরি উঠ ত্বরা করি,
পোহাইল তব কাল বিভাবরী ;
এই কি সময় নীরব থাকার ?
ঘোর রবে বীণা বাজ্ রে আমার

ঘরে ঘরে যাও, আর্য্যগুণ গাও,
ভারত-সঙ্গীতে দিগন্ত ডুবাও,
আর্য্যহৃদিরূপ শুষ্ক সরোবরে
আশার তরঙ্গ আবার উঠাও,
গর্জ্জে সিংহ যথা বীর অবতার,
ঘোর রবে বীণা বাজ্ রে আমার !

সুধার সুধারা ঢেল না রে আর,
তাতে জাগিবে না জননী আমার ।
'মেঘ-মল্লারে'র নহে রে সময়,
'বসন্ত' 'হিন্দোলে' তোষে না হৃদয়.
জ্বলন্ত 'দীপক' ধরিয়া এখনি,
জ্বাল চারিভিতে উৎসাহ-অনল,
মৃত ভারতের হেম মূর্ত্তিখানি,
সে অনলে পুড়ি কর্ রে উজ্জ্বল ।

সে অনলে পুড়ি কর্ ছারখার,
আলস্য, জড়তা, দৈত্য দুরাচার !
সে অনলে পুড়ি কর্ ছারখার,
বিলাসী বাঙ্গালী আর্য্যকুলাঙ্গার !
সে অনলে পুড়ি কব্ ছারখার,
—স্মৃতি বিরচিত সহস্র বর্ষের—
ভারতেতিহাস যন্ত্রণার সার !
ছাড়ি' অন্যালাপ বাজ্ একবার,
ঘোর রবে বীণা বাজ্ রে আমার !
ভারত-খাণ্ডবে সবে মিলে আজ,
উৎসাহ-অনল প্রজ্বলিত কর ;

সে অগ্নিকুণ্ডেতে করিয়া বিরাজ,
স্নিগ্ধ কর সবে দগ্ধ কলেবর।
সে অনল-শিখা করিয়া গৰ্জ্জন,
হিমাদ্রির চূড়া পরশিবে যবে,
সে অনল-শিখা ভারত-সাগরে
বাড়বাগ্নি যবে বৰ্দ্ধিত করিবে,
সে অনল যবে তৰ্জ্জন করিয়া
আনন্দে করিবে ব্যোম আলিঙ্গন,
দেখিও রে তাহা নীরবে বসিয়া
রোম দগ্ধ 'নীরো' দেখিল যেমন !
কিন্তু যত দিন মায়ের এ দশা,
এ মহীমণ্ডলে কি সুখ তোমার ?
ত্যজি নিদ্রা, ত্যজি তুচ্ছ সুখ-আশা,
ঘোর রবে বীণা বাজ্ রে আমার !

—দীনেশচরণ বসু

ধিক্কার

নিয়েছ যে ব্রত, পালনে বিরত থেক না থেক না বঙ্গবাসিগণ,
ব্রতভঙ্গ হ'লে হাসিবে সকলে, দেশের কলঙ্ক ছাইবে ভুবন।
কঠিন আঘাতে না হ'লে চৈতন্য, ঘুচিবে না আর দেশের দুঃখদৈন্য,
খাট প্রাণপণে স্বদেশের জন্য, জাগিয়া উঠুক্ জাতীয় জীবন।
সবাই মোরা হুজুগেতে মাতি, ঘুচাও এ কলঙ্ক জাতীয় অখ্যাতি,
কার্য্যে দেখাও সবে মোরা আর্য্যজাতি, দেশহিতে দাও আত্মবিসর্জ্জন।
এত অপমানে না জাগিলে প্রাণ, জাগিবে না কভু ভারত-সন্তান,
জলাঞ্জলি দিয়ে জাতি-কুল-মান, কি সুখে করিছ জীবন ধারণ?
পরাধীন জাতি প্রাণ সঁপেছ পরে, লালায়িত সদা গোলামীর তরে,
দেশের দশা হেরি হৃদয় বিদরে, করিতেছ শিরে পাদুকা-বহন।
না হ'লে এ জাতি অসারের অসার,
সোনার বাঙ্গালা কেন হবে ছারখার?
না জানি কি কোপ বঙ্গে বিধাতার,
(বুঝি) দেব-অভিশাপে দেশের পতন।
বিশ কোটি ছেলে যে মায়ের ঘরে,
তার এ দুর্দ্দশা দেখিস্ কেমন করে?
কামার-কুমার-তাঁতি অন্নাভাবে মরে,
মড়ার মত আছিস্ ঘুমে অচেতন।

—চন্দ্রনাথ দাস

বঙ্গচ্ছেদ

ওরা জোর ক'রে দেয় দিক্ না বঙ্গ বলিদান।
আমরা রব অন্তরঙ্গ, এক অঙ্গে মনের সঙ্গে মিশিয়ে প্রাণ।
আমরা জাত বাঙ্গালী প্রেম-কাঙ্গালী—
ভাবচিস্ তোরা মন ভাঙালি,
তা' নয়, জ্বালিয়ে আগুন, ক'রে দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিলি প্রাণের টান।
আমাদের চোখ ফিরেছে মায়ের কুঁড়েতে,
বিদেশী চিনির চেয়ে দেশের গুড়েতে,
আবার কর্কচেতে হয়েছে রুচি, চাই নে তোদের লবণ দান।
আমাদের ভাতের সঙ্গে তাঁত বজায় থাক্,
নাই বা দেখাই সাজের জাঁক,
তোদের এই চক্‌চকান মধুর চাকে, কর্‌বো না আর বিষ পান।
তোদের কাচের বাসন কাচের চুড়ি,
ফেল্‌বো ভেঙ্গে মেরে তুড়ি,
করে দেবতা সাক্ষী, ঘরের লক্ষ্মী, শাঁখার আবার রাখবে মান।
তোদের শাপে হ'ল আশীর্ব্বাদ
দৃঢ় হ'ল মনের বাঁধ,
এই বিসংবাদে বঙ্গভেদে, আমরা হলুম আবার তেজীয়ান্।
পেয়ে মর্ম্মে আঘাত, কর্ম্মে হাত, বাকি্য ছেড়ে দেবে বুদ্ধিমান্।

—অমৃতলাল বসু

ভারত-সন্তান

উঠ উঠ উঠ সবে, ভারত-সন্তানগণ ।
থেকো না থেকো না আর মোহনিদ্রায় অচেতন ॥
পোহাইল দুঃখনিশি, সুখ-সূর্য্য ঐ রে,
পথিক বলে হাসিতেছে দেখ রে মেলে নয়ন ।
ঘোরতর অন্ধকার, পাপ-নিশাচর আর,
ঐ দেখ পোহাইল, আর দুঃখ রবে না ;
জ্ঞানালোক প্রকাশিল, সুপবন বহিল,
ভারত-কাননে ডাকে, আশা-বিহঙ্গিনীগণ ॥
সুপ্রভাতে শুভক্ষণে, চলে সবে সযতনে,
আলস্য-ঔদাস্য বশে আর কেহ থেকো না ;
প্রেমের পতাকা তুলি বিভুপদ স্মরি রে
ভাসাও জীবনতরী কর শীঘ্র আয়োজন ॥

—আনন্দচন্দ্র মিত্র

ভারত-প্রতিমা

ভারত-মূরতি কেমনে আঁকিব,
কলঙ্ক এত যে, কি দিয়ে ঢাকিব ?
গৌরব-তপনে শোভিত বদন,
কেমনে সেখানে তিমির মাখিব ?
সুখ চন্দ্রহার ছিল বক্ষে তার,
তাহে পদাঘাত কেমনে লিখিব ?
স্বর্ণ সিংহাসন যাহার আসন
কেমনে তাঁহারে ধূলাতে রাখিব ।

—আনন্দচন্দ্র মিত্র

আত্মতৃপ্তি

কি আলোক জ্যোতি আঁধার মাঝারে, কি পুলকে প্রাণ-ছায় !
ফুটিল এনাকি অন্ধ নয়ন—সমুখে নেহারি কায়।
আপনার মায়ে পেয়েছি দেখিতে, চিনিয়াছি ভাই-বোন.
কেন তবে দূরে দাঁড়ায়ে—আজি মহোৎসব সম্মিলন !
আজিকার দিনে ভোল আত্মপর, থেকো না আপন লয়ে,
অনাথ জনের জুড়াও যাতনা প্রেমের অমৃত দিয়ে !
শত হৃদয়ের দলরাশি মিলে একটি পরাণ হোক,
এক হয়ে যাক্ শত হৃদয়ের হরষ-বিষাদ-শোক !
শত কণ্ঠ তুলে অনন্তের সুরে গাহ রে মিলন গান,
অসীম আকাশে উথলি উঠুক বিমল মধুর তান।
স্বরগের শান্তি আনিবে বহিয়ে আকুল সে প্রেম গান,
পবিত্র হইবে মলিন পৃথিবী তৃষিত পাইবে প্রাণ।

—স্বর্ণকুমারী দেবী

প্রতিজ্ঞা

শত কণ্ঠে কর গান জননীর পূত নাম,
মায়ের রাখিব মান—লয়েছি এ মহাব্রত।
আর না করিব ভিক্ষা, স্বনির্ভর এই শিক্ষা,
এই মন্ত্র, এই দীক্ষা, এই জপ অবিরত।
সাক্ষী তুমি মহাশূন্য, না লব বিদেশী পণ্য,
ঘুচাব মায়ের দৈন্য,—করিলাম এ শপথ।
পরি ছিন্ন দেশী সাজ, মানি ধন্য ধন্য আজ,
মায়ের দীনতা-লাজ হবে দূর-পরাহত !

এই আমাদের ধর্ম্ম, এই জীবনের কর্ম্ম,
এই মন্ত্র, এই ধর্ম্ম—এই আমাদের মুক্তিপথ।
নমো নমো বঙ্গভূমি, মোদের জননী তুমি,
তোমার চরণে নমি, নরনারী মোরা যত ॥

—স্বর্ণকুমারী দেবী

স্বদেশ

স্বদেশ স্বদেশ কর্চ্ছ কারে? এ দেশ তোমার নয়;
এই যমুনা গঙ্গানদী, তোমার ইহা হ'ত যদি?
পরের পণ্যে, গোরাসৈন্যে জাহাজ কেন বয়?
গোলকুণ্ডা হীরার খনি, বর্ম্মা ভরা চুনি-মণি,
সাগর সেঁচে মুক্তা বেছে পরে কেন লয়?
স্বদেশ স্বদেশ কর্চ্ছ কারে—এ দেশ তোমার নয়!

এই যে ক্ষেতে শস্য ভরা, তোমার ত নয় একটি ছড়া
তোমার হ'লে তাদের দেশে চালান কেন হয়?
তুমি পাও না একটি মুষ্টি, মর্‌ছে তোমার সপ্ত গোষ্ঠী,
তাদের কেমন কান্তি পুষ্টি—জগৎ-ভরা জয়!
তুমি কেবল চাষের মালিক, গ্রাসের মালিক নয়!
স্বদেশ স্বদেশ কর্চ্ছ কারে? এ দেশ তোমার নয়।

এই যে জাহাজ, এই যে গাড়ী, এই যে পেলেস, এই যে বাড়ী,
এই যে থানা, জেহেলখানা—এই যে বিচারালয়,
লাট, ছোটলাট, তারাই সবে, জজ ম্যাজিষ্টর তারাই হবে,
চাবুক খাবার বাবু কেবল তোমরা সমুদয়—
বাবুর্চ্চি, খানসামা, আয়া, মেথর মহাশয়!
স্বদেশ স্বদেশ কর্চ্ছ কারে? এ দেশ তোমার নয়!

আইন-কানুনের কর্ত্তা তারা, তাদের স্বার্থ সকল ধারা,
রিজার্ভ করা সুখ-সুবিধা তাদের ভারতময় ;
তোমার বুকে মেরে ছুরি, ভরছে তাদের তেরেজুরি,
তাদের চার্চ্চে, তাদের নীচে তাদের বলে ব্যয় ;
একশ' রকম টেক্‌স দিবা, ব্যয়ের বেলায় তোমরা কেবা,
গাধার কাছে বাঁধার বল, বাঘের কবে ভয় ?
স্বদেশ স্বদেশ কর্চ্ছ কারে ? এ দেশ তোমার নয় ?

স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে ? এ দেশ তোমার নয় ?
যে দেশ যাদের অধিকারে, তারাই তাদের বল্‌তে পারে
কুকুর মেকুর ছাগল কবে দেশের মালিক হয় ?
যে সব বাবু বিলাত গিয়ে, বাবুনীদের সঙ্গে নিয়ে,
প্রসবিয়ে আনছে তাদের শাবক সমুদয়,
ব্রিটিশ-বরণ ব'লে দাবি, কল্লে নাকি বিলাত পাবি ?
লজ্জাহীনের গোষ্ঠী তোরা নাই কি লজ্জা-ভয় ,
এই যদি রে ব্রিটিশ-বরণ মরণ কারে কয় ?
স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে ? এ দেশ তোদের নয়

কার স্বদেশে কাদের মেয়ে, এমনতর পথে পেয়ে,
জোর জবরে গাড়ীর ভিতর শাড়ী কেড়ে লয় ?
নপুংসকের গোষ্ঠী তোরা, জন্ম-অন্ধ, কানা খোঁড়া,
ভিস্তিয়ালা, পাঙ্খাকুলী—পীলা ফাটার ভয় !
কার স্বদেশে সর্ব্বনেশে এমন অভিনয় ?
স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে ? এ দেশ তোদের নয় !

যাহার লাঠি তাহার মাটি চিরদিনের কথা খাঁটী,
এ ত নহে চা'র পেয়ালা, চুমুক দিলে জয় !
দেখতে যারা কাঁপে ডরে, মারবার আগে আপনি মরে,
ঘুষির বদল খুসি করে—'সেলাম মহাশয় !'
স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে ? এ দেশ তোদের নয় ।

স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে ? এ দেশ তোমার নয় ?
সোনার বাংলা, সোনার ভূমি, হীরার ভারত বল্লে তুমি,
ভারত তোমার আস্‌বে কোলে এই কি মনে লয় ?
'সোনা', 'যাদু' মিষ্টি ভাষে, ছেলে মেয়ে কোলে আসে,
স্বরাজ তাহে নারাজ, চাহে কাজের পরিচয় !
কবির কথায় তুষ্ট নহে 'ভবি' মহাশয়।
স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে ? এ দেশ তোদের নয়।

তাদের রাজ্যে তোদের থাকা, তাদের ব্যাঙ্কে তোদের টাকা,
তাদের নোটে ভারত ঢাকা—বিশাল হিমালয়।
তাদের কলে তোরাই কুলী তারাই নিচ্ছে টাকাগুলি
তোদের কেবল ভিক্ষার ঝুলি—ক্ষুধায় মৃত্যু হয়।
তারাই রাজা, তারাই বণিক্, তারাই সমুদয়।
স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে ? এদেশ তোদের নয়।

কিসের বা তোর নেপাল, ভুটান, সবাই তাদের পায়ে লুটান,
কুত্তার মত পুচ্ছ গুটান—শিয়াল দেখে ভয়।
ওই যে ওদের "কাটামুণ্ড" সত্যই ও কাটা মুণ্ড,
রাহুর যেমন মরা তুণ্ড হাঁ করিয়ে রয় !
কেতুর মত পুচ্ছ লুটান ভূটান মহাশয় !
স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে ? এ দেশ তোদের নয় !

করদ-মিত্র-নবাব-রাজা, সবাই দেখি দক্ষ সাজা,
একটাও নয় মানুষ তাজা—অজার মাথা বয়।
ওগুলা সব মানুষ হলে, কোন্ দিকে কে যেত চলে,
ডেনিস পেনিস টেনিস খেলে ভারতভূমি লয় ?
মরুদেশের গরু কাটা ভারত করে জয় ?
স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে ? এ দেশ তোদের নয়।

যখন বাদশা মুসলমান, তখন তাদের "হিন্দুস্থান",
ইংরেজ "ইণ্ডিয়া" বলে' এখন কেড়ে লয়।

অযোধ্যা কই—'আউধ' এ যে, দাক্ষিণাত্য—'ডেকান' সে যে,
'সিলোনে' গিলিছে লঙ্কা—মুক্তা-মণিময়।
ডমাউন আর ডিউ গোয়া, চুনি-পান্না সোনার মোয়া,
যায় না তাদের ধরা ছোঁয়া কে দেয় পরিচয়?
বারণাবত-ইন্দ্রপ্রস্থ, কই সে তোদের সে সমস্ত,
দিল্লীর পরে' 'ডীল্লী' হলো, আরো বা কি হয়!
স্বদেশ বলে কর্‌লে দাবী, আর কি তোরা এ দেশ পাবি?
এ নয় তোদের ভারতবর্ষ চির-হর্ষময়!
স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে? এ দেশ তোদের নয়

স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে? এ দেশ তোদের নয়
কই সে শিল্প, কই সে কৃষি, কই সে যজ্ঞ, কই সে ঋষি,
কই সে পুণ্য তপোবনে ব্রহ্মবিদ্যালয়?
কোথায় বা সে ব্রহ্মচর্য্য, অসীম স্থৈর্য্য, অসীম ধৈর্য্য,
কই বা উগ্র সে তপস্যা—ইন্দ্রে লাগে ভয়?
কোথায় অসীম শৌর্য্যে বীর্য্যে অসুর-পরাজয়?
স্বপ্নে দেখে গোলাগুলী চমকে উঠিস্ ভেড়াগুলি,
উইয়ের ঢিবি দেখে তোদের শিবির বলে ভয়!
প্রতিজনের প্রতি বক্ষে, কোটি কোটি লক্ষে লক্ষে,
কই সে তাদের, দেশভক্তির দুর্গ সমুদয়?
বিশ্বগ্রাসী অগ্নিসিন্ধু, কই সে বুকের রক্তবিন্দু,
স্পর্শ থাকুক, দর্শনে তার শত্রু-কুলক্ষয়!
লোহার চেয়ে মহা শক্ত ভক্তবীরের মাংসরক্ত,
তাদের বুকের অস্থি দিয়া বজ্র তৈয়ার হয়,
ব্রহ্মাবর্ত্তে প্রথম আসি' তাইতে তারা দৈত্য নাশি'
পুণ্যভূমি ভারতভূমি প্রথম করে জয়!
তাদের 'স্বদেশ' ভারত ছিল, তোদের স্বদেশ নয়।

—গোবিন্দচন্দ্র দাস

জগন্নাথের রথযাত্রা

আবার লইয়ে রথ, উজলিয়ে এ ভারত,
যদি হে আসিলে জগন্নাথ,
কিন্তু কেন রথ খালি, হে কৃষ্ণ, হে বনমালি,
কোথা সে অর্জ্জুন তব সাথ ?
এলে বটে পুনরপি, কোথা সেই ধ্বজ-কপি,
শুনি না সে ভীষণ চীৎকার,
শত্রুর শোণিতমাখা, কোথা সে রথের চাকা,
মেদ-মজ্জা ক্লেদ চিহ্ন তার ?
কোথা সেই শঙ্খ-রব স্তিমিত স্তম্ভিত সব,
দিগন্ত ভাঙ্গিয়া কই ছুটে ?
কোথা সে গাণ্ডীব ধনু, লৌহময় ভীমতনু,
অর্জ্জুনের বজ্র করপুটে ?
কোথা রাজা যুধিষ্ঠির, কোথা বৃকোদর বীর,
সহদেব, কোথা সে নকুল ?
আজিও অজ্ঞাতবাস, আজো বিরাটের দাস,
আজিও কি ভাঙ্গে নাই ভুল ?
আজিও কি শমী গাছে, সে ধনুক বাঁধা আছে,
বর্ম্ম-চর্ম্ম-গদা-অসি-পাশ ?
আজিও কি শবরূপে, রয়েছে সমাধি স্তূপে,
মহাশক্তি ব্রহ্মাণ্ড বিনাশ ?
কল্পনা আশার নেত্রে, এ পুণ্য ভারতক্ষেত্রে,
কুরুক্ষেত্র চেয়ে আছে আজি ;
বাধিল ভীষণ রণ, কৌরব-পাণ্ডবগণ,
দুই দিকে দুই দল সাজি ।
কোথা বীর ধনঞ্জয়, রহিয়াছে এ সময়,
কেন সে হয় না আগুসার ?

ক্লীব-কাপুরুষবেশে, ঘৃণিত দাসত্ব-ক্লেশে,
জীবন যাপিবে কত আর ?
সৈরিন্ধ্রী ভারত-রাণী, হায় কি কলঙ্ক-গ্লানি,
কীচক করিছে অপমান !
পাপিষ্ঠে হরিছে বস্ত্র, পাণ্ডব নিঃস্ব নিরস্ত্র,
নাহি হয় তেজে আগুয়ান !
দেও গীতা উপদেশ, আবার জাগুক দেশ,
ভীরুতা করিয়া পরিহার ;
জাগুক অর্জ্জুন শত, লইয়া স্বদেশ-ব্রত,
গাণ্ডীব ধরিয়া পুনর্ব্বার।
বাজাইয়া পাঞ্চজন্য, ভারত করিয়া ধন্য,
লইয়া এস হে সব্যসাচী ,
তুমি হে সারথি যার, নিশ্চয় বিজয় তার,
তব পানে তাই চেয়ে আছি।

—গোবিন্দচন্দ্র দাস

প্রার্থনা

আর সহে না, সহে না, জননী, এ যাতনা আর সহে না।
আর নিশিদিন হয়ে শক্তিহীন, পড়ে থাকি প্রাণ চাহে না
তুমি মা অভয়া জননী যাহার,
কি ভয় কি ভয় এ ভবে তাহার,
দানবদলনী, ত্রিদিবনাশিনী, করাল-কৃপাণী তুমি মা ॥
উর, মা আজিকে সে রূপে পরাণে,
ডাকি মা কালিকে ! ডাকি মা সঘনে,
নয়নে অশনি জাগাও জননী, নহিলে এ ভয় যাবে না ॥

উর, মা বাহুতে শকতিরূপিণী,
উর, মা হৃদয়ে, ও রণরঙ্গিণী,
রিপুদল মাঝে সন্তান ল'য়ে দাঁড়াও মা হৃদয়রমা।
প্রলয় হুঙ্কারে হর হৃদি হতে
উঠিয়ে দাঁড়া মা, এ ভবের মাঝে,
শোণিত-তরঙ্গে মাতি রণরঙ্গে মাভৈঃ বাণী আজি শোনা মা।
নৃমুণ্ডমালিনী তুই মা কল্যাণী,
তুই শিবে শিব-মনোমোহিনী,
বিনে তোর কৃপা, বিনে তোর কৃপাণ, ভারত-বন্ধন ঘোচে না॥

—বিপিনচন্দ্র পাল

রুদ্ররূপে এসো

বাজায়োনা আর মোহন বাঁশী
আজি রুদ্ররূপে ভীমবেশে প্রকাশ' পরাণে আসি॥
বন্ধ কর সব কুসুম গন্ধ,
রুদ্ধ কর মলয় মন্দ,
স্তব্ধ কর যত ললিত সুছন্দ, প্রকাশি অট্টহাসি।
জীবন-মায়া আজি কর হে ভিন্ন,
দয়া-বন্ধন কর হে ছিন্ন,
জাগাও সংহার জগত-পূর্ণ প্রলয়-পয়োধি-রাশি॥
দলিত কর হে চরণতলে
সকল ভীরুতা সব দুর্ব্বলে,
ভীম অসি ধরে, শ্মশানে মশানে, ভীষণ সাজাও আসি॥

—বিপিনচন্দ্র পাল

আত্মবিলাপ

গেল গেল সবই গেল আর কি ফিরিবে না দিন।
ক্রমে রসাতলে, গভীর অতলে, ভারত হ'বে বিলীন ॥
যে ভারত ছিল ভুবনমোহিনী, দেশে দেশে হ'ত যার জয়ধ্বনি,
প্রতাপে যাহার কাঁপিত অবনী, সে আজ ভিখারী দীন।
কত ছিল মান, কত যে বিভব, কৃষিতে সৌরভ, বাণিজ্যে গৌরব ;
আছে মাত্র স্মৃতি, আছে মাত্র রব, হায় রে আজিকে দুর্দ্দিন ॥
বিলা'ত কত যে রত্ন দেশে দেশে, তার কি কপালে ছিল অবশেষে,
দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ভিখারিণী বেশে, আহা হা ভারত-ভাগ্যহীনা।
খাওয়া পরা বল যাহা কিছু চাই, আপনার বলিতে কিছুই ত' নাই
চেয়ে বিদেশীর মুখপানে তাই, মুখটি করি মলিন ॥
ত্রিশ কোটি সন্তান থাকিতে যার, পরমুখাপেক্ষা হয়েছে সার,
তার মত ধরায় অভাগিনী আর কে দেখেছে কোন দিন ;
আর কি ফিরিবে না দিন ?
(সে) অভাগিনীর দুঃখ দূর করিবারে (আজ) কোন ভাগ্যধর
বলে উচ্চৈঃস্বরে ;
এবার দেখাবো ভাগ্য ফিরে কি-না ফিরে, কেমন না আসে সুদিন।
হেথা হোথা ছুটি ঘুরি নানা স্থান, ইংলণ্ড-জার্ম্মেনি-মার্কিন-জাপান,
শিখি নানা বিদ্যা শিল্প-বিজ্ঞান, আনিব জীবন নবীন,
আবার ফিরিবে গো দিন ॥
বুঝি অন্নপূর্ণা হয়েছেন প্রসন্ন, রাতুল চরণে মার রাশি রাশি অন্ন,
দিব উপহার রবে না নিরন্ন, কেহ জীবিকাবিহীন।
ওই যেন দূর হতে আসিতেছে বাণী, কমলিনী হবেন রাজরাণী,
পুত্র-কন্যা হবে ধনী মানী জ্ঞানী, আবার জগতে প্রবীণ
আবার ফিরিবে গো দিন ॥

—অশ্বিনীকুমার দত্ত

শ্মশান

শ্মশান ত ভালবাসিস্ মাগো,
তবে কেন ছেড়ে গেলি ?
এত বড় বিকট শ্মশান এ জগতে কোথা পেলি ?
দেখ্ সে হেথা কি হয়েছে,
ত্রিশ কোটি শব পড়ে আছে,
কত ভূত-বেতাল নাচে, রঙ্গে ভঙ্গে করে কেলি।
ভূত-পিশাচ-তাল-বেতাল,
নাচে আর বাজায় গাল,
সঙ্গে ধায় ফেরুপাল এটা ধরি ওটা ফেলি।
আয় না হেথা নাচ্‌বি শ্যামা
শব হব শিব পা ছুঁয়ে মা,
জগৎ জুড়ে বাজবে দামা দেখ্‌বে জগৎ নয়ন মেলি।

—অশ্বিনীকুমার দত্ত

নব দীক্ষা

আমরা চাই না তব শিক্ষা—
মোরা পেয়েছি নব দীক্ষা।
(এই নবীন যুগের নবীন মন্ত্রে)
(এই "বন্দে মাতরম্" মন্ত্রে)
(যা'র বর্ণে বর্ণে তড়িৎ ছুটে।)
ঘুম-পাড়ানো এই মন্ত্র, ভাব-তাড়ানো এই তন্ত্র,
বল ভাঙ্গানো এই মন্ত্র—
(আমরা চাই না চাই না হে), এ যে শিক্ষা নয়, শুধু ভিক্ষা।
(আমরা) শিখিব আপন শাস্ত্র, পরিব নিজেরি বস্ত্র,
ধরিব আত্ম-অস্ত্র—করিতে আপন রক্ষা।

—সুন্দরীমোহন দাস

ভারতবর্ষের মানচিত্র

শিক্ষক। দেখ, বৎস ! সম্মুখেতে প্রসারিত তব
ভারতের মানচিত্র ; আমা সবাকার
পুণ্য জন্মভূমি এই, মাতৃস্তন্যে যথা,
এ দেশের ফলে জলে পালিত আমরা ;
কর প্রণিপাত, তুমি কর প্রণিপাত।

ছাত্র। (প্রণামানন্তর) অই যে চিত্রের শিরে ঘন মসীরেখা
পূরব-পশ্চিমব্যাপী রয়েছে অঙ্কিত,
কি নাম উহার, দেব ! বলুন আমারে।

শিক্ষক। নহে তুচ্ছ মসীরেখা ; অই হিমাচল,
ভারতের পিতৃরূপী। জনক যেমন
স্নেহদানে তনয়ারে পালেন আদরে,
তেমতি এ হিমাচল দুহিতা ভারতে,
জাহ্নবী-যমুনারূপা স্নেহধারা দানে,
পালিছেন সযতনে। অই হিমাচল
ভারতের তপঃক্ষেত্র ; কত সাধুজন,
বিরচি আশ্রম সেথা, পূজি ইষ্টদেবে
লভিলা অভীষ্ট বর। সম্মুখেতে তব,
বিজয়-মুকুট সম এ অদ্রির শিরে,
শোভে অই গৌরীশৃঙ্গ। দেখ বামদিকে,
অই বদরিকাশ্রম ; মহামুনি ব্যাস,
বসি যে আশ্রমমাঝে, রচিলা পুলকে
অমর ভারতকথা। অবিদূরে তার
শোভিছে কেদারনাথ ; আচার্য্য শঙ্কর,
জীবনের মহাব্রত করি উদ্‌যাপন,
লভিলা সমাধি যথা। এই হিমাচল,

সাধু-পদরেণু বক্ষে ধরি যুগ, যুগ,
হইয়াছে পুণ্যভূমি ;—কর নমস্কার।

ছাত্র। অই যে চিত্রের বামে পঞ্চ রেখাময়
শোভিছে সুন্দর দেশ, কি নাম উহার ?

শিক্ষক। অই পঞ্চনদ, বৎস ! এই পুণ্যভূমি,
আর্য্যদের আদিবাস, সাম-নিনাদিত ;
কত বেদ, কত মন্ত্র, মহাযজ্ঞ কত
পবিত্রিলা এই দেশ। এই পঞ্চনদে
হৃদয়-শোণিত ঢালি বীর পুরুরাজ
রক্ষিলা ভারত-মান। নিম্নদেশে তার
দেখ রাজপুত-ভূমি—মরুময় স্থান ;
কিন্তু প্রতি শৈলে তার, প্রতি নদীকূলে,
রয়েছে অঙ্কিত বৎস ! অমর-ভাষায়
বীরত্বকাহিনী, শত আত্মবিসর্জ্জন ;—
প্রতাপের দেশ এই, পদ্মিনীর ভূমি।

ছাত্র। অই যে চিত্রের মাঝে কটিবন্ধ সম
শোভিতেছে গিরিরেখা, কি নাম উহার ?

শিক্ষক। অই বিন্ধ্যাচল, বৎস ! উত্তরে উহার
আর্য্যভূমি আর্য্যাবর্ত্ত। উহার দক্ষিণে
না ছিল আর্য্যের বাস ; অরণ্য ভীষণ
ব্যাপিয়া যোজন শত আছিল বিস্তৃত,
নিবিড় আঁধারপূর্ণ। মহাপ্রাণ ঋষি
অগস্ত্য আর্য্যের বাস স্থাপিলা এ দেশে ;
এবে জনপদ কত, পূর্ণ ধনে জনে,
শোভিছে এ দেশ-মাঝে। এই বনভূমে
আছিল দণ্ডকারণ্য ; রঘুকুলমণি
পালিবারে পিতৃসত্য ; জটা, চীর ধরি,
কাটাইলা কাল যথা। পুণ্য প্রবাহিনী

গোদাবরী, কল কল মধুর নিনাদে,
"সীতারাম জয়" গীত গাহিয়া পুলকে
এখনও বহেন সেথা। পবিত্র এ দেশ,
সীতারাম-পদ-স্পর্শে, কর নমস্কার।

ছাত্র। গুরুদেব! কৌতূহল বাড়িতেছে মম,
অতৃপ্ত শ্রবণযুগ, কৃপা করি তবে
কোথা বঙ্গভূমি আজ দেখান আমারে।

শিক্ষক। অই বঙ্গভূমি, বৎস! হিমাদ্রি আপনি
মুকুট আকারে, হের, শোভে শিরোদেশে;
ধৌত করি পাদতল বহেন জলধি;
নিত্য প্রক্ষালিত পূত ভাগীরথী-জলে
"সুজলা", "সুফলা", "শ্যামা"। ভূষারূপে তার
হের ঐ নবদ্বীপ, শ্রীচৈতন্য যথা
হইলেন অবতীর্ণ; সাঙ্গোপাঙ্গ লয়ে
বিতরিয়া হরিনাম, পবিত্রিলা ধরা,
অমর করিলা জীবে। পশ্চিমে তাহার
দেখ শুষ্কতনু অই অজয়ের কূলে
শোভিতেছে কেন্দুবিল্ব, ধরিয়া আদরে
জয়দেব-অস্থি বুকে। নিম্নদেশে তার
সাগর-সঙ্গম অই, পতিত-পাবনী
তারিতে সগর-বংস অবতীর্ণ যথা
মূর্ত্তিমতী দয়ারূপে। পবিত্র এ দেশ,
কর প্রণিপাত তুমি; বিধাতার কাছে
মাগ এই বর, বৎস! মাতৃসম যেন
পার পূজিবারে নিত্য বঙ্গভূমি মায়ে।

ছাত্র। বিশাল এ চিত্র দেব! কৃপা করি তবে
দেখান দ্রষ্টব্য যদি আরো কিছু থাকে।

শিক্ষক। আছে শত শত বৎস! কি বর্ণিব আমি!

বর্ণিলে জীবন-কাল না ফুরাবে তবু ;
রত্নপ্রসূ মা মোদের। দেখিয়াছ তুমি
দেব-আত্মা হিমাচল ; পদমূলে তার
দেখ শীর্ণকায়া অই বহিছে রোহিণী,
হিমাদ্রি-দুহিতা সতী। তটদেশে তার
আছিল কপিলাবস্তু, পুণ্যময়ী পুরী
সিদ্ধার্থে করিয়া ক্রোড়ে। দেখ বামদিকে
অর্দ্ধচন্দ্র-কায়া অই জাহ্নবীর কূলে,
শোভিতেছে বারাণসী ; হরিশ্চন্দ্র যথা,
পত্নী, পুত্রে, আপনায় করিয়া বিক্রয়,
পালিলেন নিজ সত্য। দেখ শিপ্রাকূলে,
অতীত-গৌরবস্মৃতি-শিলা ধরি বুকে,
শোভিতেছে উজ্জয়িনী :—বিক্রমের পুরী ;
বাজায়ে মধুর বীণা কালিদাস যথা
গাইলা অমর-গীত, ঝঙ্কার তাহার
এখনো উঠিছে, বৎস ! দেশ-দেশান্তরে।
কি আর অধিক কব ? সন্তানের কাছে
জননীর প্রতি অঙ্গ তুল্য আদরের ;—
নয়নে অমৃত দৃষ্টি, কণ্ঠে মধু বাণী
হৃদয়ে সুধার উৎস, ক্রোড় শান্তিময়,
করে প্রাণরূপী অন্ন, মহাতীর্থ পদ ;
তেমতি জানিও বৎস ! ভারত-ভূমির
প্রতি গিরি, প্রতি নদী, প্রতি জনপদ,
পুণ্যময় মহাতীর্থ ; আছে বিমিশ্রিত
প্রতি রেণু মাঝে এর, প্রতি জলকণে
সাধুর পবিত্র অস্থি সতীর শোণিত ;
সামান্য এ দেশ নহে ! বহু পুণ্যফলে
জন্মে নর এ ভারতে। কিন্তু চিরদিন

রাখিও স্মরণ, বৎস ! কর্ম্মগুণে যদি
নাহি পার উজ্জ্বলিতে মাতৃভূমি-মুখ,
বৃথায় জনম তব। কি বলিব আর,
ভারত-সন্তান তুমি, আর্য্যবংশধর,
ভুলিও না কোন দিন। করি আশীর্ব্বাদ,
ভদ্র হও, ধন্য হও, ভারত-মাতার
হও উপযুক্ত পুত্র। স্বদেশের হিত
ধ্রুবতারা সম নিত্য রাখি লক্ষ্যপথে
হও বৎস ! অগ্রসর। ভারত-জননী
করুন মঙ্গল তব, শুভ আশীর্ব্বাদে।

—যোগীন্দ্রনাথ বসু

দেশভক্তি

সত্য কি তোমারে আমি বাসি ভাল ? স্বদেশ-জননি !
কহি বটে, সাধনার ধন তুমি নয়নের মণি !
কিন্তু যবে অন্তরের অন্তরেতে করি নিরীক্ষণ,
বুঝি, সব শূন্যগর্ভ, অর্থহীন অলীক বচন।
প্রবঞ্চিত প্রবঞ্চক হ'য়ে হেন র'ব কত কাল ?
পূত, শুদ্ধ কর মা গো, দূর কর মনের জঞ্জাল।
পারিতাম সত্য যদি মাতৃরূপে ভাবিতে তোমারে,
হইতাম বধির কি এত ডাকে এত হাহাকারে ?
দারিদ্র্যের কশাঘাতে কাঁদে ভ্রাতা, ভগ্নী মোর,—
বিলাসেতে মগ্ন আমি, কই ঝরে নয়নের লোর।
অজ্ঞতার অন্ধকারে ডুবে আছে কোটি কোটি জন,
একটিও দীপ আমি নাহি করি কেন প্রজ্বালন ?

কোটি কণ্ঠে রোগে শোকে শুনি উঠে তীব্র আর্ত্তনাদ—
আমি হাসি, হা-হা ক'রে নাহি চিন্তা নাহিক বিষাদ!
সত্য দেশভক্তি যাহা, এ তাহার নহে পরিচয়,
দেশভক্তি ত্যাগে, ধর্ম্মে, কর্ম্মে, প্রেমে—বচনেতে নয়।
বাক্যভারে ভাবাক্রান্ত, অবসন্ন হ'য়ে গেছে প্রাণ,
কর্ম্মক্ষেত্রে শক্তি স্ফূর্ত্তি, অন্তর্যামী, কর মোরে দান।
অকপটে তব পদে এই ভিক্ষা চাহি পরমেশ।
সত্য সত্য, বুঝি যেন মাতৃরূপা আমার স্বদেশ!

—যোগীন্দ্রনাথ বসু

একবার জাগো

একবার জাগো, জাগো, জাগো, যত ভারত-সন্তান রে!
লোহিত বরণে পূরব গগনে, উদিত তরুণ তপন রে!
জাগিছে চীন, জেগেছে জাপান, নবীন আলোকে রে।
কাল-ঘুমঘোর ভাঙ্গিবে না তোর, অলস ভারত রে!
ছিলে রাজরাণী বীর প্রসবিনী; প্রতাপ-জননী রে।
(আজি) পর-পদাঘাতে দলিতা লাঞ্ছিতা, দীনা কাঙ্গালিনী সে।
নিজ বাসভূমে পরবাসী হ'লে সোনার ভারত রে!
তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, তোমার কিছুই নয় রে!
নবীন প্রভাতে নবীন প্রাণে নবীন তপনে রে!
কোটি কণ্ঠস্বরে গাও উচ্চৈঃস্বরে বন্দে মাতরম্ রে!
শুনিয়া সে ধ্বনি স্বরগে অমনি হবে প্রতিধ্বনি রে!
শত বরষের অলস পরাণ, জাগিবে জাগিবে জাগিবে রে!

—রাইচরণ বিশ্বাস

মাতৃপূজা

হিন্দু-মুসলমান, হয়ে এক প্রাণ এস পূজি মার চরণ দু'খানি।
মর্ম্মে বাজে ব্যথা, জন্মভূমি মাতা আমাদের দোষে আজ কাঙ্গালিনী।
মাতৃসেবা মহাপুণ্যেরি অভাবে কি দুর্গতি আজ দেখ ভাই ভেবে;
মাতা অন্নপূর্ণা, একি বিড়ম্বনা—অন্নাভাবে মরে লক্ষ লক্ষ প্রাণী!
বর্ষে বর্ষে তায় দুর্ভিক্ষ-পীড়ন, বর্ষ-শস্যে হয় ত্রিবর্ষ যাপন
কারে বা বলিব, কে বুঝে বেদন, কেহ নাই আর বিনা কাত্যায়নী!
ওঠ ওঠ ভাই, থেক না অলসে, মাতৃসেবা-ব্রত লহ রে হরষে;
মার আশীর্ব্বাদে রব নিরাপদে, সম্পদে বিপদে কর মা-মা ধ্বনি।
ব্রতের নিয়ম শুন দিয়া মন—'একতা' 'সংযম' অতি প্রয়োজন,
স্বদেশ বাণিজ্যে উন্নতি-সাধন ভুল না এ কথা মূলমন্ত্র জানি।
স্বদেশী দ্রব্যেতে জীবনযাপন, প্রতিজনে কর প্রতিজ্ঞা এখন;
প্রতি ঘরে ঘরে লহ সমাদরে স্বদেশীয় দ্রব্য উপাদেয় মানি।
"হুজুগে বাঙালী" বলে সব জন এ কলঙ্ক ভাই, করহ মোচন;
"মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন" কার্য্যে পরিণত কর সিদ্ধবাণী।
শক্তিরূপা মাতা শক্তির আকর পূজ ভক্তিভরে জুড়ি দুই কর;
মা প্রসন্না হ'লে কিসে আর ডর আদ্যাশক্তি মাতা অসুরঘাতিনী॥

—দেবেন্দ্রনাথ সেন

আবার আসিও ফিরে

পুণ্যভূমির সন্তান বীর আবার আসিও ফিরে!
হে অমর নব সন্ন্যাসী তব
গৌরবগাথা হবে না নীরব,
কালের বিষাণ গাহিয়ে সে গান, জাগাবে আবার ধীরে;

চিতার আগুন জ্বলিবে দ্বিগুণ, আবার আসিও ফিরে।
বিস্ময়ে চাহি' দেখিছে বিশ্ব
অভূতপূর্ব্ব নবীন দৃশ্য,
কর্ম্মক্ষেত্র আকুল নেত্র ঢালিতেছে ধীরে ধীরে।
বহ্নি জ্বালায়ে গেলে কি পালায়ে আবার আসিও ফিরে।
অপূর্ণ নরজনমের সাধ,
বহে বুকধারা তীব্র বিষাদ
যৌবন নব স্তব্ধ নীরব, প্রেতদল ছিল ঘিরে।
হইলে মুক্ত বিজয়-যুক্ত আবার আসিও ফিরে।
সতীর্থ দল রহিল জাগিয়া
শ্মশান-বক্ষে সাধনা লাগিয়া,
গৌরব-ভরা কীর্ত্তি পসরা রাখিয়া গঙ্গাতীরে।
ঊর্দ্ধ অক্ষি রয়েছে লক্ষি' আবার আসিও ফিরে।
দৈন্যদুঃখ বক্ষে চাপিয়া
কেঁদেছ কেবল পরের লাগিয়া
দৃরিতে দুঃখ সাধন মুখ্য বিশ্বাস নিজ শিরে।
পুণ্যভূমির সন্তান বীর আবার আসিও ফিরে।
নবজীবনের পুণ্য প্রভাত
প্রতি বুকেঁ বুকে ঘাত-প্রতিঘাত
বক্ষে ধরিয়া বজ্র চাপিগা মুছিয়া নয়ন নীরে,
জেগেছে সন্তান দল আবার আসিও ফিরে।

—চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

এখনো কে আছ অবসন্ন প্রাণ

এখনো কে আছ অবসন্ন প্রাণ,
উঠ, জাগ—শোন ভারত-সন্তান,
মর্ত্ত্যভূমে আজি কি অমর গান
অনন্ত উচ্ছ্বাসে বহিয়া যায় ;
দেখহ চাহিয়া কিবা অনুরাগে,
কি সিদ্ধি লভিতে—কোন্ মহাযাগে,
শত শত প্রাণী মিলিয়া প্রয়াগে
প্রমত্ত আজি এ মহাপূজায় ।
"ভেদিয়া নিবিড় অভেদ্য আঁধার,
অনন্ত আকাশে যেন পূর্ব্বাশার
তাতিবে কি রবি তেজঃপুঞ্জাকার—
সমগ্র ভারতে কাঁপিছে প্রাণ ;
শত শত প্রাণী বৈষম্য ভুলিয়া,
অপূর্ব্ব বিস্ময় পুলকে পূরিয়া,
প্রতীক্ষায় তাই আছে দাঁড়াইয়া
সে পদে কি অর্ঘ্য করিবে দান ।"

—নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

বঙ্গভূমির প্রতি

ক্ষমা কর্ মা বঙ্গভূমি, ক্ষমা কর্ মা হৃদয় খুলে।
আমি যে তোর অবোধ ছেলে লবি নে মা কোলে তুলে?
অদৃষ্টের ঘোর নিষ্পীড়নে, কতই দুঃখ রইল মনে,
তোরি স্নেহ—তোরি আদর সবি যে মা গেছি ভুলে।
তোর কথা মোর মনে হলে, ভাসি আমি নয়ন জলে,
পাগল হয়ে ঘুরে বেড়াই, পথে ঘাটে নদীর কূলে।

—কায়কোবাদ

মাতৃস্তুতি

প্রণমি তোমারে আমি, সাগর-উত্থিতে,
ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী, অয়ি জননী আমার!
তোমার শ্রীপদ-রজঃ এখনো লভিতে
প্রসারিছে করপুট ক্ষুব্ধ পারাবার।
শত শৃঙ্গ-বাহু তুলি' হিমাদ্রি-শিখরে
করিছেন আশীর্ব্বাদ—স্থির-নেত্রে চাহি';
শুভ্র মেঘ-জটাজালে দুলে বায়ুভরে,
স্নেহ-অশ্রু শতধারে ঝরে বক্ষঃ বাহি'।
জ্বলিছে কিরীট তব—নিদাঘ-তপন,
ছুটিতেছে দিকে দিকে দীপ্ত রশ্মি-শিখা;
জ্বলিয়া—জ্বলিয়া উঠে শুষ্ক কাশবন,
নদীতট বালুকায় সুবর্ণ-কণিকা!
গভীর সুন্দরবনে তুমি শ্যামাঙ্গিনী
বসি' স্নিগ্ধ বটমূলে—নেত্র নিদ্রাকুল!

শিরে ধরে ফণাচ্ছত্র কাল-ভুজঙ্গিনী,
অবহেলে পা দু'খানি আগ্রহে শার্দ্দূল।
নব-বরষার চূর্ণ-জলদ-কুন্তল
উড়িছে—ছড়িয়ে পড়ে শ্রীমুখ আবরি'।
চাতকী ডাকিছে দূরে, শিখিনী চঞ্চল,
মেঘমন্ত্রে কৃষকের চিত্ত যায় ভরি'।
বিস্তীর্ণ পদ্মার তুমি ভগ্ন উপকূলে
বসে আছ মেঘস্তূপে অসিত-বরণা!
নক্রকুল নত-তুণ্ড পড়ি পদমূলে
তুলি' শুণ্ড করিযূথ করিছে বন্দনা।
সরে মেঘ, ফুটে ধীরে বন্দন-চন্দ্রমা!
বিভোর চকোর উড়ে নয়ন-সোহাগে;
লুটে ভূমে শ্রীঅঙ্গে শ্যামল সুষমা,
চরণ-অলক্তকরাগ তড়াগে তড়াগে।
মূর্ত্তিমতী হ'য়ে, সতী, এস ঘরে ঘরে,
রাখ' ক্ষুদ্র কপর্দ্দকে রাঙ্গা পা দু'খানি!
ধান্যশীর্ষ স্বর্ণঝাঁপি লও রাঙ্গা করে—
ভুলে' যাই—সর্ব্বদৈন্য, সর্ব্ব দুঃখ-গ্লানি!
ছুটি নবোৎসাহে মাঠে ল'য়ে গাভীদলে,
হিমসিক্ত তৃণভূমি, শুষ্ক পদ্মদল;
হরিদ্র ধান্যের ক্ষেত্রে, পীত রৌদ্রতলে
বিছায়ে দিয়েছ তব সুবর্ণ-অঞ্চল!
কুজ্ঝটি-সায়াহ্নে হেরি—মৃগযূথ সাথে
ছুটিছে নির্ঝর-তীরে চকিতা চঞ্চলা!
মদির মধুক-বনে ম্লান জ্যোৎস্না-রাতে
ল'য়ে তুমি ঋক্ষশিশু ক্রীড়ায় বিহ্বলা!
নিস্তব্ধ-জয়ন্তী-চূড়ে সান্দ্র অন্ধকার,
কণ্টকী লতায় গেছে গিরিভূমি ভরি'।

গহ্বরে গহ্বরে বন্য-বরাহ-ঘুৎকার,
বহিছে উত্তর-বায়ু শিহরি শিহরি'।
হেরি,—তুমি সাশ্রুনেত্রে, অবনত-শিরে
পরিত্যক্ত গ্রামে গ্রামে ভ্রমিছে দুঃখিনী !
ভগ্নস্তূপে, শিলাখণ্ডে, বিনষ্ট মন্দিরে
খুঁজিছে পুত্রের কীর্ত্তি—অতীত কাহিনী !
অশোকে কিংশুকে গেছে ছাইয়া প্রান্তর,
পিক-কণ্ঠ-কলতান উঠে দিকে দিকে ;
চূত-মুকুলের গন্ধে মরুত মন্থর,
এস হৃৎ-পদ্মাসনে, সর্ব্বার্থ-সাধিকে !
এস-চণ্ডীদাস-গীতি, শ্রীচৈতন্য-প্রীতি,
রঘুনাথ-জ্ঞানদীপ্তি, জয়দেব-ধ্বনি !
প্রতাপ-কেদার-বাঞ্ছা, গণেশ-স্মৃতি,
মুকুন্দ-প্রসাদ-মধু-বঙ্কিম-জননী !

—অক্ষয়কুমার বড়াল

বাসনা

ভারত-ভূমি সমান, আছে ভবে কোন্ স্থান !
ভারতের গুণগান, সবে মিলি গাও রে !
ভারতের যে ধন নাই. কোথা তাহা নাহি পাই ;
অতুলনা এই ঠাঁই দেখিতে না পাও রে।
যে ধনে হয়ে অভাব, ভারতের এই ভাব,
করি তাহা অনুভব, তাঁহারে মিলাও রে
অধীনতা অপমানে, দুঃখিনী ব্যথিত প্রাণে,
জননীর মুখপানে, বারেক না চাও রে

পেলে তিনি হারাধন, জুড়াবেন প্রাণ-মন ;
করি হেন সমাপন, বাসনা পুরাও রে।
থাকিবে না কোন দুঃখ, হইবে পরম সুখ,
সকলে কেন বিমুখ, এ সুখ না চাও রে ?

—রাধানাথ মিত্র

হিন্দুমেলার উপহার*

দেখিছ না অয়ি ভারতসাগর, অয়ি গো হিমাদ্রি দেখিছ চেয়ে,
প্রলয়কালের নিবিড় আঁধার, ভারতের ভাল ফেলেছে ছেয়ে।
অনন্ত সমুদ্র তোমারি বুকে, সমুচ্চ হিমাদ্রি তোমারি সম্মুখে,
নিবিড় আঁধারে এ ঘোর দুর্দ্দিনে, ভারত কাঁপিছে হরষ রবে !
শুনিতেছি নাকি শত কোটি দাস, মুছি অশ্রুজল নিবারিয়া শ্বাস,
সোনার শৃঙ্খল পরিতে গলায় হরষে মাতিয়া উঠিছে সবে ?
শুধাই তোমারে হিমালয় গিরি, ভারতে আজি কি সুখের দিন ?

তুমি শুনিয়াছ হে গিরি অমর, অর্জ্জুনের ঘোর কোদণ্ডের স্বর,
তুমি দেখিয়াছ সুবর্ণ আসনে, যুধিষ্ঠির রাজা ভারত-শাসনে ;
তুমি শুনিয়াছ সরস্বতীকূলে, আর্য্য-কবি গায় মনপ্রাণ খুলে,
তোমারে শুধাই হিমালয় গিরি—আজি কি ভারতে সুখের দিন ?

তুমি শুনিতেছ ওগো হিমালয়—ভারত গাইছে বৃটিশের জয়,
বিষণ্ন নয়নে দেখিতেছ তুমি—কোথাকার এক শূন্য মরুভূমি—
সেথা হতে আসি ভারত আসন লয়েছে কাড়িয়া, করিছে শাসন ;
তোমারে শুধাই হিমালয় গিরি—আজি কি ভারতের সুখের দিন ?

* রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে জাতীয় মেলায় এই কবিতাটি পাঠ করেন।

তবে এ সব দাসের দাসেরা, কিসের হরষে গাইছে গান?
পৃথিবী কাঁপায়ে অযুত উচ্ছ্বাসে কিসের তরে গো উঠায় তান?
কিসের তরে গো ভারতের আজি, সহস্র হৃদয় উঠিছে বাজি?
যত দিন বিষ করিয়াছে পান, কিছুতে জাগেনি এ মহাশ্মশান,
বন্ধন-শৃঙ্খল করিতে সম্মান, ভারত জাগিয়া উঠিছে আজি?
কুমারিকা হতে হিমালয় গিরি, এক তারে কভু ছিল না গাথা,
আজিকে একটি চরণ আঘাতে, সমস্ত ভারত তুলিছে মাথা!
এসেছিল যবে মহম্মদ ঘোরী, স্বর্গ রসাতল জয়নাদে ভরি
রোপিতে ভারতে বিজয়-ধ্বজা,
তখনো একত্রে ভারত জাগে নি, তখনো একত্রে ভারত মেলে নি;
আজ জাগিয়াছে—আজ মেলিয়াছে—বন্ধন-শৃঙ্খল করিতে পূজা!
বৃটিশ রাজ্যের মহিমা গাহিয়া, ভূপগণ ওই আসিছে ধাইয়া
রতনে রতনে মুকুট ছাইয়া বৃটিশ চরণে লোটাতে শির--
অই আসিতেছে জয়পুর-রাজ, ওই যোধপুর আসিতেছে আজ
ছাড়ি অভিমান তেয়াগিয়া লাজ, আসিছে ছুটিয়া অযুত বীর!
হারে হতভাগ্য ভারতভূমি! কণ্ঠে এই ঘোর কলঙ্কের হার
পরিবারে আজি করি অলঙ্কার গৌরবে মাতিয়া উঠিছে সবে?
তাই কাঁপিতেছে তোর বক্ষ আজি বৃটিশ রাজ্যের বিজয় রবে?
বৃটিশ বিজয় করিয়া ঘোষণা, যে গায় গাক্ আমরা গাব না
আমরা গাব না হরষ গান,
এস গো আমরা যে ক-জন আছি, আমরা ধরিব আর এক তান।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দিন আগত ঐ

দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী,
আসিল যত বীরবৃন্দ আসন তব ঘেরি।
দিন আগত ঐ,
ভারত তবু কই ?
সে কি রহিল লুপ্ত আজি সব-জন-পশ্চাতে ?
লউক বিশ্বকর্ম্মভার মিলি সবার সাথে,
প্রেরণ কর ভৈরব তব দুর্জ্জয় আহ্বান হে,
জাগ্রত ভগবান হে ॥
বিঘ্ন-বিপদ দুঃখ-দহন তুচ্ছ করিল যারা,
মৃত্যু গহন পার হইল, ছুটিল মোহ-কারা।
দিন আগত ঐ,
ভারত তবু কই ?
নিশ্চল নির্ব্বীর্য্য বাহু কর্ম্মকীর্ত্তি হীনে,
ব্যর্থ শক্তি নিরানন্দ জীবনধন-দীনে,
প্রাণ দাও, প্রাণ দাও, দাও দাও প্রাণ হে,
জাগ্রত ভগবান হে ॥
নূতন-যুগ-সূর্য্য-উঠিল, ছুটিল তিমির রাত্রি,
তব-মন্দির-অঙ্গন ভরি মিলিল সকল যাত্রী।
দিন আগত ঐ,
ভারত তবু কই ?
গত-গৌরব হৃত-আসন নত-মস্তক লাজে,
গ্লানি তার মোচন কর নর-সমাজ মাঝে,
স্থান দাও, স্থান দাও, দাও দাও স্থান হে,
জাগ্রত ভগবান হে ॥

জনগণ-পথ তব জয়-রথচক্র-মুখর আজি,
স্পন্দিত করি দিগ্‌দিগন্ত উঠিল শঙ্খ বাজি।
দিন আগত ঐ,
ভারত তবু কই ?
দৈন্যজীর্ণ কক্ষ তার মলিন শীর্ণ আশা,
ত্রাসরুদ্ধ চিত্ত তার নাহি নাহি ভাষা।
কোটি-মৌন-কণ্ঠ-পূর্ণ বাণী কর দান হে,
জাগ্রত ভগবান হে॥
যারা তব শক্তি লভিল নিজ অন্তর মাঝে,
বর্জ্জিল ভয় অর্জ্জিল জয় সার্থক হল কাজে।
দিন আগত ঐ,
ভারত তবু কই ?
আত্ম-অবিশ্বাস তার নাশ কঠিন ঘাতে
পুঞ্জিত অবসাদ ভার হান অশনি-পাতে।
ছায়া-ভয়-চকিত মূঢ় করহ পরিত্রাণ হে,
জাগ্রত ভগবান হে॥

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সার্থক জনম

সার্থক জনম আমার জন্মেছি এ দেশে।
সার্থক জনম মাগো, তোমায় ভালবেসে।
জানিনে তোর ধন-রতন,
আছে কিনা রাণীর মতন,
শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায়
তোমার ছায়ায় এসে॥

কোন্ বনেতে জানিনে ফুল,
গন্ধে এমন করে আকুল,
কোন্ গগনে ওঠেরে চাঁদ
এমন হাসি হেসে ॥
আঁখি মেলে তোমার আলো,
প্রথম আমার চোখ জুড়ালো,
ঐ আলোতেই নয়ন রেখে
মুদব নয়ন শেষে ॥

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মাতৃস্তুতি

একবার তোরা মা বলিয়া ডাক,
জগত জনের শ্রবণ জুড়াক,
হিমাদ্রি পাষাণ কেঁদে গলে যাক্
মুখ তুলে আজি চাহ রে।
দাঁড়া দেখি তোরা আত্মপর ভুলি,
হৃদয়ে হৃদয়ে ছুটুক বিজলী,
প্রভাত গগনে কোটি শির তুলি,
নির্ভয়ে আজি গাহ রে।
বিশ কোটি কণ্ঠে মা বলে ডাকিলে
রোমাঞ্চ উঠিবে অনন্ত নিখিলে
বিশ কোটি ছেলে মায়েরে ঘেরিলে
দশ দিক সুখে হাসিবে।
আপনার মায়ে মা বলে ডাকিলে
আপনার ভায়ে হৃদয়ে রাখিলে
সব পাপতাপ দূরে যাবে চলে
পুণ্য প্রেমের বাতাসে।

যেথায় বিরাজে দেব আশীর্ব্বাদ
না থাকে কলহ না থাকে বিপদ,
ঘুচে অপমান—জেগে উঠে প্রাণ
বিমল প্রতিভা বিকাশে

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রার্থনা

মাগো যায় যেন জীবন চলে,
শুধু জগৎ-মাঝে তোমার কাজে
"বন্দে মাতরম্" বলে।
আমার যায় যেন জীবন চলে॥
যখন মুদে নয়ন করবো শয়ন
শমনের সেই শেষ জালে,
তখন সবই আমার হবে আঁধার,
স্থান দিও মা ঐ কোলে!
আমার যায় যাবে জীবন চলে॥
আমার মান-অপমান সবই সমান,
দলুক না চরণতলে।
যদি সইতে পারি মায়ের পীড়ন
মানুষ হব কোন্ কালে?
আমার যায় যাবে জীবন চলে॥
লাল টুপি আর কাল কোর্ত্তা,
জুজুর ভয় কি আর চলে?
আমি মায়ের সেবায় রইবো রত,
পাশব বলে দিক জেলে।
আমার যায় যাবে জীবন চলে॥

আমায় বেত মেরে কি মা ভুলাবে,
আমি কি মার সেই ছেলে ?
দেখে রক্তারক্তি বাড়বে শক্তি,
কে পালাবে মা ফেলে ?
আমার যায় যাবে জীবন চলে ॥
আমি ধন্য হব মায়ের জন্য
লাঞ্ছনাদি সহিলে।
ওদের বেত্রাঘাতে কারাগারে
ফাঁসি কাঠে ঝুলিলে।
আমার যায় যাবে জীবন চলে ॥
যে মার কোলে নাচি, শস্যে বাঁচি,
তৃষ্ণা জুড়াই যার জলে ;
বল লাঞ্ছনাব ভয় কার কোথা রয়,
সে মায়েব নাম স্মরিলে ?
আমার যায় যাবে জীবন চলে ॥
বিশারদ কয়, বিনা কষ্টে
সুখ হবে না ভূতলে।
সে তো অধম যে হয় সইতে রাজি
উত্তমে চায় মুখ তুলে।
আমার যায় যাবে জীবন চলে ॥

—কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ

শঙ্কা

হতাশ হ'য়ো না প্রাণে অনুচিত নির্যাতনে,
সাহসে হৃদয় বাঁধ কি শঙ্কা নির্দ্দোষ মনে ?
গুর্খা দেখে মূর্খ যত, কি আতঙ্কে অভিভূত,
উচ্চ শির অবনত, এত শঙ্কা কি কারণে ?
যার অঙ্কে জন্ম নিলে, যার শস্যে যার জলে
রবি-শশি-কর-জালে ধরেছ শরীর—
তার ধন তারে দিতে, তারি তরে কষ্ট পেতে,
মাটিতে মাটির দেহ, এত শঙ্কা সমর্পণে ?
'স্বর্গাদপি গরীয়সী' মুখে বল ঘরে বসি ;
ভয়ে ম্লান মুখশশী, দেখিলে বিপদ !
একদিন মৃত্যু হবে, নিত্য ভবে নাহি রবে,—
কাঁপে বক্ষ কেন তবে, মাতৃ সম্বোধনে ?

—কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ

আয় আজি আয় মরিবি কে ?

আয় আজি আয় মরিবি কে ?
পিষিতে অস্থি শুষিতে রুধির নিশীথে শ্মশানে পিশাচ অধীর
থাকিতে তন্ত্র সাধনমন্ত্র প্রেতভয়ে ছি ছি ডরিবি কে ?
মরার মতন না লভি মরণ, সাধকের মত মরিবে কে ?
আয় আজি আয় মরিবি কে ?
অসুরনিধনে কিসের তরাস্ পশুর নিধনে তোরা কি ডরাস্ ?
না গণি বিজন কানন ভীষণ বিষম বিপদ তরিবি কে ?
নিষ্ঠুর অরি সংহার করি বীরের মতন মরিবি কে ?
আয় আজি আয় মরিবি কে ?

উঠিছে সিন্ধু মথিয়া তুফান ছুটিছে ঊর্ম্মি পরশি বিমান
সাহসেতে ভর করি সে সাগর হাসিমুখে তোরা তরিবি কে ?
হউক ভগ্ন, জলধি-মগ্ন, তবু তরী বাহি মরিবি কে ?
আয় আজি আয় মরিবি কে ?
চরণের তলে দলি রিপুগণ লভিত নির্ব্বাণে অমর জীবন
তাদেরি অংশে তাদেরি বংশে জনম, সে কথা স্মরিবে কে ?
লভিতে তূর্ণ ত্রিদিব-পুণ্য আর্য্যের মত মরিবি কে ?
আয় আজি আয় মরিবি কে ?
মাতি সৌরভে যশ-গৌরবে অমর হইয়া মরিবি কে ?
আয় আজি আয় মরিবি কে ?

—বিজয়চন্দ্র মজুমদার

দীক্ষা

হবে পরীক্ষা তোমার দীক্ষা, অগ্নিমন্ত্রে কিনা ?
তৃণ বলি' তোরে গরবে হেলায়,
দলিতেছে অরি চরণতলায়,
পোড়াতে অরিকে, পুড়িয়া মরিতে—পারিবি কিনা ?
দগ্ধ-ভস্মে গ্রাসিতে বিশ্ব পারিবি কিনা ?
লভ গো মৃত্যু জিনিতে শত্রু—যে করে তোমারে ঘৃণা,
তবে পরীক্ষা, তোমার দীক্ষা, অগ্নিমন্ত্রে কিনা !
ভীষণ কান্তি আসিছে মরণ,
মহা-অরণ্যে করি' বিচরণ,
কৃষ্ণ-হস্তে শাণিত অস্ত্র ধরিবি কিনা ?
ধেয়ে আয় যারা মরিতে পারিস্
শ্মশানের ধূমে মিশাইতে বিষ,

মরণ আদেশ দিতেছে স্বদেশ, পালিবি কিনা ?
সৃজি' হলাহল শোণিত তরল, ঢালিবি' কিনা ?
জাগে অপমান বিন্ধ্য-সমান, ঘুচে কি মরণ বিনা ?
আজি পরীক্ষা, তোমার দীক্ষা, অগ্নিমন্ত্রে কিনা ।

—বিজয়চন্দ্র মজুমদার

এ জগতে যদি বাঁচিবি

এ জগতে যদি বাঁচিবি—
ওরে অক্ষম, ওরে দুর্ব্বল,
বীর-বিক্রম কর সম্বল,
যদি জীবন ধারণে বাসনা ।
ওরে অধম, চপল, ঘৃণ্য,
নিজ সংযম বল ভিন্ন
কহ আছে কি অন্য সাধনা ।
বিপদে অভয়, জীবনে বিজয়
কোথা কেবা আর যাচিবি ?
সাধনার পর, নির্ভর কর
এ জগতে যদি বাঁচিবি ।
ছি ছি মিথ্যা গরিমা গাহিয়া,
নিজে আত্ম-মহিমা কহিয়া
হইবি শ্রেষ্ঠ ভবে কি ?
ওরে ফুৎকারে, কিরে, হীনতা ?
তেজ ধিক্কারে, নিজ নীচতা ?
গুরুবচন-দম্ভে হবে কি ?
হইতে উচ্চ, শুধু কি তুচ্ছ
বচন-গুচ্ছ রচিবি ?

কর্ম্মের পর, নির্ভর কর,
এ জগতে যদি বাঁচিবি।
সহি' চরণ দলন ধীরতা?
করি' বেদনে রোদন, বীরতা?
কাজ কিরে ভীরু! বড়াইয়ে।
সহে ভীষণ তাড়ন মানুষে?
হ'লে পাষাণ পীড়ন, মানুষে
দেয় অগ্নির কণা ছড়ায়ে।
মায়ের আশিস্, লভিতে পারিস্,
শূর সম যদি রাজিবি।
মায়ের উপর নির্ভর কর,
এ জগতে যদি বাঁচিবি।
কেন বনে বনে বৃথা ক্রন্দন?
বাঁধ প্রাণে প্রাণে প্রীতি-বন্ধন
যদি জীবন লভিতে বাসনা।
সবে লভি' বল, বাধা ঠেলিয়া,
চল, কাজে চল, কথা ফেলিয়া
করি বিধির করুণা যাচনা।
লভিবে অমর, অক্ষয় বব,
ভাই ভাই যদি সাজিবি,
বিধির উপর নির্ভর কর,
এ জগতে যদি বাঁচিবি।
এস অক্ষম এস ঘৃণা,
এস অধম, অবশ খিন্ন,
এস শূববীরসহ সকলে।
এস মাতার চরণে নমিয়া
এস ধাতার করুণা ধ্বনিয়া,
এস সাধনার বলে সদলে

পূত সংযমে বীর বিক্রমে
অতুল কীর্ত্তি রচিবি।
ধর্ম্মের পর নির্ভর কর
এ জগতে যদি বাঁচিবি।

—বিজয়চন্দ্র মজুমদার

আশীর্ব্বাদ

মা, তোমারি তরে, এসেছি এ ঘরে,
পতিত সন্তান রাখ চরণে
আমরা দুর্ব্বল, বিদেশী প্রবল,
আশিষে সবল কর এ সন্তানে।
এ হৃদয়-বীণা ধরিবে মা তান,
গাহিবে তোমারি জয় গুণগান,
ভারতবর্ষে যত হিন্দু-মুসলমান,
মাতিয়া উঠিবে সে গভীর তানে।
আমরা অক্ষম কলঙ্ক-মলিন,
জেগেছে জাপান, জাগিয়াছে চীন,
নিজ দোষে আছি হয়ে দীনহীন,
অবশ অলস না দেখি নয়নে।
আমেরিকা আদি আর অষ্ট্রেলিয়া,
আরো কত দেশ উঠিল জাগিয়া,
আমরাই শুধু অলসে ঘুমিয়া,
সুখের শয্যায় এখনও শয়নে।
ভারত-জননী মাতা গরীয়সী,
পরের অধীনে কাঁদিছেন বসি।
মায়ে প্রবোধিয়ে ধর ত্যাগ অসি,
মাতৃ-আশীর্ব্বাদ ধার্য্য করি মনে।

—সরোজিনী দেবী

জীবন আহবে চল্

চল্ রে চল্ রে চল্ রে ভাই !
জীবন-আহবে চল ; চল্ চল্ চল্ ।
বাজবে সেথা রণভেরী,
আসবে প্রাণে বল ; চল্ চল্ চল ।
ছেড়ে দিয়ে সুখ, দূরে রেখে মান,
বীর সাজে আয় হাতে নিয়ে প্রাণ,
বীর দর্পে কাঁপবে ধরা,
করবে টলমল ; চল্ চল্ চল্ ।
বেঁচে থেকে ভাই সুখ কি আছে ?
লাগুক জীবন দেশের কাজে,
জীবন গেলে জীবন পাব
হউক জনম সফল ; চল্ চল্ চল্ ।
উঠ্ছে দেখ্ ঐ তরুণ তপন,
ফুট্‌ছে কেমন আশার কিরণ ;
ঐ আশাতে বুক বেঁধে ভাই !
আয় রে দলে দলে ; চল্ চল্ চল্ ।

—মনোমোহন চক্রবর্তী

জীবন-ব্রত

কাঁপায়ে মেদিনী—কর জয়ধ্বনি জাগিয়া উঠুক মৃত প্রাণ ।
জীবন-রণে জীবন-দানে সবারে কর হে আগুয়ান ।
হাতে হাতে ধরি ধরি দাঁড়াইব সারি সারি প্রাণে বাধিবে তবে প্রাণ ।
আলস্য-জড়তা নিরাশ বারতা দূরে করিবে প্রয়াণ ॥
সাধিতে দেশের কাজ পর রে বীরের সাজ করে ধর সাহস-কৃপাণ ।
জীবন-ব্রত সাধি অবিরত এ নহে বিরামের স্থান ॥

—মনোমোহন চক্রবর্তী

শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত মোরা*

শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত মোরা অভয়া চরণে নম্র শির,
ডরি না রক্ত ঝরিতে ঝরাতে দৃপ্ত আমরা ভক্তবীর।
শুধু মায়ের চরণে নম্রশির।
মা আমাদের জগদ্ধাত্রী সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্রী,
ঈপ্সিত বর অভয়দাত্রী অধিষ্ঠাত্রী ত্রিলোকীর।
আবাহন মার যুদ্ধ ঝননে তৃপ্ত তপ্ত রক্ত ক্ষরণে,
পশু বধে আর অসুর দমনে মায়ের খড়্গ ব্যগ্রাধীর।
সূর্য্যখচিত অতুল আস্য
নিরাশা-ধ্বান্ত-বিনাশী আস্য,
রাতুল-চরণ দেব উপাস্য
সিংহ-পৃষ্ঠে অটল স্থির।
কিরীট-দীপ্ত ক্ষুব্ধ-গগনে
দ্রুত-বিদ্যুৎ স্ফুরিছে সঘনে,
যেন বা বহ্নি জলধি-মথনে
জন্ম হতেছে জয়শ্রীর।
করে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি
ভরিয়া আশীষে নিখিল সৃষ্টি
সার্থক করি মানব দৃষ্টি,—
রচি রোমাঞ্চ ধরিত্রীর।
গৌরবময় পুণ্য দৃশ্য!
উচ্ছ্বাস ভরে স্তব্ধ বিশ্ব,
ভরা বিশ্বাসে শক্তি শিষ্য
ধরায় লুটাও স্বশরীর।
মায়ের আরতি অরাতি নাশন
পদে অঞ্জলি বাঞ্ছা পূরণ

---

*এই কবিতাটি জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষে রচিত।

দুঃখ-নিশি-হরা সোনার বরণ,
উষা জাগে শিরে হোমার্চ্চির।
মায়ের করুণা বড় নির্ম্মম,
আহুতি তৃপ্ত হুতাশন সম,
হস্তে নির্ম্মল দহন, প্রথম,—
অন্তে বিশ্ববিজয়ী বীর।
কর পদাঘাত বিপদ মাথায়,
ভর ধরাতল বিজয় গাথায়,
হর! হর! হর বিঘ্ন কোথায়?
শমন ভৃত্য জননীর।
দর্পে উড়িছে রক্ত-নিশান
ক্রূর-বিজলী ঝলসে কৃপাণ,
নিদ্রা-বিদারি' সমর-বিষাণ
ঘোষে 'দ্বিষো জহি' মথি' সমীর।
অভয়োল্লাসে জননী দত্ত
হৃদে কল্লোলি' ছুটুক মত্ত,
বহ্নি-সদৃশ শোণিতাবর্ত্ত
রক্ত আঁখিতে ভক্তিনীর।
স্বার্থ ও রিপু নির্দ্দয়ে দলি'—
দাও যুগপৎ ও চরণে বলি
রুধির ধারায় চরণাঙ্গুলি
রঞ্জি লুটুক ছিন্ন শির!
মাগো! জবার বদলে ছিন্ন শির।

—বরদাচরণ মিত্র

জয় মা ভারত

ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে—গাও উচ্চে রণজয়-গাথা,
রক্ষা করিতে পীড়িত ধর্ম্মে—শুন ঐ ডাকে ভারত-মাতা।
কে বল করিবে প্রাণে মায়া
যখন বিপন্না জননী জায়া ?
সাজ সাজ সকলে রণসাজে, শুন ঘন ঘন রণভেরী বাজে !
চল সমরে—দিব জীবন ঢালি'—জয় মা ভারত, জয় মা কালী।
সাজে শয়ন কি হীন বিলাসে—শত্রু বিদগ্ধ যখন পুরপল্লী ?
বিধর্ম্মী-চরণ-বিচিহ্নিত বক্ষে সাজে প্রেয়সীর ভুজবল্লী ?
কোষ-নিবদ্ধ রবে তরবারী
যখন বিলাঞ্ছিত ভারত-নারী !
সাজ সাজ সকলে রণসাজে, শুন ঘন ঘন রণভেরী বাজে !
চল সমরে—দিব জীবন ঢালি'—জয় মা ভারত, জয় মা কালী !
সমরে নাহি ফিরাইব পৃষ্ঠে, শত্রু করে কভু হব না বন্দী !
ডরি না থাকে যাই অদৃষ্টে—অধর্ম্ম সঙ্গে করিব না সন্ধি।
রব না রব না শত্রুর ভৃত্য,
সম্মুখ সমরে জয় বা মৃত্যু।
সাজ সাজ সকলে রণসাজে, শুন ঘন ঘন রণভেরী বাজে !
চল সমরে—দিব জীবন ঢালি'—জয় মা ভারত, জয় মা কালী !
ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে, শত্রু সৈন্যদল করিব বিভিন্ন।
পুণ্য সনাতন আর্য্যাবর্ত্তে রাখিব না কভু রিপুপদ-চিহ্ন।
বিধর্ম্মীর রক্তে করিব স্নান,
করিব বিরঞ্জিত হিন্দুস্থান।
সাজ সাজ সকলে রণসাজে, শুন ঘন ঘন রণভেরী বাজে।
চল সমরে—দিব জীবন ঢালি'— জয় মা ভারত, জয় মা কালী !

—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

উৎসাহ-অনল

জ্বালাও ভারত-হৃদে উৎসাহ-অনল !
ফেলিব না শোকে আর নয়নের জল ;
কাঁদিয়াছি বহু দিন, কাঁদিব না আর হে,
দেখিব আজো এ মনে আছে কত বল !
বিভব-গৌরব-মান সকলি নির্ব্বাণ হে,
আছে মাত্র আর্য্যবংশ-গরিমা সম্বল ।
এখনো আমরা সেই আর্য্যের সন্তান হে,
বহিছে শিরায় আর্য্য-শোণিত প্রবল ।
সেই বেদ, সে পুরাণ, আজো বর্ত্তমান হে,
সে দর্শন যাহে মুগ্ধ আজো ভূমণ্ডল !
সেই ঘাট, সেই বিন্ধ্য, সেই হিমালয় হে,
জাহ্নবী-যমুনা বারি আজো নিরমল ।
আজিও বিস্তৃত সেই পুণ্য আর্য্যস্থান হে,
আমরা সন্তান তার কেন হীন বল ?
উঠ অগ্রসর, ভাই ত্যজি বিসংবাদ হে,
ভাই ভাই মিলি সাধ স্বদেশ-মঙ্গল ।
অজস্র রোদনে যাহা হয় নি সাধন হে,
আজি নবোৎসাহে তাহা হইবে সফল ।
জ্বালাও ভারত-হৃদে উৎসাহ-অনল !

—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

ভারতবর্ষ

যে দিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননি, ভারতবর্ষ !
উঠিল বিশ্বে সে কি কলরব, সে কি মা ভক্তি, সে কি মা হর্ষ !
সে দিন তোমার প্রভায় ধরায় প্রভাত হইল গভীর রাত্রি ;
বন্দিল সবে, "জয় মা জননি ! জগত্তারিণি ! জগদ্ধাত্রি !"
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ ;
গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনি ! জগজ্জননি ! ভারতবর্ষ !"
সদ্যঃস্নাত-সিক্তবসনা চিকুর সিন্ধু-শীকর-লিপ্ত ;
ললাটে গরিমা, বিমল হাস্যে অমল-কমল-আনন দীপ্ত,
উপরে গগন ঘেরিয়া নৃত্য করিছে তপন তারকা চন্দ্র,
মন্ত্রমুগ্ধ, চরণে ফেনিল জলধি গরজে জলদ-মন্দ্র ।
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ ;
গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনি ! জগজ্জননি ! ভারতবর্ষ !"
শীর্ষে শুভ্র তুষার-কিরীট, সাগর-ঊর্ম্মি ঘেরিয়া জঙ্ঘা ;
বক্ষে তুলিছে মুক্তার হার, পঞ্চসিন্ধু যমুনা গঙ্গা ।
কখন মা তুমি ভীষণ দীপ্ত তপ্ত মরুর-উষর দৃশ্যে,
হাসিয়া কখন শ্যামল শস্যে ছড়ায়ে পড়িছ নিখিল বিশ্বে ।
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ ;
গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনি ! জগজ্জননি ! ভারতবর্ষ !"
উপরে পবন প্রবল স্বননে শূন্যে গরজি অবিশ্রান্ত,
লুটায়ে পড়িছে পিক-কলরবে চুম্বি তোমার চরণ-প্রান্ত,
উপরে জলদ হানিয়া বজ্র করিছে প্রলয়-সলিল বৃষ্টি,
চরণে তোমার কুঞ্জ-কানন কুসুম-গন্ধ করিছে সৃষ্টি ।
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ ;
গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনি ! জগজ্জননি ! ভারতবর্ষ !"

জননি, তোমার বক্ষে শান্তি, কণ্ঠে তোমার অভয় উক্তি,
হস্তে তোমার বিতর অন্ন, চরণে তোমার বিতর মুক্তি।
জননি, তোমার সন্তান তরে কত না বেদনা, কত না হর্ষ !
জগৎপালিনি ! জগত্তারিণি ! জগজ্জননি ! ভারতবর্ষ !
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ ;
গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনি ! জগজ্জননি ! ভারতবর্ষ !"

—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

জন্মভূমি

ধন-ধান্য-পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা,
তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা ;
ও যে স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে যে স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি ॥

চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-তারা কোথায় উজল এমন ধারা !
কোথায় এমন খেলে তড়িৎ এমন কালো মেঘে !
সেথা পাখীর ডাকে ঘুমিয়ে উঠি পাখীর ডাকে জেগে।
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি ॥

এমন স্নিগ্ধ নদী কাহার, কোথায় এমন ধূম্র পাহাড় !
কোথায় এমন হরিৎ ক্ষেত্র আকাশ-তলে মেশে !
এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে !
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি ॥

পুষ্পে পুষ্পে ভরা শাখী, কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখী,
গুঞ্জরিয়া আসে অলি পুঞ্জে পুঞ্জে ধেয়ে,
তারা ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে !
এমন দেশটি কোথায় খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি ॥

ভায়ের মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ ?
ও মা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি,
আমার এই দেশেতে জন্ম, যেন এই দেশেতে মরি !
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি ॥

—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

জাগরণ গীত

শুনিনি শুনিনি শোনেনি রে কেহ এমন বিজয় গান ।
দেখিনি দেখনি, দেখনি রে কেহ জাগিতে প্রাণ ।
মরা যে জেগেছে, পাষাণ কেঁদেছে তুষার উঠেছে জ্বলে' ।
এক সুর কয় মেবারের জয় একভাবে পড়ে ঢ'লে ॥
খঞ্জ ছুটেছে উঠিতে পাহাড়ে, অন্ধ মেলেছে আঁখি ।
ভাই ভায়ে আজ বুকে টেনে নিয়ে হস্তে বেঁধেছে রাখী ॥
আবালবৃদ্ধ মায়ের সেবক—মায়ের সেবিকা নারী ;
বিজয় নিশান তুলিয়া আকাশে চলিয়াছে সারি সারি ॥
ভাষা নাহি জানে কথায় বাঁধিতে এ নব জাগর-গান ।
দেখিনি, দেখনি, দেখেনি রে কেহ এমন প্রাণের টান ॥

—ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

উদ্বোধন

ঐ অভ্রভেদি-ধবলশৃঙ্গে ফুটায়ে পদ্মরাগ,
তাতে চরণযুগল রাখ !
শুভ্র সুষমা চাহি না,—ভীম ভৈরবীরূপে জাগ্,
অঙ্গে বিভূতি মাখ্, ভৈরব রবে ডাক্,
ঐ হিমগিরি ফেটে যাক্,
আর, চাহি না মুরজ, দীপক-তন্ত্রীহীন,
সঙ্গীত মৃদু ক্ষীণ, চাহি না,—নাহি সে দিন ;
চাহি না ললিত, আশা, বসন্ত, চাহি না নট, বেহাগ ;
ধর ভৈরবরাগ, বিশ্বে হয়ে অবাক্,
চমকি ! ফিরিয়া চাক্ !
সেই মত্ত তীব্র গান, গরল-দিগ্ধ বাণ,
বিঁধবে অবশ প্রাণ, হবে সুপ্তির অবসান,
কোটি শৃঙ্গ অধীর রঙ্গে বোধন-গীতি গাক্ ;
নূতন জীবন পাক্, সিন্ধু, তটিনী লাখ্,
পল্লী, বন, তড়াগ !

—রজনীকান্ত সেন

মাভৈঃ

আর, কিসের শঙ্কা, বাজাও ডঙ্কা ; প্রেমেরি গঙ্গা বো'ক ;
মায়েরি রাজ্যে, মায়েরি কার্য্যে, ফুটেছে আজ যে চোখ্ ।
মা যে, রাজার কন্যা, জগত-মান্যা, ধনে ও ধান্যে ভরা ;
অমৃত-স্নিগ্ধ, মায়েরি দুগ্ধ, পানে মুগ্ধ ধরা ;
মায়েরি রাজ্যে, মায়েরি কার্য্যে, ছুটেছে আজ যে লোক,
একই লক্ষ্য, প্রীতি, সখ্য, প্রাণেরি ঐক্য হো'ক ।
হও, কর্ম্মে বীর, বাক্যে ধীর, মনে গভীর ভাব ;
সে অপদার্থ, যে পরমার্থ ভাবে স্বার্থ-লাভ ;
মায়েরি রাজ্যে, মায়েরি কার্য্যে, ঘুচেছে আজ যে শোক ;
হবে সমৃদ্ধি, শক্তি বৃদ্ধি, ছেড় না সিদ্ধি-যোগ !

—রজনীকান্ত সেন

মা আমার

যেই দিন ও চরণে ডালি দিনু এ জীবন,
হাসি-অশ্রু সেই দিন করিয়াছি বিসর্জ্জন ।
হাসিবার কাঁদিবার অবসর নাহি আর,
দুঃখিনী জনমভূমি,—মা আমার, মা আমার !
অনলে পুষিতে চাহি আপনার হিয়া মাঝে,
আপনারে অপরেরে নিয়োজিতে তব কাজে ;
ছোটো খাটো সুখদুঃখ, কে হিসাব রাখে তার,
তুমি যবে চাহ কাজ,—মা আমার, মা আমার !
অতীতের কথা কহি' বর্ত্তমান যদি যায়
সে কথাও কহিব না, হৃদয়ে জপিব তায় ;

গাহ যদি কোনো গান, গাব তব অনিবার,
মরিব তোমারি তরে,—মা আমার, মা আমার !
মরিব তোমারি তরে, বাঁচিব তোমারি তরে,
নহিলে বিষাদময় এ জীবন কেবা ধরে ?
যত দিন না ঘুচিবে তোমার কলঙ্কভার,
থাক্ প্রাণ, যাক্ প্রাণ—মা আমার, মা আমার !

—কামিনী রায়

আশার স্বপন

তোরা শুনে যা আমার মধুর স্বপন, শুনে যা আমার আশার কথা ;
আমার নয়নের জল রয়েছে নয়নে, তবুও প্রাণের ঘুচেছে ব্যথা।
এই নিবিড় নীরব আঁধারের তলে, ভাসিতে ভাসিতে নয়নের জলে,
কি জানি কখন কি মোহন বলে ঘুমায়ে ক্ষণেক পড়িনু হেথা।
আমি শুনিনু জাহ্নবী-যমুনার তীরে, পুণ্য-দেব-স্তুতি উঠিতেছে ধীরে,
কৃষ্ণা, গোদাবরী, নর্ম্মদা, কাবেরী, পঞ্চনদকূলে একই প্রথা।
আর দেখিনু যতেক ভারত-সন্তান, একতায় বলী জ্ঞানে গরীয়ান্,
আসিছে যেন গো তেজোমূর্ত্তিমান্, অতীত সুদিনে আসিত যথা।
ঘরে ভারত-রমণী সাজাইছে ডালি, বীর শিশুকুল দেয় করতালি,
মিলি যত বালা গাঁথি জয়মালা, গাইছে উল্লাসে বিজয়-গাথা।

—কামিনী রায়

মাতৃভূমি স্তুতি

স্বদেশের ধূলি স্বর্ণরেণু বলি, রেখো রেখো হৃদে এ ধ্রুব জ্ঞান ;
যাহার সলিলে মন্দাকিনী চলে, অনিলে মলয় সদা বহমান।
নন্দনকাননে কিবা শোভাহার বনরাজিকান্তি অতুল তাহার
ফল-শস্য তার সুধার আধার, স্বর্গ হতে সে যে মহা গরীয়ান্‌।
এ দেহ তোমার তারি মাটি হ'তে হয়েছে সৃজিত পোষিত তাহাতে,
মাটি হয়ে পুনঃ মিশিবে তাহাতে, ভবলীলা যবে হবে অবসান।
পিতামহদের অস্থিমজ্জা যত ধূলিরূপে তাহে আছে যে মিশ্রিত,
এই মাটি হ'তে হবে যে উত্থিত ভাবীকালে তব ভবিষ্য সন্তান।
কংস-কারাগারে দৈবকীর মত বক্ষেতে পাষাণ লৌহ শৃঙ্খলিত
মাতৃভূমি তব রয়েছে পতিত পরিচয় তুমি তাঁহারি সন্তান !
প্রকৃত সন্তান জেন সেই জন, নিজ দেহ প্রাণ দিয়ে বিসর্জ্জন,
যে করিবে মা'র দুঃখ বিমোচন হবে তার মাতৃ-ঋণ প্রতিদান।

—হরিদাস হালদার

প্রাণ যায় মা

সিংহের দাপটে প্রাণ যায় মা,
আসিলি কোথা হ'তে বিকট পশু
দেখে যে ভয় পায় মা।
সিংহের দাপটে প্রাণ যায় মা ॥
পশুর রাজা সিংহ বটে,
তাই চরণ দিয়েছ পিঠে,
সে যে মহাশক্তির চরণ পেয়ে
তাই লেজ ফুলায় মা ॥

বেটা শক্তিপূজা করতে দেখে
কটমটিয়ে চেয়ে থাকে,
সে তো নাহি ভেবে দেখে
আমরা তোর তনয় মা ॥
দে মা অস্ত্র দয়া করে,
বেটা সিংহটাকে তাড়াই দূরে,
তোর অশান্ত সন্তান বলে,
আর তো নাহি সয় মা ॥

—হরিদাস হালদার

বাঙ্গালীর সঙ্গীত

আজি এ আলোকপূর্ণ সুন্দর আকাশ,
গাহিছে আশার গীতি, পূর্ণ কর আশ,
বাঙ্গালী নহে গো ভীরু, নহে কাপুরুষ,
বাঙ্গালীর আছে আশা, আছে ইতিহাস।
করহ সার্থক আজ সত্যেরে সাধিয়া
দূর করি' হিংসা-দ্বেষ-বিদ্রূপ-বিলাস,
এই মহামন্ত্র রাখি' বক্ষেতে বাঁধিয়া
বাঙ্গালীর আছে আশা, আছে ইতিহাস।
ওই হের দেবতারা প্রসন্ন হইয়া
লিখেছে গগনভালে রবিরশ্মি দিয়া—
বাঙ্গালী নহে গো ভীরু, নহে কাপুরুষ,
বাঙ্গালীর আছে আশা, আছে ইতিহাস।
ওই শুন, দৈববাণী গগনে গর্জ্জিয়া
আলোড়িছে বাঙ্গালীর সর্ব্ব প্রাণমন
আপন কর্ম্মেরে চিরহস্তে আঁকড়িয়া
আপন ধর্ম্মেরে কর বক্ষে আলিঙ্গন

শুনো না অলীক কথা মিথ্যা প্রলোভন।
সঁপিও না সর্ব্ব আশা বিদেশীচরণে,—
দূর কর দুর্দ্দিনের মিথ্যা আলাপন,—
সত্যেরে সহায় কর জীবনে মরণে!
দেবতা কহিছে কথা অন্তর ভরিয়া
দেবতার বাক্যে আজি পূর্ণ কর মন,
আপন কর্ম্মেরে দৃঢ় হস্তে আঁকড়িয়া
আপন ধর্ম্মেরে কর বক্ষে আলিঙ্গন।

—চিত্তরঞ্জন দাশ

অভিশাপ

আনন্দে বধির হয়ে শুন নাই এত দিন ক্রন্দন ধরার।
বাজে নি হৃদয়ে কভু মর্ম্মাহত ধরণীর চির মর্ম্মভার।
হায় স্বর্গ! হায় ধরা! বন্দী আমি আপনার নিয়ম কারায়।
অনন্তে রচিত মোর হস্তস্থিত সৃষ্টিসূত্র কোথায় হারায়?—
সৃজিয়াছি শান্ত সুখ, কোথা হতে আসে দুঃখ মলিন বরণ?
জীবনের সাথে সাথে কোথা হতে এল ভেসে অবাধ্য মরণ?
কাঁদ কাঁদ ধরাবাসী! তব তীব্র আর্ত্তনাদ বজ্রশেল সম;
সহস্র সম্ভোগভরা কল্পিত এ স্বর্গধামে বাজে মর্ম্মে মম।
সৃষ্টির নিগড় গড়ি চরণে পড়িয়া আমি পূর্ণ পরাধীন।
অনন্ত ক্ষমতা নাই, অপার অনন্ত দুঃখ সব চির দিন॥

—চিত্তরঞ্জন দাশ

ভারত-প্রশস্তি

বল, বল, বল সবে, শত-বীণা-বেণুরবে
ভারত আবার জগৎ-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।
ধর্ম্মে মহান্ হবে, কর্ম্মে মহান্ হবে,
নব দিনমণি উদিবে আবার পুরাতন এ পূরবে ॥
আজও গিরিরাজ রয়েছে প্রহরী,
ঘিরি তিন দিকে নাচিছে লহরী,
যায় নি শুকায়ে গঙ্গা-গোদাবরী,
এখনও অমৃতবাহিনী।
প্রতি প্রান্তর, প্রতি গুহা-বন,
প্রতি জনপদ, তীর্থ অগণন,
কহিছে গৌরবকাহিনী ॥
(বল, বল, বল সবে······এ পূরবে ॥)
বিদুষী মৈত্রেয়ী, খনা, লীলাবতী,
সতী, সাবিত্রী, সীতা, অরুন্ধতী,
বহু বীরবালা, বীরেন্দ্র-প্রসূতি,
আমরা তাঁদেরই সন্ততি।
অনলে দহিয়া রাখে যারা মান,
পতি-পুত্র-তরে সুখে ত্যজে প্রাণ,
আমরা তাঁদেরই সন্ততি ॥
(বল, বল, বল সবে······এ পূরবে ॥)
ভোলেনি ভারত, ভোলেনি সে কথা,
অহিংসার বাণী উঠেছিল হেথা ;
নানক, নিমাই করেছিল ভাই
সকল ভারত-নন্দনে।

ভুলি ধর্ম্ম-দ্বেষ জাতি-অভিমান,
ত্রিশ কোটি দেহ হবে এক প্রাণ,
এক জাতি প্রেম-বন্ধনে ॥
(বল, বল, বল সবে……এ পূরবে ॥)
মোদের এ দেশ নাহি রবে পিছে,
ঋষিরাজকুল জন্মেনি মিছে ;
দু'দিনের তরে হীনতা সহিছে,
জাগিবে আবার জাগিবে।
আসিবে শিল্প-ধন-বাণিজ্য,
আসিবে বিদ্যা-বিনয়-বীর্য্য,
আসিবে আবার আসিবে ॥
(বল, বল, বল সবে……এ পূরবে ॥)
এস হে কৃষক কুটীরনিবাসী,
এস অনার্য্য গিরি-বনবাসী,
এস হে সংসারী, এস হে সন্ন্যাসী,
মিল হে মায়ের চরণে।
এস অবনত, এস হে শিক্ষিত,
পরহিত-ব্রতে হইয়া দীক্ষিত,
মিল হে মায়ের চরণে।
এস হে হিন্দু, এস মুসলমান,
এস হে পারসী, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টিয়ান,
মিল হে মায়ের চরণে ॥
(বল, বল, বল সবে……এ পূরবে ॥)

—অতুলপ্রসাদ সেন

আশা

হও ধরমেতে ধীর   হও করমেতে বীর,
হও উন্নত শির,—নাহি ভয়।
ভুলি ভেদাভেদ জ্ঞান,   হও সবে আগুয়ান,
সাথে আছে ভগবান হবে জয়।
নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান,
বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান ;
দেখিয়া ভারতে মহাজাতির উত্থান
জগজন মানিবে বিস্ময় !
জগজন মানিবে বিস্ময় !
তেত্রিশ কোটি মোরা নহি কভু ক্ষীণ,
হ'তে পারি দীন,   তবু নহি মোরা হীন,
ভারতে জনম, পুনঃ আসিবে সুদিন,
ঐ দেখ প্রভাত উদয় !
ঐ দেখ প্রভাত উদয় !
ন্যায় বিরাজিত যাদের করে,
বিঘ্ন পবাজিত তাদের শরে ;
সাম্য কভু নাহি স্বার্থে ডরে,
সত্যের নাহি পরাজয় !
সত্যের নাহি পরাজয় !

—অতুলপ্রসাদ সেন

ভারতলক্ষ্মী

উঠগো ভারতলক্ষ্মী ! উঠ আদি জগতজনপূজ্যা !
দুঃখ-দৈন্য সব নাশি, কর দূরিত ভারত-লজ্জা ।
ছাড়গো, ছাড় শোকশয্যা, কর সজ্জা
পুনঃ কমল-কনক-ধন-ধান্যে ।
(কোরাস্) জননী গো লহ তুলে বক্ষে,
সান্তন-বাস দেহ তুলে চক্ষে,
কাঁদিছে তব চরণ-তলে
ত্রিংশতি কোটি নরনারী গো ।
কাণ্ডারী নাহিক কমলা ! দুঃখ-লাঞ্ছিত ভারতবর্ষে,
শঙ্কিত মোরা সব যাত্রী, কাল-সাগর-কম্পন দর্শে,
তোমার অভয় পদস্পর্শে, নব হর্ষে,
পুনঃ চলিবে তরণী শুভ লক্ষ্যে ।
(কোরাস্) জননী গো, লহ তুলে বক্ষে……ইত্যাদি ।
ভারত-শ্মশান কর পূর্ণ, পুনঃ কোকিল-কূজিত কুঞ্জে
দ্বেষ-হিংসা করি চূর্ণ, কর পূরিত প্রেম-অলিগুঞ্জে,
দূরিত করি পাপপুঞ্জে তপঃপুঞ্জে
পুনঃ বিমল কর ভারত-পুণ্যে !
(কোরাস্) জননী গো, লহ তুলে বক্ষে……ইত্যাদি ।

—অতুলপ্রসাদ সেন

স্বদেশ আমার মা

Mother India is not a piece of earth :
She is a power, a Godhead.

আমাদের স্বদেশকে,
আমাদের সুবিশাল এই ভারতভূমিকে
অনেকে ভাবে একটা জড় পদার্থ ;
মাঠ, ক্ষেত, বন, নদ-নদী
পর্ব্বতমালার এক সমষ্টিমাত্র ।
আমি জানি, তা নয়,
আমার স্বদেশ আমার মা—
মা বলেই তাকে ডাকি, মা বলেই তাকে ভক্তি করি,
পূজা করি, তনু-মন প্রাণ দিয়ে ।
আমার সেই মায়ের বুকের ওপব বসে
একটা উদ্ধত রাক্ষস যখন
মাতৃরক্ত পানে উদ্যত হয়,
মায়ের সন্তান কি তখন নিশ্চিন্ত মনে
আহার-বিহারে মত্ত থাকে ?
স্ত্রী-পুত্র নিয়ে আমোদ করে,
বিলাস-ব্যসনে সময় কাটায় ?
না ছুটে চলে যায় মাকে উদ্ধার করতে,
ঝাঁপিয়ে পড়ে তার সর্ব্বশক্তি দিয়ে
ঐ ক্রূর রাক্ষসকে ধ্বংস করতে, নির্ম্মূল করতে ।
আমি জানি
এই জাতিকে উদ্ধার করবার শক্তি আমার আছে ।
শুধু শারীরিক শক্তি নয়, জ্ঞানের শক্তি ।

শুধু ক্ষত্রতেজ নয়, ব্রহ্মতেজ,
যে তেজ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত।
এ ভাব নূতন নয়,
এ ক্ষণিকের উত্তেজনা নয়,
এ ভাব চিরন্তন, এ ভাব আমার মজ্জাগত।
এ ভাব নিয়েই আমি জন্মেছি,
ভগবান পাঠিয়েছেন পৃথিবীতে এ মহাব্রত সাধনের জন্য।
ভগবানই কার্য্যসিদ্ধি করাবেন।
এস, আজ সকলে মিলে সুরু করি
ভগবানের সেই কাজ—
ভগবানের আশ্রয় যে নেয়
ভয় তাকে ত্যাগ করে,
জয় তার সুনিশ্চিত।

—শ্রীঅরবিন্দ

নমঃ বঙ্গভূমি

নমঃ বঙ্গভূমি শ্যামাঙ্গিনী,
যুগে যুগে জননী! লোকপালিনী!
সুদূর নীলাম্বরপ্রান্ত সঙ্গে
নীলিমা তব মিশিতেছে রঙ্গে;
চুমি' পদধূলি বহে নদীগুলি;
রূপসী শ্রেয়সী হিতকারিণী!
তাল-তমালদল নীরবে বন্দে,
বিহঙ্গ স্তুতি করে ললিত সুছন্দে;
আনন্দে জাগ, অয়ি কাঙ্গালিনী?
কিসের দুঃখ, মাগো, কেন এ দৈন্য,
শূন্য শিল্প তব, বিচূর্ণ পণ্য?

হা অন্ন, হা অন্ন, কাঁদে পুত্রগণ ?
ডাক মেঘমন্দ্রে সুষুপ্ত সবে,
চাহ দেখি সেবা জননী-গরবে ;
জাগিবে শক্তি ; উঠিবে ভক্তি ;
জান না আপনায় সন্তানশালিনী !

—প্রমথনাথ রায়চৌধুরী

উঠ মাগো, জাগো জাগো

শুভ দিনে শুভ ক্ষণে গাহ আজি জয়,
গাহ জয়, গাহ জয়, মাতৃভূমির জয় !
(একাধিক কণ্ঠে) জয় জয় জয়, মাতৃভূমির জয় ॥
(বহু কণ্ঠে) জন্মভূমির জয়, স্বর্ণভূমির জয় !
পুণ্যভূমির জয়, মাতৃভূমির জয় !
লক্ষ মুখে ঐক্যগাথা রটাও জগতময়,
সুখ-স্বস্তি-স্বাস্থ্য-স্বার্থ দিলাম তোমার পায়,
যত দিন মা, তোমার বক্ষ জুড়ায়ে না যায়,
কে সুখে ঘুমায়, কে জেগে বৃথায় ?
মায়ের চোখে অশ্রুধারা, সে কি প্রাণে সয় !
নূতন উষায় গাহে পাখী নূতন জাগান সুর,
উঠ রাণী কাঙ্গালিনী দুঃখ হ'ল দূর,
অলস আঁখি মেল, মলিন বসন ফেল,
উঠ মাগো, জাগো জাগো, ডাকে পুত্রচয় ॥

—প্রমথনাথ রায়চৌধুরী

আহ্বান সঙ্গীত

ওঠ্‌ রে ওঠ্‌ রে ওঠ্‌ রে তোরা
হিন্দু-মুসলমান সকলে ভাই।
হিন্দু-মুসলমান-ব্রাহ্ম-খৃষ্টিয়ান,
আয় রে আয় রে বঙ্গের সন্তান,
ঐ শোন মার কাতর আহ্বান,
জননী তোদের ডাকিছে ভাই।
ঐ যে তুর্জ্জন করিছে গর্জ্জন, বঙ্গমাতারে করিবে ছেদন,
করি খণ্ড খণ্ড বঙ্গের অঙ্গ, জাতির জীবন নাশিবে তাই।
(আজ) উড়িছে আকাশে রক্তনিশান, ঘন ঘন ঐ বাজিছে বিষাণ,
স্বদেশের রণে, কে রবে পিছনে চল্ চল্‌ সবে ছুটিয়া যাই।
নগরে নগরে জ্বাল রে আগুন, হৃদয়ে হৃদয়ে প্রতিজ্ঞা দারুণ,
রুখিব আমরা যুঝিব আমরা, (এই) দুঃশাসনের ধ্বংস চাই।
বিলাতী বস্ত্রে লাগাও আগুন,
দেও জলে ফেলে বিলাতের নুন,
বৃটিশ-বাণিজ্যে কর পদাঘাত বণিকের ঘরে জমুক ছাই।
(ওরে) হবে না হবে না বলিদান বিনা,
ঝরিবে শোণিত জাগিবে চেতনা,
(হবে) জাগ্রত বাঙ্গালী জাগ্রত ভারত কে রোধে ?
কারও সাধ্য নাই।
বল বন্দে মাতরম্, বল বন্দে মাতরম্,
বল দুঃশাসনের ধ্বংস চাই।

—শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মাতৃ-বন্দনা

বন্দি তোমায় ভারত-জননি বিদ্যা-মুকুট-ধারিণি !
বর-পুত্রের তপ-অর্জ্জিত গৌরবমণিমালিনী
কোটি সন্তান আঁখি-তর্পণ হৃদি আনন্দকারিণী
মরি বিদ্যা-মুকুট-ধারিণি !
যুগ-যুগান্ত-তিমির-অন্তে হাস মা কমলবরণি !
আশার আলোকে ফুল্ল হৃদয়ে আবার শোভিছে ধরণী
নব জীবনের পসরা বহিয়া আসিছে কালের তরণী,
হাস, মা, কমলবরণি !
এসেছে বিদ্যা, এসেছে ঋদ্ধি, শৌর্য্যবীর্য্যশালিনী
আবার তোমায় দেখিব মাগো সুখে দশ দিক্-পালিনী
অপমান-ক্ষত জুড়াইবি মাতঃ, খর্পরকরবালিনী !
শৌর্য্যবীর্য্যশালিনি !

-সরলা দেবী

নমো হিন্দুস্থান

অতীত গৌরববাহিনী মম বাণি, গাহ আজি হিন্দুস্থান।
মহাসভা উন্মাদিনী মম বাণি, গাহ আজি, গাহ আজি, হিন্দুস্থান।
কর বিক্রম-বিভব-যশঃসৌরভ-পূরিত সেই নামগান।
বঙ্গ, বিহার, অযোধ্যা, উৎকল, মান্দ্রাজ,
মারাঠ, গুর্জ্জর, নেপাল পঞ্জাব, রাজপুতান !
হিন্দু, পার্সি, জৈন, ইসাই, শিখ, মুসলমান !
গাও সকল কণ্ঠে, সকল ভাষে নমো হিন্দুস্থান।

(হিন্দু) হর হর হর জয় হিন্দুস্থান !
(শিখ) সৎ শ্রী অকাল হিন্দুস্থান !
(মুসলমান) আল্লা হো আকবর হিন্দুস্থান
নমো হিন্দুস্থান !

ভেদ-রিপুবিনাশিনি মম বাণি, গাও আজি ঐক্যগান।
মহাবলবিধায়িনি মম বাণি, গাহ আজি, গাহ আজি ঐক্যগান।
মিলাও দুঃখে সৌখ্যে সখ্যে লক্ষ্যে কায়মনঃপ্রাণ
বঙ্গ, বিহার, অযোধ্যা, উৎকল, মান্দ্রাজ,
মারাঠি, গুর্জ্জর, নেপাল, পঞ্জাব, রাজপুতান !
হিন্দু, পার্সি, জৈন, ইসাই, শিখ, মুসলমান !
গাও সকল কণ্ঠে সকল ভাষে নমো হিন্দুস্থান !

(হিন্দু) হরে মুরারে হিন্দুস্থান !
(পার্সি) দাদর হোর মজদ হিন্দুস্থান !
(মুসলমান) আল্লা হো আকবর হিন্দুস্থান !
নমো হিন্দুস্থান !

সকল জন-উৎসাহিনি মম বাণি, গাহ আজি নূতন তান।
মহাজাতি, সংগঠনি মম বাণি, গাহ আজি, গাহ আজি, নূতন তান।
উঠাও কর্ম্ম-নিশান, ধর্ম্ম-বিষাণ, বাজাও চেতায়ে প্রাণ।
বঙ্গ, বিহার, অযোধ্যা, উৎকল মাদ্রাজ,
মারাঠি, গুর্জ্জর, নেপাল, পঞ্জাব, রাজপুতান !
হিন্দু, পার্সি, জৈন, ইসাই, শিখ, মুসলমান।
গাও সকল কণ্ঠে সকল ভাষে নমো হিন্দুস্থান।

(হিন্দু) জয় জয় ব্রহ্মন্ হিন্দুস্থান !
(ইসাই) জয় জিহোহ্বা হিন্দুস্থান !
(মুসলমান) আল্লাহো আকবর হিন্দুস্থান !
নমো হিন্দুস্থান !

—সরলা দেবী

জাতীয় সঙ্গীত*

যার প্রসাদে পেলাম জীবন সাধব জীবন-নন্দনে।
রক্ত কাঁটার কান্তারেও উচ্ছলি' তোর বন্দনে।
কেমন সে দেশপ্রেমিক যে মা, চায় না প্রেমের আত্মদান ?
ধিক্ সে যে হয় লক্ষ্যহারা, মৃত্যুভয়ে কম্পমান।
আগুন হবে ফাগ আমাদের, ছাইব গগন জয়রাগে ঃ
প্রাণ ধরি তোর মন্ত্রে, বরণ করব মরণ তোর ডাকে ॥
নই কাপুরুষ, আমরা মায়ের দুঃসাহসী সুসন্তান ঃ
মান-গৌরব-কীর্ত্তি দেশের আলোর বাণী দীপ্যমান।
উড়বে যেথায় মা, তোর নিশান বাসবে ভালো দুই নয়ন
"জয় মা ভারত"—গাইব যখন, উঠবে কেঁপে তিন ভুবন।
আগুন হবে·························তোর ডাকে ॥
আমরা দেব সব আহুতি মা তোর হোমশিখায় সুখে,
দৃষ্টি পরম লক্ষ্যে রেখে তোর ক'রে জপ নাম বুকে।
দিক্ না হানা সিন্ধুবাধা, লঙ্ঘিব এক নিশ্বাসে ঃ
নই নিয়তির দাস তো, বাঁধন কাটব অভয় উল্লাসে।
আগুন হবে·························তোর ডাকে ॥

—ইন্দিরা দেবী

*শ্রীদিলীপকুমার রায় কর্ত্তৃক এই গানটি হিন্দী হইতে অনূদিত

ধাব ধাব তুমুলরণমধ্যে*

ধাব ধাব বীর ! তুমুলরণমধ্যে সংহর সততং নহি দয়া বধ্যে ।
শীঘ্রং প্রহর প্রহরণশালী বদনে বদতাং জয় মা কালি !
ভিন্ধি ভিন্ধি ত্বরিতং রিপুবক্ষঃ, ছিন্ধি ছিন্ধি দ্বিষতো ননু দক্ষ !
বিপদি নিমগ্না জননী চ জায়া কা তব শান্তিঃ কা তব মায়া ।
দ্বিষতামসৃজা সংসৃজ সিন্ধুম্ উদ্ধর বিষয়ানুদ্ধর বন্ধুম্ ।
নাশয় নিবিড়ং তিমিরং তূর্ণং চিরমালোকং কুরু পরিপূর্ণম্ ॥

—হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ

জননী বঙ্গভূমি

অয়ি সুজলা, সুফলা শস্য-শ্যামলা,
জননী বঙ্গভূমি !
আজ শরত সময় কি নব শোভায়
সাজিয়াছ, মাতা, তুমি !
তব প্রান্তররাজি পূর্ণ মা, আজি
হরিৎ-লহরী লীলা ;

* সঙ্গীতটির বঙ্গানুবাদ—হে বীর, তুমি তুমুল যুদ্ধমধ্যে শীঘ্র অগ্রসর হও, শত্রুকে সংহার কর, বধ্যজনের প্রতি দয়া করিও না। অস্ত্রধারী শীঘ্র প্রহার কর এবং মুখে 'জয় মা কালী' উচ্চারণ কর। শত্রুর বক্ষ শীঘ্র শীঘ্র ভেদ কর এবং মস্তক শীঘ্র শীঘ্র ছেদন কর। জননী এবং স্ত্রী বিপদে পতিত হইয়াছে, (এই অবস্থায়) তোমার শান্তিই বা কোথায়? মমতাই বা কোথায়? শত্রুর রক্তে সমুদ্র সৃষ্টি কর। বন্ধু এবং তাহার বিষয়-সম্পত্তি উদ্ধার কর। শীঘ্র এই পৃথিবীর গাঢ় অন্ধকার দূর করিয়া ইহাকে চিরকাল আলোকে পরিপূর্ণ কর।

তব চারিদিকে মাতা, স্নেহের বারতা
তুমি চির স্নেহশীলা।
তব চির লাঞ্ছিত সন্তান যত
লাঞ্ছনা তব করিতেছে কত,
তবু স্নেহদান কর অবিরত
তুমি চির স্নেহ ভাসি' ;
হৃদয় বিদারি' দাও হৃদি ভরি'
শুভাশীষ স্নেহরাশি।
সহিয়াছ কত, সহিতেছ কত,
তুমি তবু স্নেহ কর দান।
চিরদিন মাতা, স্নেহে বিগলিতা,
চির স্নেহাকুল প্রাণ।
আজি ক্ষুধিত আননে, দিতেছ যতনে
জীবন-অন্ন অয়ি !
তুমি চির উর্ব্বরা, চির স্নেহভরা
চির শুভাশীষময়ি !

—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

আশীর্ব্বাণী

লভি' অক্ষয় আয়ু
মুঠায় আঁকড়ি' ধর এ ধরণী,
আকাশে বাড়াও বাহু।
ধাও উদ্দাম গতি,
ঝঞ্ঝার মত ধাও আনন্দে
নীল অম্বুধি মথি।

শুভ্র পক্ষ মেলি'
বাড়ব কুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া পড়
দুর্যোগ অবহেলি'।
লোহার নিগড় ছিঁড়ে
মত্ত মাতাল বাহিরিয়া পড়
লক্ষ লোকের ভিড়ে।
বর্শা শানায়ে নিয়ে
অশ্বের খুরে আগুন ছুটাও
পাহাড়ের পাশ দিয়ে।
এস গো দুঃসাহসি,
ললাট হইতে উঠাও সবলে
দুর্ভাবনার মসী।
উত্তাল গিরিচূড়া
ভীম বিক্রমে দৃঢ় পদাঘাতে
সদর্পে কর গুঁড়া।
ধাও অবারিত গতি,
সুনীল আকাশ মুক্ত বাতাস
সতেজ স্বাধীন মতি।
কখন উঠ্‌বে হাওয়া
মিথ্যে আশায় পথ চেয়ে থাকা
আকাশের পানে চাওয়া।
কার কাছে হাত পাত'
করুণা করিতে কেহ নাই হেথা
কাহারে সাধিছ, ভ্রাতঃ।
সাধিতে হইবে মন্ত্র
গ্রাহ্য ক'রো না গুরু-গঞ্জনা
বৈরীর ষড়যন্ত্র।

আজি যৌবন-প্রভাতে
উর্জ্জস্বল পৌরুষভরে
সত্যসন্ধ শোভাতে।
কর কর দ্বার মুক্ত,
ন্যায়ের দণ্ড প্রোথিত করিয়া
হও ভাই জয়যুক্ত !

—করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

আহ্বান

ওই শোন্ ওই শোন্ সকরুণ মায়ের আহ্বান ;
আয় ছুটে আয়, আছিস্ কোথায় অযুত সন্তান !
কে এখনো বসি' করে ছেলেখেলা,
আলসে বিলাসে কে কাটায় বেলা,
বিবাদে বিষাদে লাজে অপমানে কে বা ম্রিয়মাণ
ওই শোন্ ওই শোন্ মায়ের আহ্বান !
জননীর দুখে কাঁদে নাকি আজ কাহারো পরাণ ?
কে মুছাবে মা'র নয়নের জল,
কে মায়ের মুখ করিবে উজ্জ্বল,
কে সাধিতে চাহে প্রাণপণ করি মায়ের কল্যাণ !
ওই শোন্ ওই শোন্ মায়ের আহ্বান।

—রমণীমোহন ঘোষ

সুপ্রভাত

হয়েছে রে শেষ নিবিড়-তিমির-পূজিত,
ঝঞ্ঝামুখর, ক্ষুব্ধ, সুচির যামিনী ;
হের মেঘমালা—সুদূর অরুণ রঞ্জিত,
স্তব্ধ ঝটিকা, লুপ্ত আকাশে দামিনী ।
এখনি কাননে উঠিবে বিহগসঙ্গীত,
কুসুমগন্ধ আসিবে মন্দ পবনে ;
ওরে আশাহত, ভীত, আর নাই রজনী—
নবীন প্রভাত আসিছে আবার ভুবনে ।
একটিও তারা ছিল না বিশাল অন্তরে,
ক্ষীণ আলোরেখা পড়ে নাই আসি ভূতলে ;
প্রহর গ'ণেছ জাগিয়া সভয় অন্তরে
আকাশের পানে চাহিয়া, বসিয়া বিরলে ।
ভয়-সংশয় হোক্ তব সব অন্ত রে,
হের শুকতারা উদিত পূর্ব্ব গগনে ;
ওরে আশাহত, ভীত, আর নাই রজনী—
নবীন প্রভাত আসিছে আবার ভুবনে ।
ওই আসে উষা—আনন অনবগুণ্ঠিত,
মধুর হাস্যে বিকাশি শান্ত মহিমা ;
হেম-অঞ্চল চরণকমলে লুণ্ঠিত,—
তিমির প্রান্তে দীপ্ত আশার প্রতিমা ।
এখনো কে আছ সুপ্ত, কে আছ কুণ্ঠিত ?
উঠ উঠ, বলি ডাক, ভাই, ডাক স্বজনে,
ওরে আশাহত, ভীত, আর নাই রজনী—
নবীন প্রভাত আসিছে আবার ভুবনে ।

ওগো উঠ, উঠ, ছিঁড়ি এস মোহবন্ধন,
ভাই ভাই মিলি দাঁড়াও আসিয়া বাহিরে ;
কেন রে নিরাশা, কেন রে বিফল ক্রন্দন,
দুঃখ-রজনী নাহি বাকি, আর নাহি রে ।
আনন্দে লয়ে সুগন্ধি ফুল-চন্দন,
অঞ্জলি সবে দাও জননীর চরণে ;
ওরে আশাহত, ওরে ভীত, নাই রজনী
নবীন প্রভাত আসিছে আবার ভুবনে ।

—রমণীমোহন ঘোষ

যদি প্রাণ দিতে চাস্

ওরে ক্ষ্যাপা,
যদি প্রাণ দিতে চাস্, এই বেলা তুই দিয়ে দে না ।
ওরে, মায়ের তরে প্রাণটি দেবার এমন সুযোগ আর হবে না ।
যখন দুদিন আগে, দুদিন পরে, তফাৎ মাত্র এই—
তখন অমূল্য এই মানব-জনম বৃথা দিতে নেই ;—
ওরে ক্ষ্যাপা !
মায়ের দেওয়া এ ছার জীবন দে রে মায়ের তরে,
অমর জীবন পাবি রে ভাই, জগৎ-মায়ের ঘরে ;
কি দিয়েছিস্ লিখ্‌বে যখন পরকালের খাতা—
তখন তোরই দানে হবে আলো বইয়ের প্রথম পাতা ;
ওরে ক্ষ্যাপা !

—যতীন্দ্রমোহন বাগচী

জাগো জাগো জাগো জননী

জাগো জাগো জাগো জননী,
তুই না জাগিলে শ্যামা
কেহ জাগিবে না মা,
তুই না নাচালে কারো
নাচিবে না ধমনী।
ডেকে ডেকে হলেম সারা
কেউ তো সাড়া দিল না মা,
খুঁজে দেখলাম কত প্রাণ
কারো প্রাণ কাঁদে না মা।
তুই না কাঁদালে প্রাণ
কাঁদিবে না কারো প্রাণ,
না কাঁদিলে সবার প্রাণ
পোহাবে কি রজনী
নাম ধর দয়াময়ী,
দয়া কি মা আছে তোর,
দয়া থাকলে মরে কি আজ
ত্রিশ কোটি ছেলে তোর।
মরি তাতে ক্ষতি নাই,
বাসনা মা দেখে যাই—
ভারতেরি ভাগ্যাকাশে
স্বাধীনতা-দিনমণি ॥

-মুকুন্দ দাস

ন্যায়ের দণ্ড

সাবধান ! সাবধান !!
আসিছে নামিয়া ন্যায়ের দণ্ড রুদ্র দীপ্ত মূর্ত্তিমান্ ॥
ঐ শোন তার গরজে কম্বু অম্বুধি যথা উচ্ছলে
প্রলয় ঝঞ্ঝা ঈরম্মদে মৃত্যু ভীষণ কল্লোলে ।
হুঙ্কারে তাঁর গভীর মন্দ্র, কাঁপায় মেদিনী তারকা চন্দ্র
বলদর্পিত চরণাঘাতে ত্রিভুবন ভীত কম্পমান ॥
বিশ্ব জুড়িয়া বিরাট দেহ, ভাবিছ বুঝি বা পালাইবে কেহ
এখনো চরণে শরণ লহ, নতুবা নাহি রে পরিত্রাণ ॥

—মুকুন্দ দাস

ভয় কি মরণে

ভয় কি মরণে রাখিতে সন্তানে
মাতঙ্গী মেতেছে আজ সমর-রঙ্গে
তাথৈ তাথৈ থৈ দ্রিমি দ্রিমি দং দং
ভূত-পিশাচ নাচে যোগিনী সঙ্গে ।
মাভৈঃ মাভৈঃ ঐ শুন রে অভয় বাণী,
হুঙ্কারে ঝঙ্কারে কাঁপিছে মেদিনী
দানবদলনী হলো উন্মাদিনী
আর কি দানবকুল থাকিবে বঙ্গে ।
এখনো কিরে ভাই পোহায়নি রজনী,
এখনো কিরে ভাই ঘুমঘোর ভাঙ্গেনি,
শুনিয়ে হুঙ্কার নাচে না ধমনী,
(ঐ দেখ) পড়িছে অগণি মায়ের অঙ্গে
সাজ রে সন্তান হিন্দু-মুসলমান
থাকে থাকিবে প্রাণ

না হয় যাইবে প্রাণ
লইয়ে কৃপাণ হও রে আগুয়ান
নিতে হয় মোরে নিও রে সঙ্গে ॥

—মুকুন্দ দাস

বঙ্গজননী

কে মা, তুই বাঘের পিঠে বসে আছিস্ বিরস মুখে ?
শিরে তোর নাগের ছাতা, কমলমালা ঘুমায় বুকে !
ঢল ঢল নয়নযুগল জল ভবে পড়ছে ঢুলে,
কাল মেঘ মিলিয়ে গেল তোর ঐ নিবিড় কালো চুলে ;
শিথিল মুঠি—ত্রিশূল কেন ধরায় ধুলা আছে চুমি ?
কে মা তুই কে মা শ্যামা,—তুই কি মোদের বঙ্গভূমি ?
মা, তোর ক্ষেতের ধান্যরাশি জাহাজ ভরে' যায় বিদেশে,
অন্ন-সুধা বঙ্গে ফেরে গরল হয়ে সর্ব্বনেশে !
বনের কাপাস বনে মিলায়, আমরা দেখি চেয়ে চেয়ে,
অন্ন-বসন বিহনে হায়, মরে তোমার ছেলেমেয়ে !
বল মা শ্যামা, শুধাই তোরে, মোদের এ ঘুম ভাঙ্‌বে নাকি ?
ধন্য হ'তে পারব না মা তোমার মুখে দেখি হাসি ?
ত্রিশূল তুলে নে মা, আবার রূপের জ্যোতি পরকাশি',
ভয়-ভাবনা ভাসিয়ে দিয়ে হাস আবার তেম্‌নি হাসি !
চরণতলে সপ্ত কোটি সন্তানে তোর মাগে রে—
বাঘেরে তোর জাগিয়ে দে গো, রাগিয়ে দে তোর নাগেরে,
সোনার কাঠি, রুপার কাঠি ছুঁইয়ে আবার দাও গো তুমি,
গৌরবিণী মূর্ত্তি ধর—শ্যামাঙ্গিনী—বঙ্গভূমি !

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

জাগো বাঙালী

তুই যে রে ভাই! সেই বাঙালী!
ধনপতির লক্ষপতির বংশ কেন আজ কাঙালী?
দিন থাকিতে দিন কিনে নে, আপন পন্থা নে রে চিনে,
স্থানহারা মানহারা হ'য়ে থাক্‌বি কি রে চিরকালই?
শুধু মুখের কথায় তোদের কি ঢেউ উঠে ভারত জুড়ে,
(আজো এ দুর্দ্দশার দিনে, নেপাল হ'তে ত্রিবাঙ্কুরে)
যদি কথায় কাজে জগৎ-মাঝে ধন্য হ'বি শোন্‌রে বলি,
প্রতাপের আহ্বানে তোরা, জেগেছিলি যেমন সবে,
(নিমা'য়ের প্রেম-আলিঙ্গনে, মিলেছিলি যেমন ভাবে)
ওরে, তেমনি আবার যা রে মিলে, জগৎ দেখুক নয়ন মেলি।

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

সন্ধিক্ষণ

এত দিনে—এত দিনে বুঝেছে বাঙ্গালী
দেহে তার আজো আছে প্রাণ।
জগতের পূজ্য যাঁরা, তাঁহাদেরই মাঝে
আশা হয় পাব মোরা স্থান।
যে খুসী টিটকারী দিক
অন্তরে বুঝেছি ঠিক—
এ কেবল নহেক হুজুগ;
সন্ধিক্ষণ আজি বঙ্গে, এল নবযুগ!
পথে ঘাটে দেখ চেয়ে অন্তরে বাহিরে,
দেশহিতে বিলাস বর্জ্জন;

বিরাট সহস্র শীর্ষ উঠেছে জাগিয়া,
লক্ষ মুখে এক দৃঢ় পণ।
যেথা যে বাঙ্গালী আছে,
প্রাণে প্রাণে মিলিয়াছে,
শুভ লগ্নে পেয়েছে বাঙ্গালী,
মনে হয়, আর মোরা রব না কাঙ্গালী।
ভগবান্! হীন বলে তুমিই দিয়েছ;
এ অপূর্ব্ব নূতন জীবন।
লইয়া অভয় নাম প্রতিজ্ঞা করেছি;
শক্তি দাও রাখিব……
নব স্রোত, বঙ্গভূমে,
তোমার নির্দ্দেশে নেমে,
সর্ব্ব প্রাণ করেছে সজীব;
হে বরদ! শুভঙ্কর! হে সুন্দর! শিব!
তুমি দাও বুঝাইয়া নিন্দুকে, কুটিলে—
"বাঙ্গালীও জন্মেছে মানব;
কার' চেয়ে তুচ্ছ নয় বাঙ্গালীর দাবী,
বৃথা সে করে না কলরব;
মঙ্গল বিধান যত,
স্বদেশের সেবাব্রত,
আজ সে মাথায় লবে তুলে,
মূঢ় সে—যে দাঁড়াইবে তার প্রতিকূলে।"
উন্মুক্ত সবারি তরে নিখিল সংসারে,
মনুষ্যত্ব-মহত্ত্বের পথ;
চির ধন্য সে পথে কণ্টক দিতে পারে,—
এমন জন্মে না দাসখত;
চুক্তির বেতন পাও,—
সর্ত্ত মত কাজ দাও;

যে প্রভু অধিক করে আশ ;
বলো তারে—কর্ম্মচারী নহে ক্রীতদাস !
অর্থের সম্বন্ধ হ'তে কত উচ্চতর—
মনুষ্যত্ব—দেশহিত ব্রত ;
স্বার্থ সাথে স্বদেশের বিরোধ যেথায়
স্বদেশেরি পায়ে হও নত !
এ কথা না ভুলে রও—
"তুমি শুধু তুমি নও—
দশের মাঝারে একজন ;
দেশের—দশের শুভে কল্যাণ আপন।"
বৎসরান্তে ভাদ্রশেষে শুধু একবার !
কূলপ্লাবী ! আসে যে জোয়াব ;
তাহার তুলনা নাই ; সমস্ত বৎসরে
সে জোয়ার আসে একবার !
সে জোয়ার এসেছে রে,
আমাদের ঘরে ঘরে,
এসেছে রে নূতন জীবন !
বাঙ্গালী পেয়েছে আজ সামর্থ্য নূতন।
পবিত্র কর্ত্তব্য-ব্রত লয়েছি মস্তকে ;
মরেও রাখিতে হবে পণ !
রাজ্যপণে পাশা খেলি' পণরক্ষা হেতু
বনে গেছে হিন্দুবাজগণ।
বিদেশের মুখ চেয়ে,
শতেক লাঞ্ছনা সয়ে,
সংজ্ঞা যদি এসেছে আবার,—
প্রতিজ্ঞা স্মরিয়া, শীঘ্র লও কার্য্যভাব।
এ দিন অলসে গেলে, কি ক্ষতি যে হবে—
দেখ বুঝে অন্তরে সে কথা ;—

আশা ভঙ্গ, মনঃক্ষোভ, শক্তি অপচয় ;
শত দিকে পাবে শত ব্যথা ;—
শত্রু-মিত্রে দিলে গালি,
লেপিবে চরিত্রে কালি ;—
পঙ্কে ফেলি' দলিবে দু'পায়ে ;
আবার সহস্র বর্ষ পড়িবে পিছায়ে।
জাতিত্ব গৌরব যাবে অঙ্কুরে মরিয়া,
ঝরিবে রে আধ-ফোটা ফুল ;
ভগবান্ ! রক্ষা কর—শক্তি কর দান,
প্রভু ! মোরা হয়েছি ব্যাকুল।
দুর্ব্বলের বল তুমি !
দীনের শরণ-ভূমি !
আশ্রয় লইনু তব পায় ;
লজ্জা নিবারণ সখা ! হও সে সহায় ৷
সুবেশ রাখাল বেশ সকল ভুলিয়া,
ধন্য হও স্বদেশের কাজে ;
প্রতিজ্ঞা রাখিয়া স্থির স্থাণুর মতন
মান্য হও জগতের মাঝে।
আত্মতেজে করি' ভর—
কর্ম্মে হও অগ্রসর !
মূর্খে শুধু বলে এ 'হুজুগ' ;
বঙ্গ ইতিহাসে আজি এল স্বর্ণযুগ।

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

মর্ম্মবেদনা*

শাসন-সংযত-কণ্ঠ, জননি! গাহিতে পারি না গান।
তাই মরম বেদনা লুকাই মরমে, আঁধারে ঢাকি মা প্রাণ॥
সহি প্রতিদিন কোটি অত্যাচার,
কোটি পদাঘাত, কোটি অবিচার,
তবু হাসিমুখে বলি বার বার,
"সুখী কেবা আর মোদের সমান?"
বিনা অপরাধে অস্ত্রহীন কর,
অন্নাভাবে অতি শীর্ণ কলেবর,
তবু আশে পাশে শত গুপ্তচর,
প্রতি পদে লয় মোদের সন্ধান॥
শোষণে শূন্য কমলাভাণ্ডার,
গৃহে গৃহে মর্ম্মভেদী হাহাকার,
যে বলে এ কথা অপরাধ তার,
হায় হায়, একি কঠোর বিধান!
না জানি জননি! কত দিন আর,
নীরবে সহিব হেন অত্যাচার,
উঠিবে কি কভু বাজিয়ে আবার,
স্বাধীন ভারতে বিজয়-বিষাণ?

—কামিনীকুমার ভট্টাচার্য্য

* এই সঙ্গীতটি বহু বৎসর পর্য্যন্ত ব্রিটিশ সরকার কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ ছিল।

সুদর্শনধারী

অবনত ভারত চাহে তোমারে এস সুদর্শনধারী মুরারি।
নবীন তন্ত্রে, নবীন মন্ত্রে, কর দীক্ষিত ভাবত নর নাবী।
মঙ্গল ভৈরব শঙ্খনিনাদে,
বিচূর্ণ কর সব ভেদ-বিবাদে,
সম্মান-শৌর্য্যে, পৌরুষ-বীর্য্যে,
কর পূরিত, নিপীড়িত ভারত তোমারি।
মুক্ত সমুন্নত পতাকা-তলে,
মিলাও ভারত-সন্তান সকলে ;
নব আশে হিন্দুস্থান ধরুক নূতন তান।
এস রিপু শোণিতে মোদনা রঞ্জিতে
নব বেশে ভীষণ অসিধাবী।
এস ভারত পাপ নাশকারী॥

—কামিনীকুমাব ভট্টাচার্য

সাধনা

সোনার স্বপন মোহে ভুলিও না, ভাই। সাধনা।
এ যে আলেয়ার আলো, মায়া-মরীচিকা, আশ্বাস ঢাকা ছলনা।
ওদের রুদ্ধ দুয়ারে করি করাঘাত, পেয়েছ করে বেদনা ;
ওরা বুঝিল কি তব ধর্ম্মকাহিনী, বুঝিল কি তব যাতনা ?
ওরা ঘৃণা করে মোদের বর্ণ, মোদের আহ্বানে বধির কর্ণ ;
তুচ্ছ ফুৎকারে দেয় ভেঙ্গে চুরে, সকল সঞ্চিত কামনা।
ওরা মোদের দৈন্যে করি পরিহাস, কেড়ে নিতে চায় মুখের গ্রাস ,

তবু যুক্তকরে ওদের দুয়ারে কেন নিত্য নিষ্ফল যাচনা ?
এখন আপনার পানে ফিরাও নয়ন, জাগাও আপন শক্তি ;
পরের চরণ না করি লেহন, কর আপনার মায়েরে ভক্তি ;
তবে জাগিবে নবীন রঙ্গে, নব জীবন নব বঙ্গে ;
বিশ্ব কাঁপায়ে উঠিবে বাজিয়া রুদ্র বিজয় বাজনা !

—কামিনীকুমার ভট্টাচার্য্য

এই কি সেই আর্য্যস্থান ?

সোনার এই কি সেই আর্য্যস্থান ?
ঐশ্বর্য্যে বিভবে, বাণিজ্য গৌরবে
ছিলে যে এ ভবে সবারি প্রধান
পুণ্যভূমি ধন্য ভারতের নামে,
বাজিত দুন্দুভি সদা স্বর্গধামে,
অসীম পুলকে, সুর-নর-লোকে
গাহিত নিয়ত যাঁর যশোগান।
যাঁর তপোবনে পুণ্য বেদগান,
অম্বর ভেদিয়া তুলিত তুফান,
নক্ষত্র দুলিত আসন টলিত,
কাঁপিত সঘনে দেবতার প্রাণ।
মলয়-সেবিত, শ্যাম-শস্য-ভরা
হিমাদ্রি-শোভিত, বিশ্ব-মনোহরা,
বিতরি যেথায় পুণ্য-ক্ষীরধারা
যমুনা-জাহ্নবী বাহিত উজান।
শুনি বীর-করে কার্ম্মুক টঙ্কার,
সভয়ে জগতে জাগিত ঝঙ্কার,
যে দেশে রমণী কেশ অলঙ্কার
সঁপিত সমরে, ত্যজিত পরাণ।

আসমুদ্রব্যাপী যাঁর রাজ্যসীমা,
ভুবন ব্যাপিয়া বাণিজ্য গরিমা,
কুবের-ভাণ্ডার জিনি' রত্নাগার,
ছিল কমলার চির অধিষ্ঠান।
হায়! ভারতের সেই স্বর্গধাম,
এ দুর্গতি আজ, এই পরিণাম!
ফুরাইল সব, অতীত গৌরব,
আছে শুধু রব শূন্য অভিমান!

—রামচন্দ্র দাশগুপ্ত

মা

আমরা সব মায়ের ছেলে, মাকে পেলে কাকে ডরাই?
আকাশেতে মনের সাধে. মায়ের নামে নিশান উড়াই।
বঙ্গভূমি আমাদের মা, জগতে তাঁর নাই তুলনা,
লোকে করে ধনের গর্ব্ব, আমরা করি মায়ের বড়াই!
মায়ের শস্যে জীবন ধরি, মায়ের জলে তৃষ্ণা হরি,
মায়ের নামে, মায়ের প্রেমে, মায়ের কোলে নেচে বেড়াই।
মায়ের কোলে যবে থাকি, কিছুতে ভয় নাহি রাখি;
মা মা বলে অবহেলে বিপদ বাধা সকল এড়াই।
মা আমাদের অগ্নিময়ী, মায়ের নামে বিশ্বজয়ী,
আমরা সবে মিলে মিশে, দেশে দেশে আগুন ছড়াই।

—রামচন্দ্র দাশগুপ্ত

উদ্বোধন

ঘুচাতে তোমার দৈন্য আজি মা সন্তান সবে জেগেছে,
চেতনার নব-অঞ্জন-রেখা লুপ্ত নয়নে লেগেছে।
চির পর-দাস টুটিয়াছে ফাঁস মাতৃচরণে ঘিরেছে,
তোমার উদার অঞ্চল-মাঝে স্নেহে জননী! ফিরেছে।

ঘরে ঘরে আজি মহাপূজা তব, কীর্ত্তিত তব গরিমা,
ধন-ধান্যের পূর্ণ পসরা ভাণ্ডার তব ভরি মা !
উত্থিত নিতি, বন্দনা-গীতি—আট কোটি প্রাণ মোহিয়া,
বিধাতার শুভ আশীষ ঝরিছে শান্তিধারা বহিয়া।
প্রেমডোরে তব দৃঢ় করি আজি রাখ বাঙ্গালীরে বাঁধি মা !
পদতলে দলি বিদেশী-বিলাস তব ব্রত যেন সাধি মা !
হউক মলিন, তবু চিরদিন অভিমান-মদ ভুলিয়া,
তোমারি বসনে ঘুচাইব লাজ, নত শিরে লব তুলিয়া।
কর আশীর্ব্বাদ যুগ-যুগান্তরে এ কামনা র'ক্ বাঁচিয়া,
নাহি কাজ প্রাণে, আজীবন শুধু পরেরি প্রসাদ যাচিয়া ;
তোমারি কল্যাণ, নিশি দিনমান সাধনা মোদের হ'ক্ মা—
তব পদরেণু সকল বাসনা পবিত্র করি' র'ক্ মা !

—গিরিজাকুমার বসু

মায়ের প্রতি

তোমার বন্দিনী মূর্ত্তি ফুটিল যখন, দীপ্ত দিবালোকে,
সহস্র ভা'য়ের প্রাণ উঠিল শিহরি, ঘৃণা, লজ্জা, শোকে।
পবিত্র বন্দনমন্ত্রে কম্পিত বাঙ্গালা দূর আর্য্যভূমি !
মুক্ত কণ্ঠে যুক্ত করে ডাকিছে তোমায়, হে লজ্জাবারিণী—।
সাধনার ধন তুমি ভারতবাসীর,—সহস্র পীড়নে,
উপবাসে, অনশনে ভোলে নাই তোমা, দুর্ব্বল সন্তানে।
দিব্য মন্ত্রে দিব্য স্নেহে দাও স্থান আজি মন্দিরে তোমার ;
যাক্ যাক্ থাক্ প্রাণ, সে মন্ত্র শুনিয়া জাগিব আবার।
হিমাচল হ'তে দূর কুমারিকা পার, কাননে, প্রান্তরে,
নগরে নগরে ক্ষুদ্র পল্লীতে পল্লীতে, প্রাসাদে কুটীরে,
কোটি কোটি মৃত প্রাণ, হোমাগ্নির প্রায় উঠুক জাগিয়া,
মা তোর তাপসী-মূর্ত্তি, পূজিবে সন্তান হিয়া রক্ত দিয়া !

—কুসুমকুমারী দাস

মাতৃ-আহ্বান

কে আছ মায়ের মুখ পানে চেয়ে, এস, কে কেঁদেছ নীরবে।
মার মুখ চেয়ে আত্মবলি দিয়ে, সে মুখ উজ্জ্বল করিবে।
নিজেরে ভাবিয়া অক্ষম দুর্ব্বল, বাড়ায়েছ মায়ের যাতনা কেবল,
যার মাতৃকণ্ঠে বাজিছে শৃঙ্খল, দুর্ব্বল সবল সে কি ভাবিবে?
জান না রে মূঢ়! জননী তোমার পুরাকাল হতে কি শক্তি-আধার,
সন্তানের কণ্ঠে শুনিলে হুঙ্কার, নয়নে বিজলী খেলিবে।
ক্ষুদ্র স্বার্থে মজি' এখনো কি ভাই, মা হতে সুদূরে রবে ঠাঁই ঠাঁই?
হিন্দু, মুসলমান, এস সবে যাই, মা যে ঐ ডাকিছে সবে।
কে আছ আজি ও পরপদসেবী, এস উঠে এস মার পুত্র সবই,
ধমনী ভিতরে এক রক্ত বহে, একই মাতৃনামে উন্মত্ত হবে।
কে আছ বিদেশী আদেশে গোপনে, আছ ভাই মাতৃসেবক সন্ধানে,
চেয়ে দেখ আজ মা চাহে তোমায়, তাঁরে কি কাঁদায়ে ফিরিয়া যাবে?
কে আছ বিপদে না করি দৃক্‌পাত, মৃত্যুনির্যাতন, দৈব বজ্রাঘাত;
খণ্ড খণ্ড হয়ে এস মুখ চেয়ে, এস কে মারিতে পারিবে?
এস শীঘ্র এস, বেলা বহে যায়, এনেছে জাপান উষা এশিয়ায়,
মধ্যাহ্ন-গরিমা—স্বাধীন ভারত, আনিবে, নিশ্চয় আনিবে।

—স্বামী প্রজ্ঞানন্দ

স্বাধীনতা

স্বাধীনতা ! স্বাধীনতা !
বদ্ধ জীবের আদি আর শেষ কথা ।
উহার লাগিই উৎকণ্ঠিত প্রাণ,
উহাই মুক্তি, মোক্ষ ও নির্ব্বাণ,
ওই কামদুঘা, ওই ত কল্পলতা ।
জীবনের ওই গায়ত্রী সুধামাখা,
ওরই সন্ধানী গরুড় সবল পাখা ।
উহারি সাধনা চলিছে মনে ও বনে,
কভু প্রকাশ্যে, কভু বা সঙ্গোপনে,
আকাশের গায়ে উহারি পতাকা আঁকা ।
নীল পারাবার উহারি ত জয় গাহে,
উৎস, নির্ঝর, উহারি সঙ্গ চাহে ।
গৃহী অগৃহী কেহই পড়ে না বাদ,
সকলেই চায় মুক্তির আস্বাদ,
সুধার সত্র তারি ছত্রের ছায়ে ।
মানবের এই স্বাধীন মুক্ত প্রাণ
ধর্ম্ম উহার ঊর্দ্ধেতে উত্থান ।
জ্ঞাতিত্ব তার সব দেবতার সাথ,
পংক্তি-ভোজনে পাশাপাশি পাতে পাত,
অধীনতা তার অতি বড় অপমান ।
ভাঙ্গি' কমলের কোমল গণ্ডীদল
চায় স্বাধীনতা রুদ্ধ সে পরিমল ।
ডাকে কোকিলের কণ্ঠ অকুণ্ঠিত,
সকল বিটপী হইতে মঞ্জুরিত,

প্রকাশে বিকাশে দীন, শুধু হীনবল
জন্মের দাবী পরিপূর্ণতা লাভ,
স্বাধীনতা শিবশক্তির দেওয়া ছাপ।
শৃঙ্খলা আনে দেহে মনে নব শ্রী তো
কারেও সে কভু করে না শৃঙ্খলিত !
শৃঙ্খলা বর, শৃঙ্খল অভিশাপ ॥

—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

কে দিবিরে প্রাণ

দেশের লাগি সর্ব্বত্যাগী কে বিলাবি প্রাণ,
সে আয় রে ছুটে মায়ের ডাকে নিশি অবসান।
দেখ রে চেয়ে হাসে ঊষা শিরে শোভে কনকভূষা
গাহে পাখী গান, তোরা কে দিবিরে প্রাণ,
কে দিবিরে দান,
সে আয় রে ছুটে মায়ের ডাকে নিশি অবসান।
ঐ দেখ মার হাতে অসি, নয়ন জ্বলে সর্ব্বনাশী
হাতে তাহার খর্পর-শূল—
"মাভৈঃ" রবে করে আহ্বান,
আয় রে ছুটে মায়ের ডাকে নিশি অবসান।

—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

উদ্বোধন-বাণী

কি ছিলে কি হলে, ভেবে দেখ একবার।
ঘুমায়োনা আর!
অত্যাচারে, অবিচারে, গেল দেশ ছারে-খারে!
কারো কি শকতি হায় নাহি জাগিবার
ঘুমায়োনা আর!
মরণেরে কর এবে উপাস্য সবার।
ঘুমায়োনা আর!
মৃত্যুকে যে করে ভয়, তারি মৃত্যু আগে হয়,
জাতীয় জীবনে মৃত নাম লেখা তার।
ঘুমায়োনা আর!

—পঙ্কজিনী বসু

বঙ্গলক্ষ্মী

ইতিহাসে খুঁজি তোমা, স্বপ্ন-সুষমায়
গড়ে তুলি' অপরূপ মোহিনী মূরতি—
মনোময়ী প্রতিমার করি যে আরতি।
বর্ষে বর্ষে কোজাগর লক্ষ্মী-পূর্ণিমায়।
জ্যোৎস্নারাতে পদচিহ্ন রাখিলে কোথায়—
খুঁজিয়াছি তরী বেয়ে সারা ভাগীরথী;
হেরি শুধু ভাঙ্গা ঘাট বিজন বসতি—
প্রয়াণের পথরেখা নদী-সিকতায়!
গেছে রূপ, ছায়া তবু ভাসে যেন চোখে;

হেমন্তের মায়ামৃগ—স্বর্ণ-মরীচিকা—
ধায় আজো শস্যশীর্ষে চম্পকে অশোকে
বসন্ত বিদায় মাগে ; আজো মালবিকা
চেয়ে থাকে অনিমিখ নব মেঘালোকে—
কবির অমর শ্লোকে লভে জয়টীকা।
উপবাসী চাষী কাঁদে শূন্য আঙিনায়,
শরতের পীত রৌদ্রে দীর্ঘ জ্বর-জ্বালা।
কে গাঁথিবে তরুমূলে শেফালির মালা—
অর্চ্চিবে কমল তুলি' কমলাসনায়।
তুমি লক্ষ্মী ছিলে কবে, আছ কল্পনায় ;
নাই ঝাঁপি, আছে শুধু নৈবেদ্যের থালা,
নিত্য পূজা-অভিনয়ে বৃথা দেয় বালা
গৃহদ্বারে আলিপনা প্রতি পূর্ণিমায়।
ছিলে যবে হে জননি, সারা দেশ ভরি'—
তখন করেছি পূজা গৃহদেবী রূপে ;
আজ তুমি গৃহে নাই, তাই চুপে চুপে
সমগ্র দেশের রূপে মূর্ত্তিখানি গড়ি।
লক্ষ্মীরে চাহি না বটে দীপে আর ধূপে—
বঙ্গলক্ষ্মী ? সেও যে রে ছায়া ধরাধরি।

—মোহিতলাল মজুমদার

মড়ার মুলুক

গভীর গভীর ভারত-জলধি হা হা ক'রে তীরে লুটায়ে পড়ে,
রহিয়া রহিয়া কাঁদে হিমালয়, নিঃশ্বসি ঘোর তুষার-ঝড়ে!
পশ্চিমে হের, আহত রবির ঝুরিছে প্রাণের শোণিত-ধারা,
পূরবের দ্বার খুলিবে না শশী, আসিবে না হায় অযুত তারা।
শ্মশান-সভায় কারা শুয়ে আছে—কে তোরা, কে তোরা,
দু-আঁখ ঢেকে?
শব-সাধনার শক্তি কোথায়? শোনো, শোনো, দ্বারে যেতেছি ডেকে।
জীবন চাই গো, জীবন চাই!
সকলি রয়েছে আমার স্বদেশে, খুঁজে দেখি শুধু—মানুষ নাই!
নাচিছে মশানে কালী-কপালিনী—জ্বলো জ্বলো জ্বলে খড়্গ তাঁর
এস তান্ত্রিক! শুনাও মন্ত্র, চণ্ডীকে দাও অর্ঘ ভার!
জননী যাদের রমণী হলেও দানব-দলনী শক্তিময়ী,
পুত্রেরা তাঁর বেঁচে-ম'রে হা হা-চিত্তে তাদের ভক্তি কই?
কাহারা আনিবে মাথার মুকুট, কাহারা গাঁথিবে ফুলের মালা,
কাহারা বুনিবে নূতন বসন, কাহারা বহিবে পূজার থালা?
জীবন চাই গো, জীবন চাই!
সকলি রয়েছে আমার স্বদেশে, খুঁজে দেখি শুধু—মানুষ নাই!
ভারতে এখন আছে বটে মেষ, আছে বটে গাধা, শৃগাল-দল,
তার মাঝে কোথা সারাদিন খুঁজে, জ্যান্ত মানুষ পাইবি বল্!
নিতি-নিতি হেথা রাজনীতি নিয়ে ছেঁড়াছিঁড়ি করে শকুন-কাক,
বড় বড় কথা শুনি চারিভিতে, ভরিল না তবু প্রাণের ফাঁক!
অন্ধ-যুগেতে গান্ধী আছেন—অমানুষ মাঝে মানুষ একা,
কে গো আছ আর তাঁহার দোসর, থাক যদি কেউ দাও গো দেখা!
জীবন চাই গো, জীবন চাই!
সকলি রয়েছে আমার স্বদেশে, খুঁজে দেখি শুধু—মানুষ নাই!

জেগেছে রুশিয়া, রাজার গোলামী, প্রজার সেলামী ঘুচেছে আজ,
জেগেছে ফরাসী—নূতন তুর্কী, পরেছে মাথায় যশের তাজ !
জেগেছে জাপান—সবুজ যুগের তরুণ সাধক তুলেছে শির,
জেগেছে চীনের যত পীত ছেলে, ভুবন-আসর করেছে ভিড় !
পৃথিবী জেগেছে—আমরা জাগিনি, জাগা'র লগন যায় গো যায়,
হৃদয়-গঙ্গা বহাতে হেথায়, নব-ভগীরথ, আয় গো আয় !
জীবন চাই রে, জীবন চাই !
সকলি রয়েছে আমার স্বদেশে, খুঁজে দেখি শুধু—মানুষ নাই !

—হেমেন্দ্রকুমার রায়

কারেও করি না ভয়

আমি মরণ আজিকে বরণ করিব, শরণ তবু না চাই
আমি নয়ন আজিকে দমন করেছি, অশ্রু তাহাতে নাই
শত বেদনা আমার কামনা আজিকে,
লাঞ্ছনা সুখে বহিব
তবু শরণ কভু না মানিব।
আজি মঙ্গল নহে সম্বল মোর, সহায় চাহি না দৈব,
বিপদ বরেছি সম্পদ ফেলি, অশনি মাথায় লইব,
বৃশ্চিক শত দংশনরত
যন্ত্রণা তাহাতে নাই
বজ্র ধ্বনিতে চাই।
আজি বিশ্বে কাহারে করি না ভয়, ভয়েরে করেছি জয়,
শাসন-বাঁধন কিছুই মানি না, ঝঞ্ঝা-প্রলয়-লয়,
শয়ন শিয়রে কৃপাণ ঝুলিয়ে
মরণ নিঃসংশয়,
কারেও করি না ভয়।

—মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

মাতৃবোধন

এত দিন পরে, জননীরে যবে আজিকে পড়েছে মনে,
মায়ের সন্তান কেউ কোথা আর থাকিস্ নে নিরজনে।
সবে মিলে তোরা কর্ আয়োজন,
মাতৃপূজার বসা রে বোধন ;
দুঃখ-দৈন্য-ক্লেশ-মলিনতা দূর কর প্রাণপণে,
বেলা গেল বয়ে, মিছে কাজ লয়ে, থাকিস্ নে নিরজনে।
ওই শোন ওই মায়ের অভাব, বস্ত্র নাহিক ঘরে ;
অন্ন বিহনে শীর্ণ যে তনু রত্ন হরেছে পরে,
কোটি পুত্র তোরা আছিস্ সবাই পেয়েছিস্ নব প্রাণ,
এখন সকলে বল রে তোরা, কি করিবি মাকে দান
কি দিয়ে তাহার করিবি সজ্জা,
কেমনে হরিবি দীনতা-লজ্জা,
সব ত' দিছিস্ পদকরতলে, কেমনে রাখিবি মান ?
এখন সকলে বল্ রে তোরা, কি করিবি মাকে দান ?
বিদেশী বণিক্ শত বর্ষ ধরে
যে ধন লয়েছে হরে.
পারিবি কি তাহা কাড়িয়া আনিতে, পারিবি কি দিতে প্রাণ ?
পারিবি কি তোরা ঘোচাতে দুঃখ, মায়ের মুখটি ম্লান ?
সবে মিলে তোরা কর্ আয়োজন,
মাতৃপূজার বসা রে বোধন,
এক প্রাণ হয়ে মনে বল নিয়ে হ'রে সবে আগুয়ান,
হাসিমুখে তোরা অকাতরে কর লক্ষটি শির দান।
থাকুক শিয়রে শাণিত কৃপাণ লক্ষ ঝঞ্ঝাবাত,
মরণের ভয় শত বিভীষিকা করিস্ নে দৃক্‌পাত ;

নবীন সাহসে হাতে তুলে ধর মাতৃজয় নিশান
বিশ্বসমাজে পরিচয় দে রে তোরা কার সন্তান।
ওই দেখ ওই জননী তোদের কাতর মলিন ক্ষীণা,
দ্বারে দ্বারে ফেরে ভিখারিণী মত অন্নবস্ত্রহীনা।
শত কোটি তোরা পুত্র যে তাঁর পেয়েছিস্ নব প্রাণ
আর কেন বল নীরবে শুনিবি মাতৃদৈন্য গান?

—মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

বাঙালীর দাবী

জগৎসভায় একদিন ওরে তুই ছিলি যে সিংহাসনে,
এই ভারতে গুরুর মতো মান্তো তোরে সব্ব জনে।
ভারত জুড়ে তুই তো দিলি স্বাধীনতার দীক্ষা দান,
জাগিয়ে দিলি অগ্নিবোমায় লক্ষ কোটি বক্ষে প্রাণ।
গোখেল মহা শ্রদ্ধা দিয়ে বল্লে তোরেই ভারত-গুরু,
ভারত জুড়ে' আগেই তোরি কৃষ্টিরই জয়যাত্রা সুরু।
তোর মাটিরই গুরুর বাণী বন্দে' ছিল রোমা রোঁলা,
তোরই ছেলে মার্কিনেরি বক্ষে দিল ধর্ম্মে দোলা!
আর্য্যনামের যে বন্দনা উঠলো আজি সিন্ধুপারে,
গৌরবেরি প্রতীক সে তুই আজ কিনা হায় অন্ধকারে।
উপেক্ষিত গৌরব এবং সৌরভেরি কৃষ্টি তোর,
লুটায় যে তোর পদ্ম-গোলাপ হঠাৎ হল বন্ধ দোর।
সর্ব্ব ভারত প্রজ্ঞাদীপের দীপান্বিতার দীপ্ত আলো,
আজকে গো তোর দীপ্তি ঘিরে টাঙিয়ে দিলে পর্দ্দা কালো?
সবাই তোদের বলছে মৃত, চিত্তে তোদের লজ্জা নাই?
জানিয়ে দে আজ জ্যান্ত তোরা ঝঞ্ঝারই এক ঝঞ্চনায়।

গঞ্জনারই বিন্ধ্য পাহাড় আজকে ফেটে চৌচির হোক,
ক্ষুদ্র নহিস, রুদ্র তোরা জানুক তা' আজ সর্ব্ব লোক।
কঙ্কালে জয়ডঙ্কা বাজুক, জোর ক'রে ধর কব্জিখান,
আত্মতেজের দীপ্তিতে তোর জ্বলুক স্বয়ং বিবস্বান।
গর্জ্জে দাঁড়া হুঙ্কারিয়া জাগরে নরসিংহ বীর,
গর্জ্জনে তোর সব পশুবল চম্‌কে উঠুক এই মহীর।
অমৃতেরি পুত্র তোরা, নেই তো তোদের মৃত্যু-ভয়,
ন্যায্য দাবীর অগ্নিলিপি পাঠিয়ে দে আজ জগৎময়।

—শৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

উদ্বোধন

আবার যখন গান ধরেছি, গাইবো সেই গান,
বুকটা যাতে ফুলে ওঠে,
শিরায় যাতে অগ্নি ছোটে
তন্দ্রা যাতে যায় গো টুটে মাতায় যাতে প্রাণ!
অগ্নিগিরির গর্ভমাঝে সাগর গর্জ্জনে,
সিংহনাদের ঝড়ের বুকে, মেঘের তর্জ্জনে,
এদের ভেতর ওতপ্রোত,
রয়েছে সে সুরের স্রোত,
আজকে সে যে বাহির হবে, করবে প্রলয়-অভিযান।
খপূপ সব উর্দ্ধে উঠে, আকাশ লুটে নেবে,
চন্দ্র-সূর্য্য অবাক হয়ে থাকবে চেয়ে সবে,—
পাখা মেলি পাখীর মতন,
বিদারিয়া উর্দ্ধ গগন
বিশ্বরাজের চরণতলে লভিবে নির্ব্বাণ।
গান গেয়েছি অনেক বটে, তারে কি কয় গান?

আকাশ-পৃথ্বী হ'লো না যায় টলটলায়মান ?
ভূমিকম্প জলোচ্ছ্বাস,
উঠলো না যায় ঘূর্ণিবাতাস,
লক্ষ প্রাণের সম্মুখে যার ডাকলো নাক বান।

—হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

আহ্বান

চলো চলো ছুটে চলো, শত্রুনাশে চলো সবে দৃপ্ত রণসাজে,
স্বাধীনতা সংগ্রামের সাহসী সৈনিক! করো যুদ্ধ অভিযান।
ফিরাইয়া আনো তব অপহৃত মর্য্যাদারে বিশ্বসভামাঝে,
অসি-চর্ম্ম-ধনুঃ-শর ধরো লৌহবর্ম্ম পরো শিরে শিরস্ত্রাণ।
খরশব্দ অশ্বখুরে দীর্ণ পথে কীর্ণ হোক লক্ষ অগ্নিকণা,
বেগে তার ক্ষুব্ধ বায়ু দিক্ ধূলি ধূসরিত করি চারিধার,
চলো বীর রুদ্রতেজে রেখো মনে মুক্তিলাভ শক্তির সাধনা।
সবেগে বল্গা টানো হ্রেষারবে যুক্ত হোক ঘণ্টার ঝঙ্কার!
উঠুক চরণচাপে চঞ্চলিয়ার রেকাবের সঘন স্পন্দন,
চকিত বিদ্যুৎসম চমকি ঝলকি যাক্ খড়্গখরশান,
উর্দ্ধে তুলি বজ্রমুষ্টি প্রচণ্ড আঘাতে করো শত্রুনিপাতন!
সর্ব্ব বাধাবিঘ্ন আজ ফুৎকারে উড়ায়ে করো লক্ষ্য অবধান।
হোক তব রণরঙ্গ দুঃসহ যৌবনদর্পে দুরন্ত উচ্ছল,
সমর সঙ্ঘাতে মাতি অরাতি শোণিতে সবে করো ধরাস্নান,
বন্দিনী মায়ের মুক্তি লক্ষ্য হোক একমাত্র হে সন্তানদল,
তুচ্ছ করি সর্ব্ব স্বার্থ শৃঙ্খল ভাঙ্গার মন্ত্রে তোলো জয়গান!
ঐক্যবদ্ধ সংঘর্ষের অমর্ষে মসৃণ হোক কণ্টকিত পথ;
ভীষ্মসম শৌর্য্যে থাক আজীবন অবিচল স্বাধীনতা পণ,
চূর্ণ করি শত বাধা যাক্ ছুটে সগৌরবে তব জয়রথ,
পরাতে মুক্তির গর্ব্বে জননীরে জয়মাল্য তিলকচন্দন।

—শ্রীনরেন্দ্র দেব

স্বদেশ-শৃঙ্খল

নিজ হাতে গড়া হাজার নিগড়ে দেহ-মন তার বাঁধা,
বন্দিদশায় হে দেশ আমার মিছে আজ তোর কাঁদা !
পঞ্জিকা তোরে বাঁধিয়া হরেছে কালগত স্বাধীনতা,
শাসনে কুব্জ করিয়া রেখেছে শত শত হীন প্রথা।
ঘটকপঞ্জী কোষ্ঠীকুলুজী গোষ্ঠীকাবিকা যত—
নূতন নূতন শিকল গড়িতে ক্রিয়াশীল অবিরত।
ঋষিরা পরাল মৈত্রীর রাখী, শাস্ত্র-বণিকগণ
মৃত্যু-কঙ্কাল-শৃঙ্খলে বাঁধি' হরিল অমৃত ধন।
অবরোধে তোর এক চোখ কাণা, আর চোখ রোস্ মুদি',
কাণে গলা সীসা শাসনের ডোর রসনা রেখেছে রুধি'।
অতীতের সাথে কটি বাঁধা তোর রয়েছিস্ চোর সেজে,
হাজার মাদুলী কবচের তলে মরেছিস্ হেজে হেজে।
কণ্ঠ যে তোর চিরদিন বাঁধা দৈববাদের যূপে,
এমনি করিয়া বাঁধা তুই হায় শত পাকে শত রূপে।
জঙ্ ধরে গেছে সকল শিকলে, বদল হয়েছে রঙ্,
মহামানবের রঙ্গভূমিতে সবে হেরে তোর সঙ্ !
বিদেশী শাসনে সব হ'তে কড়া শিকল বলিয়া জানি
বাঁধা হাত-পায় ভাঙ্গা দাঁতে মিছে করছিস্ টানাটানি।
চিরকাল ধরে' যে বাঁধন তোর এঁটে আছে দেহটায়,
এ বাঁধন শুধু উপরে উপরে বাঁধা তারি গায় গায়।
ছিঁড়িবে যে দিন স্বদেশী বাঁধন, ও শিকল রশারশি,
বিদেশী বাঁধন তারি সাথে সাথে আপনি পড়িবে খসি'।

—শ্রীকালিদাস রায়

আশা

(আমি)　পথের কিনারে ঘুমিয়ে পড়েছি
(তুমি)　সে পথ কবে চলিবে !
(আমি)　আবেশের মোহে জড়ায়ে গিয়েছি
তুমি কবে আসি জাগাবে !
সে আঁধার ঘুমে তপন হাসে না,
সে বিজনে ওগো বীণা যে বাজে না.
(তুমি)　হাসির আলোক গানের পুলক
সেখানে বহিয়ে আনিবে !
শ্মশানের শান্তি জাগিছে জীবনে,
ভেঙ্গে দিবে তাহা বজ্রবেদনে,
আমার বিজন নিশীথ বিরামে
রথ ঘর্ঘর শুনারে !
শূন্য ঘটখানা আছে মোর করে,
অমিয় সাগরে দিবে কবে ভ'রে,
ঘুমন্ত বীণায় বিজয়-রাগিণী
ঝঙ্কারি কখন তুলিবে !
(আমি)　সারাটি জীবন যতন করিয়ে
একটি সলিতা তুলেছি পাকায়ে,
(তুমি)　কখন আসিয়া পুলকে হাসিয়া
তোমারি আলোক জ্বালাবে !
একবার মোর শিখাটি জ্বলিলে,
নিভিবে না কভু বাতাসে সলিলে,
(কত)　আঁধার ঘরেতে আমারি আলোকে
শত শত শিখা জ্বলিবে !

—সুখরঞ্জন রায়

তোরা ভুলিস্ না

তোরা কেউ ভুলিস্ না ভাই পাঞ্জাবের সেই অত্যাচার !
ভুলিস্ নারে জালিন্‌বাগ আর মানুষখেকো সেই ডায়ার !
নাইরে কসুর নাই অপরাধ,
দাগ্‌লো কামান, হায় কি নিষাদ !
হাজার দেড়েক মার্‌লো প্রাণে, ঘা'ল করেছে হাজার হাজার !
হিন্দু-মুসলমানের রক্ত
অমৃতসর কর্‌লো সিক্ত,
কত নারীর ভাঙ্‌লো কপাল, উঠ্‌লো ভীষণ হাহাকার '
স্মিথ্ সাহেবের হায় কি হৃদয় !
কি দেবো ভাই তার পরিচয় !
মানিন্‌ওলায় নারীর উপর কর্‌লো পাশব অত্যাচার !

—শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

অরুণোদয়

ভীরু আছে, তাই গর্ব্বে তুলিছে অত্যাচারীর জয়-নিশান।
ক্লৈব্য রয়েছে, অন্যায় তাই নিঃস্বের করে রক্ত পান॥
দুঃখের ভয়ে কাঁপি সদাই শৃঙ্খলে আজি বন্দী তাই।
জীবনেরে বড়ো ভালোবাসি ব'লে শয়তান এত শক্তিমান॥
আকাশ-বিদারি বজ্রকণ্ঠে গর্জ্জিয়া বলো রে অন্যায়।
মরে যাবো তবু মস্তক কভু নত করিব না তোমার পায়॥
দেখিবে নূতন অরুণোদয় রাঙিয়া তুলিবে দিগ্‌বলয়।
মৃত্যুর পাশ ছিন্ন করিয়া জাগিয়া উঠিবে দৃপ্ত প্রাণ॥

—শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

পার্থ

দুর্য্যোধনের দাম্ভিকতায় হান্‌বে দারুণ দম্ভোলি
কই সে স্বাধীন আগুন-ভরা আত্মা রে ?
সত্য-শিব-সুন্দরেরে কেউ দেবে না অঞ্জলি
অর্ঘ্য দেবে সবাই কেবল মিথ্যারে ?
দুঃশাসনের নিষ্পেষণে লাঞ্ছিতা আজ পাঞ্চালী,
ক্ষুব্ধ আকাশ যাজ্ঞসেনীর ক্রন্দনে ;
ভীষ্ম কি আজ মগ্ন ঘুমে, দ্রোণের বুঝি তূণ খালি,
শৌর্য্য আজি নির্ব্বাসিত কোন্ বনে ?
বীরের ধনু ব্যর্থ হয়ে শমীশাখায় দুল্‌বে হায়,
পৃথ্বী কেঁপে উঠ্‌বে না তার টঙ্কারে ?
পার্থ যদি অন্দরে আজ নৃত্য করে নূপুর পায়,
রুখ্‌বে কে আর অন্যায়ের এই বন্যারে ?
বৃহন্নলা মরুক্ এবার গর্জ্জে উঠুক ফাল্গুনী,
ঐ যে ডাকে শঙ্খ গুরু গর্জ্জনে !
আর কত কাল কাটবে জীবন কর্ম্মবিহীন দিন গুণি'
ঘর ছেড়ে বীর বেরিয়ে এস অঙ্গনে !
ধর্ম্ম যখন শৃঙ্খলিত, ন্যায়ের শিরে খড়্গ রে,
সাম্য যবে ধূলির 'পরে লুণ্ঠিত ;
মুক্তি যখন গুম্‌রে কাঁদে জতুগৃহের পিঞ্জরে,
নিজের মাঝে রইবি অবগুণ্ঠিত ?
দেখিস্ না কি অসীম জীবন সাগর-সম উদ্বেলি'
দিবস-নিশি আকাশতলে দুল্‌ছে যে ?
এই জীবনের সিন্ধুমাঝে ঝাঁপ দিয়ে পড় সব ফেলি'
উঠবে প্রাণে আনন্দেরই সুর বেজে !

কর্ম্মসাগর ফেনিল দেখে শঙ্কা জাগে মর্ম্মে কি,
ক্ষত্রিয় তাই ভুল্‌ল কি তার কার্ম্মুকে ?
মহাভারত অলস মনের স্বর হয়েই রইবে কি,
দীপ্ত উষা জাগ্‌বে না কি সম্মুখে ?
হর্ম্ম্য ছেড়ে বেরিয়ে এস, বর্ম্ম পরে' দাও দেখা,
লুপ্ত কর অধর্ম্মের এই শর্ব্বরী ;
কৃষ্ণ যাহার বন্ধু সে ত বিশ্বে কভু নয় একা,
কপিধ্বজের চক্র উঠুক ঘর্ঘরি' !
বৃহন্নলার নূপুর ফেলে টঙ্কার দাও গাণ্ডীবে,
সব্যসাচী, ঐ যে বাজে তূর্য্য রে !
জীর্ণ যাহা তারে তোমার বীর্য্য নব রূপ দেবে,
অন্ধকারে আনবে টেনে সূর্য্যরে !
ধ্বংস দেখে শঙ্কা লাগে ? দেখ্‌ চেয়ে কালভৈরবে—
জটায় লেগে লক্ষ তপন চূর্ণিত ;
অসীম আকাশ মুখর তাঁহার ববম্‌ ববম্‌ বম্‌ রবে,
চরণ-ঘায়ে বসুন্ধরা কম্পিত !
মধুর হয়ে সেই ত আবার ফোটাল পারুল-চম্পারে ;
মর্ম্মে বাজায় প্রেমের মৃদু কিঙ্কিণী,
ভোরের বেলায় পাখীর বাসা জাগায় গানের ঝঙ্কারে
জীবন, মরণ—কোন্‌খানে বল নেই তিনি ?
বাজিয়ে বেণু চরিয়ে ধেনু ফিরছে বনে প্রান্তরে
বৃন্দাবনের চির-বালক দুরন্ত ;
ধনঞ্জয়ের রথের ঘোড়ায় রশি আজি সেই ধরে,
শঙ্খনাদে কাঁপিয়ে তোলে দিগন্ত !
অহঙ্কারের তিমির হতে নাও ফিরিয়ে দৃষ্টিরে,
ফুটুক আঁখি দিব্য আলোক-সম্পাতে ;
সেই অসীমের ইচ্ছা চালায় বিচিত্র এই সৃষ্টিরে,
সব্যসাচী, নিমিত্ত হও তাঁর হাতে ।

রইবে নিয়ে ভাবের বিলাস, আজকে তাহার সময় কই ?
মহাকালের বজ্র ওঠে হুঙ্কারি' !
মরণ-মাঝে জীবন যিনি, ঐ যে তিনি ডাকেন ওই—
পার্থ, আজি কর্ম্মসাগর দাও পাড়ি !!

—শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

সায়ং চিন্তা

সাঁঝের গগন ছেয়ে তারকা ফুটেছে রে,
কোটি কণ্ঠে তব নাম বাজিয়া উঠেছে রে !
তব পদ-ধূলিরাশি সারা দিন মাখি' গায়,
তব পুণ্য ক্রোড়ে সবে হের ওই ছুটে যায় !
কত যুগ পরে আজি ব্যাকুল হয়েছে প্রাণ,
পথি মাঝে শুনে মাতঃ, তোমারই আহ্বান গান !
অর্ঘ্য ল'য়ে তব তরে সন্তান ছুটেছে রে,
কোটি কণ্ঠে তব নাম বাজিয়ে উঠেছে রে !
তব স্নিগ্ধ দীর্ঘশ্বাস মৃদুল পবন বায়,
আদরে ব্যজন করি, শীতল করিছে কায় !
সারা দিন পুত্রগণ তুলেছে কর্ম্মের রোল,
তাই এবে তৃণমাঝে পেতে দে'ছ স্নেহ-কোল !
তাই তব পুত্রদল আসিয়া জুটেছে রে,
কোটি কণ্ঠে তব নাম বাজিয়া উঠেছে রে !
আজি হতে তব মাতঃ ! ভুলি স্বার্থ ভুলি লাজ,
তুলিয়া লইনু শিরে তোমারই পবিত্র কাজ !
কেন মাতঃ, কেঁদে সারা থাকিতে সন্তান দল ?
কেন মাতঃ, বুকে ব'য়ে পড়ে উষ্ণ আঁখি-জল ?
বাঙ্গালীর প্রাণে আজি চেতনা ফুটেছে রে,
কোটি কণ্ঠে মাতৃনাম বাজিয়া উঠেছে রে !

—শ্রীসন্তোষকুমার বসু

এস মা

অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত কর সন্তানে তব আজ।
আশীর্ব্বাদের বর্ম্ম পরাও ঘুচায়ে দৈন্য সাজ।
তৃপ্ত কর মা হৃদয় রুধির, দূর ক'রে দাও ভীতি অশ্রুনীর
দাঁড়াই আমরা মা তোরে ঘিরিয়া, বিশ্ব-সভার মাঝ।
মানুষ আমরা নহি ত মা হীন, তুই যার মা সে কি কভু দীন?
তবে কেন মিছে পড়ে থাকা মিছে; কেন এ অলীক লাজ?
এস, এস, এস, এস মা আমার—দশপ্রহরণধারিণী।
হাস মা অট্ট অট্ট-হাস্য ভূলোক-দ্যুলোক-নাদিনী।
মোরা করি বিদূরিত স্বার্থদ্বন্দ্ব সাধিয়া তোমার কাজ।

—স্বামী শ্রীচণ্ডিকানন্দ

সত্যাগ্রহী

ওই সব ওরা
সত্যের নামেতে বহে দুঃখের পসরা;
প্রসন্ন নির্ভীক
ভবিষ্যৎ ভারতের অগ্রগামী নবীন সৈনিক!
অন্তরে একটি দ্যুতি অনির্ব্বাণ জ্বালা
বক্ষে জয়মালা,
চক্ষে তারি অকপট শিখা
ললাটে অঙ্কিত ওই দীপ্ত ললাটিকা;
একনিষ্ঠ সত্যের বিশ্বাসী
ওরা অবিনাশী।
মহাকাল যাত্রাপথটিতে
আপন চরিতে
প্রতিষ্ঠিত—
কারার শৃঙ্খল কভু পারে নাই করিবারে ভীত,

মুক্তপ্রাণ নির্ঝরের ধারা
সত্যের নামেতে আজ দুঃখ সহে যারা !
ইতিহাস লিখিবে না উহাদের নাম
কোন্ দেশ কোন্ গ্রাম,
কোন্ পরিচয় ?
নির্ভীক বীরত্ব-গাথা কোথা হ'বে লয় ?
পরাধীন এ দেশের বুকে
যশের তোরণদ্বার খুলিবে না ওদের সম্মুখে—
নামের কিরীট কেহ দিবে না মাথায়
ধনের গৌরবমালা তুলিবে না ওদের গলায় !
তবু ওরা জয়ী মহাপ্রাণ
অন্ধকার এ ভারতে দীপশিখা রেখেছে অম্লান,
প্রাণের প্রদীপ জ্বেলে।
দ্বারে দ্বারে অবহেলে
পাঠায়েছে সাম্য-মৈত্রী-সত্যের আহ্বান,
তাই ওরা জয়ী, ওরা মুক্ত মহাপ্রাণ !
শাস্ত্রহীন অস্ত্রহীন, তবু
ভবিষ্যৎ ভারতের শক্তির প্রতিভূ।
ওরা অন্তরের বলে মহাবলীয়ান্
আগ্নেয়াস্ত্র গোলার সমান ;
প্রকম্পিত করিবে যে ওরা দিগ্‌বিদিক্—
স্বাধীন এ ভারতের জীবন্ত প্রতীক !
অসত্যের কারামুক্ত ধারা—
সত্যের নামেতে আজ দুঃখ সহে যারা !

—শ্রীনিরুপমা দেবী

শক্তি-বোধন-মন্ত্র

দশভুজে, আজ দশভুজে তোর দশায়ুধ দিতে পারিনি মা,
দস্যু করেছে অস্ত্র হরণ দশপ্রহরণধারিণী মা !
চতুর্বর্গদায়িনী দুর্গা স্বর্গসুষমাশালিনী মায়
সাজায়ে দিয়েছে কালী কপালিনী সন্তান-শিরমালিনী হায় ।
নীরব তথাপি কেন গো জননী অধোমুখে কেন অধিষ্ঠান,
স্খলিত কি হেতু হেরি মা তোমার শ্লথ করধৃত খর কৃপাণ !
নয়নে তোমার নাই সে ভ্রূকুটি বদনে তোমার গরিমা কই,
চরণে তোমার নাই সে দম্ভ শম্ভুঘরণী ব্রহ্মময়ী !
যে রূপে দলিলি দানবীয় চমূ খর্পরে করি শোণিত পান
বিকট আস্যে অট্টহাস্যে বিশ্ব বসুধা কম্পমান ।
রণচণ্ডিকে মুণ্ডমালিনী, সে রূপে জননী আয় আবার
তাণ্ডবে ব্রহ্মাণ্ড কাঁপায়ে দণ্ডি ভণ্ড কপটাচার ।
কত কাল আর মহাকাল-জায়া নীরবে সহিবি নির্যাতন ।
আজিও যদি না জাগিলি জননী, কবে হবে তোর উদ্বোধন !

—শ্রীজগদানন্দ বাজপেয়ী

ভারতমাতা

আজ দেখা দিলে ঝলকি' নিখিলে মৃন্ময়ী মাগো কালো নিশায়
বিদলি' তিমির চিরন্তনীর বিলায়ে আশীষ আলো-শিখায় ।
আমরা যে সাড়া দিই খনে খনে
মিথ্যামলিন কামনা-কুজনে
সাধিয়া আঁধার শুনি না তোমার শঙ্খ, যে ডাকে : "আয় রে আয়" !
তাই কি অশনি মন্দ্রি' জননী জাগালে তন্দ্রালস হিয়ায় ॥

মাটি নও তো মা, তুমি নিরুপমা! চিন্ময় তব প্রতি অণু।
এসেছেন যুগে যুগে তব বুকে নারায়ণ ধরি' নরতনু।
তোমারি তো ডাকে গোলক-মুরলী
কত শত প্রাণ পুলকে উছলি'
শ্যামল-করুণা-কোমল-যমুনা বহালো বৃন্দাবন-লীলায়।
তোমার আকাশে তোমার বাতাসে আজো সে-অমরা স্মৃতি বিছায়॥
কত কবি গুণী যোগী ঋষি মুনি নমি' মা তোমার ধূলিকণা
হয়েছে ধন্য চির বরেণ্য—অলখ উচ্ছ্বাসে উন্মনা।
তোমারি কোলে মা গগন-গঙ্গা
ধায় গেয়ে গান নীল তরঙ্গা
তপনবাহিনী! মরণতারিণী! কৈলাস-শিরে তোমার তায়
কনক-কান্ত ধ্যান-প্রশান্ত যুগ-যুগান্ত বন্দনায়॥
আজি প্রার্থনা: তোমার সাধনা পলতরেও না যেন ভুলি।
ত্যজিয়া স্বার্থ যেন পরার্থ-ব্রতে অন্তর ওঠে দুলি'।
যেন পারি মাগো তোমার প্রসাদে
আপনারে দিতে বিলায়ে দু'হাতে
প্রতি জীবমাঝে যে শিব বিরাজে বরি' তারে তাপিতের সেবায়।
আজ দেখা দিলে স্বরূপে নিখিলে প্রেমের প্রতিমা-মধুরিমায়॥
—শ্রীদিলীপকুমার রায়

কাণ্ডারী হুঁশিয়ার

দুর্গম গিরি, কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার,
লঙ্ঘিতে হ'বে রাত্রি নিশীথে, যাত্রীরা হুঁশিয়ার!
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ,
ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মৎ?
কে আছ জোয়ান, হও আগুয়ান, হাঁকিছে ভবিষ্যৎ।
এ তুফান ভারী, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার॥

তিমির রাত্রি, মাতৃমন্ত্রী সান্ত্রীরা সাবধান!
যুগ-যুগান্ত-সঞ্চিত ব্যথা ঘোষিয়াছে অভিযান।
ফেনাইয়া উঠে বঞ্চিত বুকে পুঞ্জিত অভিমান,
ইহাদেরে পথে নিতে হ'বে সাথে, দিতে হবে অধিকার॥
অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া, জানে না সন্তরণ,
কাণ্ডারী! আজ দেখিব তোমার মাতৃমুক্তি-পণ!
"হিন্দু না ওরা মুসলিম?" ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন?
কাণ্ডারী! বল, "ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র॥"
গিরি-সঙ্কট, ভীরু যাত্রীরা, গুরু গরজায় বাজ,
পশ্চাত-পথ-যাত্রীর মনে সন্দেহ জাগে আজ।
কাণ্ডারী! তুমি ভুলিবে কি পথ? ত্যজিবে কি পথ-মাঝ?
ক'রে হানাহানি, তবু চল টানি, নিয়াছ যে মহাভার॥
কাণ্ডারী! তব সম্মুখে ওই পলাশীর প্রান্তর,
বাঙালীর খুনে লাল হ'ল যেথা ক্লাইভের খঞ্জর!
ঐ গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায় ভারতের দিবাকর!
উদিবে সে রবি আমাদের খুনে রাঙিয়া পুনর্ব্বার॥
ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান,
আসি অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা, দিবে কোন্ বলিদান?
আজি পরীক্ষা, জাতিরে অথবা জাতেরে করিবে ত্রাণ।
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, কাণ্ডারী হুঁশিয়ার!

—নজরুল ইস্‌লাম

জ্বলবে বজ্রানল

এই শিকল-পরা ছল, মোদের এই শিকল-পরা ছল।
এই শিকল পরেই শিকল তোদের করব রে বিকল ॥
তোদের অন্ধ কারায় আসা মোদের বন্দী হতে নয়,
ওরে ক্ষয় করতে আশা মোদের সবার বাঁধন-ভয়।
এই বাঁধন পরেই বাঁধন-ভয়কে করব মোরা জয়
এই শিকল-বাঁধা পা নয় এ শিকল-ভাঙা কল।
তোদের বন্ধ ঘরের বন্ধনীতে করছ বিশ্ব গ্রাস
আর ত্রাস দেখিয়েই করবে ভাবছ বিধির শক্তি হ্রাস;
সেই ভয় দেখানো ভূতের মোরা করব সর্ব্বনাশ,
এবার আনব মাভৈঃ বিজয়-মন্ত্র বলহীনের বল ॥
তোমরা ভয় দেখিয়ে করছ শাসন, জয় দেখিয়ে নয়,
সেই ভয়ের টুঁটিই ধরব টিপে, করব তারে লয়
মোরা আপনি মরে মরার দেশে আনব বরাভয়,
মোরা ফাঁসির পরে আনব হাঁসি মৃত্যু-জয়ের ফল ॥
ওরে ক্রন্দন নয় বন্ধন এই শিকল-ঝঞ্চনা,
সে যে মুক্তিপথের অগ্রদূতের চরণ-বন্দনা।
এই লাঞ্ছিতেরাই অত্যাচারকে হানছে লাঞ্ছনা,
মোদের অস্থি দিয়েই জ্বলবে দেশে আবার বজ্রানল ॥

—নজরুল ইসলাম

পথ

দুর্গম পথের পান্থ, তোমাদের করি নমস্কার,
স্থির লক্ষ্যে চলিয়াছ, কে করিবে পথের বিচার !
যারা রাখে নিজ ঘর
তারা এক-পথচর ;
তাদের পথের 'পর
নামে না বন্ধন-অন্ধকার।
তোমরা তাহারা নও, যেথা শৃঙ্খলিত রও,
সে দেশ স্বদেশ বটে, আসলে তা নিত্য-কারাগার
নতি করি তোমাদের, মুক্ত চিত্ত তোমরা ক'জন,
স্বীকার করনি কভু প্রলুব্ধের পীড়ন বন্ধন।
শঙ্কিত সহস্র প্রাণী
সেই দুঃশাসনে মানি',
তোমরা উদ্ধত পাণি
তাহারেই করিতে শাসন—
ত্যজিয়াছ সর্ব্ব ভয়, হইতেছ মৃত্যুঞ্জয়,
বারবার পরাজয়ে ব্যর্থ যত হয় আয়োজন।
অন্ধকার কারাগারে কে জানে কোথায় সত্য পথ,
বাহির হইতে হবে ভাঙ্গিয়া এ বাধার পর্ব্বত !
রাখিতে জাতির মান
দিবে আত্মবলিদান ;
বিনিময়ে লক্ষ প্রাণ
ফিরে পেতে দাসত্বের খৎ—
যাহারা সক্ষম দিতে, দিতে পারে পারে নিতে
তাহাদের মন্ত্র কভু নহে এক ওম্ তৎ সৎ !

অমূল্য জীবনপাতে ঘুচাইতে মায়ের বন্ধন
বিদেশের মৃত্তিকায় মাতৃমুক্তি-যজ্ঞ আয়োজন
করে থাকো কেহ যদি
তামস-মহিষে বধি'
দাসত্বের কালো নদী
করে থাকো কেহ উত্তরণ—
মোর নমস্কার লহ, মরে থাকো বেঁচে রহ
বিফল হবে না জেনো অসমাপ্ত হলেও তর্পণ।
মন্দিরে মন্দিরা বাজে, বাজে শঙ্খ বাজে করতাল
পথহীন সাধকের সিদ্ধি প্রতীক্ষিছে মহাকাল।
আমরা বিস্ময়ে ভয়ে
দিনগত পাপক্ষয়ে
তোমাদের নাম লয়ে
ছিঁড়িতে চাহি এ মায়াজাল।
তোমরা যেথানে থাকো, লক্ষ্য শুধু স্থির রাখো
কোথা পথ। ভেঙে ফেলো দুর্ভেদ্য এ পাষাণ-জাঙ্গাল

-সজনীকান্ত দাস

দিতে হবে প্রাণ

দুঃসহ লাঞ্ছনা বহি পদাহত শিরে
আর কত কাল তুই বল বাঁচিবিরে,
ভাগ্য-হত বাঙালী সন্তান ? কত কাল
অবনত রাখিবিরে তোর দগ্ধ ভাল ?
ভয়ঙ্কর মৃত্যুমুখে সমর্পিয়া প্রাণ
গাহিল যে সব বীর জীবনের গান

তূর্য্যকণ্ঠে, ছিন্ন করি হৃদয়-কমল
সাজাল রক্তার্ঘ্য যারা, বল, ওরে বল
তোরা কি তাদের কেহ ন'স্? যাহাদের
প্রদীপ্ত মশাল দগ্ধ করি' আঁধারের
কৃষ্ণ যবনিকা, জ্বালিল নূতন আলো,
তারা কি নিবিয়া যাবে? হবে সব কালো!
পদলেহী চাটুকার, ওরে, ওরে মূঢ়
এখনও কি বুঝিস্ নি এ সত্য নিগূঢ়
শক্তির সাধনা ছাড়া নাহি পরিত্রাণ
অন্যায়-কবল হতে? দিতে হবে প্রাণ।
দিতে হবে সেই প্রাণ, বজ্রের ক্ষমতা
নিহিত যাহার মাঝে, যে প্রাণের কথা
হোমাগ্নি শিখার সম: যে প্রাণের বাণী
মৃত্যু-ভীত নপুংসের বক্ষে দিবে আনি
অমৃতের দিব্য বার্ত্তা,—আবাহনে যার
ঘুচে যাবে মলিনতা গ্লানি অন্ধকার
সূর্য্যকরে কুজ্ঝটিকা সম, যে প্রাণের লাগি
স্বয়ং বিবেকানন্দ আছিলেন জাগি
উদ্‌গ্রীব অতন্দ্র হ'য়ে; রবীন্দ্র-বঙ্কিম
যে প্রাণের উদ্‌গাতা সার্থক: যা অসীম
নীল-নভ চিরদীপ্ত অগ্নির অক্ষরে
রাখিয়াছে চিরকাল উদ্ভাসিত ক'রে,
যাহা নিত্য, যাহা সত্য, যার মৃত্যু নাই
আজি মাতৃযজ্ঞে সেই প্রাণ চাই।

—বনফুল

বন্দে মাতরম

ঘন-তমসায় অঘোরে ঘুমায় তামসিক জনগণ,
অসুর-শাসনে পশুর মতন অজ্ঞান অচেতন।
এমন সময় ঘুম ভাঙা ডাক—
শোনা গেল দূরে ; সবে হতবাক,
বাতাসে ও ধ্বনি ওঠে রণি' রণি'—মন্ত্র সে মনোরম,
আধো-ঘুমে আধো-জাগরণে শোনে, "বন্দে মা-ত-রম্ !"
আলসে, বিলাসে, আরামে-বিরামে কেটে যায় দিনরাত,
এখনো নয়নে বিজড়িত ঘুম—ডাকিল কে দৈবাৎ ?
ওগো জাগো জাগো, যে আছ মানুষ,
সুখ-শয্যায় রয়েছ বেহুঁস,—
নিজ দেশে মিছে পরবাসী হ'য়ে হারায়ো না সম্ভ্রম ;—
বন্দিনী মায়ে বন্দনা করো, "বন্দে মা-ত-রম্ !"
মায়ের মুক্তি-মন্ত্রে দীক্ষা নিল সন্তানদল,
নব-গঙ্গার জোয়ার ছুটিল এলো বন্যার জল।
সেই বন্যায় ভেসে চলে সব,
এলো জাগরণ, এলো বিপ্লব,
শাসনের নামে শোষিণে লুটিছে পরদেশী হরদম,
সহিব না আর, বল বারবার, "বন্দে মা-ত-রম্ !"
শিশু বা কিশোর না করিল আর রক্ত আঁখির ভয়,
কত নর-নারী এলো ঘর ছাড়ি' গাহি' জননীর জয়।
আমাদের দেশ মোরা ফিরে চাই ;
শুনিব না আর কোনো ছলনাই,
ছদ্মবেশী ও অভিভাবকের নাহি মানি বিক্রম,
তাড়াব তাদের সাগরের পারে,—"বন্দে মা-ত-রম্ !"
টনক নড়িল বিদেশী প্রভুর হেরিল সর্ব্বনাশ,
পীড়নে পীড়নে তাই ক্ষণে ক্ষণে ভারতে জাগালো ত্রাস।

পূর্ণ হইল কত কারাগার,
দ্বীপান্তরের ভরিল আগার,
হাসি' দিল প্রাণ ফাঁসির মঞ্চে কত পুরুষোত্তম ;
আকাশে-বাতাসে ধ্বনিয়া উঠিল,—"বন্দে মা-ত-রম্ !"
আজি এ ভারত করিতে স্বাধীন সেই সে মন্ত্র-বল,
সেই মহানাদ, সে মহামন্ত্র কে করিবে নিষ্ফল ?
ঋষির ধ্যানের মূর্ত্ত প্রকাশ—
সে মন্ত্র আজ কে ভুলিতে চাস্ ?
শাশ্বত হয়ে রহে যুগে যুগে যাহা 'শিব-সত্যম্' ;
এসো এক সাথে মিলাই কণ্ঠ—"বন্দে মা-ত-রম্ !"

—সুনির্ম্মল বসু

দেশের ডাক

অনেক ঘুমায়েছি জাগিতে হবে !
অনেক সহিয়াছি আর না সহে,
যে পাপে যে গরলে জ্বলিছে দেশ
তাহার শেষ আজ না হলে নহে।
আজিকে সব ভুলে অকুতোভয়ে
মরণে যেতে হবে অথবা জয়ে।
বসিয়া ভাবিবার সময় নাহি আর
যুগ যে কেটে গেল, বেলা যে বহে
রুধিতে হবে আজ পাপের পথ
আপন বুক দিয়া—জীবন দিয়া।
শুধিতে হবে ঋণ ক্ষুধিত দেবতার
অযুত নরমেধ অনুষ্ঠিয়া।

আঁধারে দেছে দেখা নূতন জ্যোতিঃ
পাথরে গেছে দেখা কূলের রেখা।
তরণী চল বেয়ে ত্বরিত গতি—
আজিকে ফিরে যাবে ললাট-রেখা!
আকাশ ঢেকে আসে প্রলয়-মেঘে
সাগর আলোড়িত তুফান-বেগে,
মাথার 'পরে থাকি অশনি উঠে ডাকি,'
তড়িতালোকে সুখে চল রে একা।
যে তারা জ্বলিতেছে নিশায় আজি
সে যদি ঢেকে যায় তিমির-তলে,
নূতন উষা আসি তমসা দিবে নাশি,'
ধরণী যাবে ভাসি' আলোর জলে।
যে উষা আসিতেছে তাহারি আভা
জেগেছে বহু দূর দেউল-চূড়ে,
মানুষ উঠিয়াছে মরণ-জয়ী
হাজার বছরের কবর ফুঁড়ে।
আজিকে ভাঙা চাই সকল বাধা,
অচিরে প্রেমডোরে চাই রে বাঁধা;
চোখের ঠুলি খোলো, শেখানো বুলি ভোলো,
আশা জাগিয়ে তোলো নিখিল জুড়ে।
আজি এ শুভদিনে সবাই এস,
জ্বলিছে হোমানল, ডাকিছে হোতা—
মায়ের তরে প্রাণ কে দিবে বলিদান?
পূজার ফুল কই, আহুতি কোথা?
অভাগা কোটি কোটি তোমার ভাই
ক্ষুধায় রোগে শোকে জর্জ্জরিত,
দু'বেলা ঘরে বসি' কলহ করে,
নেশায় ডুবে ভোলে প্রাণের ক্ষত।

তারা যে পড়িয়াছে বিধির রোষে
সে শুধু তব পাপে তোমার দোষে।
তাদের সে নরকে বাঁচাতে কি কর কে?
তাদের সাথে তব প্রভেদ কত?
মাটির দীপে তার করেছ হেলা
বিদেশী বাতি জ্বালি' অশুভ ক্ষণে;
উঠিবে দিবা যবে সে আলো কিবা হবে?
হারাবে মাঝে হ'তে আপন জনে।
ক্ষুধিত লাঞ্ছিত ভাগ্যহত
বাঁচিয়া আছে মরি যাহারা সবে,
আজিকে পথে পথে তাদের লাগি'
ফিরিতে হবে ডাকি মাভৈঃ রবে।
তোমার শুভবোধ তোমার স্নেহে
চেতনা দাও যত অবশ দেহে।
তাদের ভালো যাহা তোমারে আজি তাহা
যতনে নত শিরে শিখিতে হবে।
ব্যথিত ভগবান্, ব্যথিত ধরা,
পাপের পরিণাম হয়েছে সুরু।
মোদের সেনাপতি আজি অখিলপতি
মোদের গুরু আজ জগদ্গুরু।
যদি না ফিরি আর, নাহিক ক্ষোভ,
যদি না দেখে যাই কাজের শেষ,
কিছুরি 'পরে মোর রবে না দ্বেষ।
আঘাত যদি হয় কঠিন বড়—
মোদের হতে হ'বে কোমলতর,
মরিতে হবে যার—কি আসে যায় তার—
কে তারে দিল গালি, কে দিল ক্লেশ।
যে আশা মিটে নাই মিটিবে না ক',

বাকী যা আছে কাজ, রাখো তা তুলে।
রহি বা নাহি রহি—সকল ব্যথা সহি'
আঘাত দিয়ে যাব পাপের মূলে॥

—শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

আহ্বান

হাতেতে হাত মেলাও,
ভাই ভাই সারা দুনিয়াই আজ,
জোরসে পা চালাও।
পথ কি অনেক দূর,
দুর্গম বন্ধুর?
আলো নাই. থাক, ভয় নাই তবু,
প্রাণের দীপ জ্বালাও।
নূতন যুগের দ্বার
রোধে কে পাহারাদার?
কার লোভ করে প্রভাত আড়াল?
তফাৎ সরে দাঁড়াও।
আকাশ ঘন ঘটায়
মিছেই ভয় দেখায়,
কিছু নাই যার কি হারাবে তার?
কে বা হবে পিছপাও?

—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

বিস্মৃত

হে আত্মবিস্মৃত জাতি, হে ভারতবর্ষের সন্তান,
জানি না, কী অভিশাপে স্বদেশের স্বরূপ ভুলেছ ;
ভুলে গেছ ভারতীয় জীবনের আদর্শ মহান্,
চেতনা বিভ্রান্ত করি বিচ্ছেদের পন্থায় তুলেছ
আপনারে, ধর্ম্মনীতি-রাজনীতি-সমাজনীতির
বিভক্ত-বিভাগ-মাঝে বিরোধের ক্ষুদ্র গণ্ডী গাঁথি'
এ-কি সঙ্কীর্ণতা তব ? এরি মাঝে স্বদেশ প্রীতির
নিশান তুলিতে চাও ? ভুলে গেছ কী-সাধনা-সাধি'
ভারতে মুক্তির মন্ত্র কালে কালে হ'ল উচ্চারিত
অসুর নিধন-যুদ্ধে এ মর্ত্ত্যের বন্ধন খণ্ডিয়া ?
যুগের দুর্যোগ এল, বসুন্ধরা রুধির প্লাবিত !
সে-মন্ত্র এখনো ওঠে ভারতের অন্তর মন্থিয়া,
শোনে না ভারতবাসী, রুদ্ধ নয় নীতির গণ্ডিতে,
বিভক্ত-বিভাগ-মাঝে দগ্ধ হয় বিদ্বেষ-বহ্নিতে ॥

—শ্রীনিশিকান্ত রায়চৌধুরী

হে বন্ধু, হবে জয় !

প্রেমিক তারেই মানি,
নেয় নাকো, শুধু দিয়ে যায় সব,
রিক্ত উভয় পাণি ।
ভাই, তুমি অভিনব,
প্রতিদান তুমি নেবে না, কেবল
দিয়ে যাবে প্রাণ তব

তোমাদের দেওয়া প্রাণে
তোমাদের দেশ প্রাণ পাবে, আর
যুগ পাবে তার মানে।
আর কে বাঁচাবে বলো,
তোমরাই যদি হিসাবীর মতো
বিনিময় বুঝে চলো!
অথবা ঘাতক-রূপে
প্রাণ নিয়ে তার দাম দিতে ভয়ে
ঘুরে মরো চুপে চুপে।
হে বন্ধু, হবে জয়!
দানের যজ্ঞে প্রাণের আহুতি
ব্যর্থ হবার নয়।
জানি নে, কী জানি কবে,
এই শুধু জানি, হবে একদিন,
হবেই, হতেই হবে!

—শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

জয়যাত্রা

যাত্রা তব সুরু হোক্, হে নবীন, কর হানি' দ্বারে
নবযুগ ডাকিছে তোমারে।
তোমার উত্থান মাগি' ভবিষ্যৎ রহে প্রতীক্ষায়,
রুদ্ধ বাতায়ন-পাশে সংক্ষিপ্ত আলোক শিহরায়।
সুপ্তি ত্যজি' বরি' লও তারে, লুপ্ত হোক অপমান,
দেখা দিক্ শাশ্বত কল্যাণ॥
সৃজন-উৎসব আজি, হে নবীন, খুলে দাও দ্বার,
আনো তব নব উপহার।

নিখিল মানব মিলি' বিশ্বপ্রান্তে পাতিয়াছে মেলা—
উদ্বোধনী বাণী তার তুমি আসি' গাহ এই বেলা।
উদার পরাণ মেলি' সবাকার লহ আলিঙ্গন
দৃঢ় হোক্ আত্মার বন্ধন ॥
কাঁদিছে নিখিল বন্দী, হে নবীন, মুক্ত করো তারে,
নিয়ে চলো আলো-অভিসারে।
পৃথিবীর অধিকারে বঞ্চিত যে ভিক্ষুকের দল—
জীবনের বন্যাবেগে তাহাদের করো বিচঞ্চল !
অসত্য অন্যায় যত ডুবে যাক্, সত্যের প্রসাদ
নিয়ে লভো অমৃতের স্বাদ ॥
অজস্র মৃত্যুরে লঙ্ঘি,' হে নবীন, চলো অনায়াসে
মৃত্যুঞ্জয়ী জীবন-উল্লাসে।
আসুক বেদনা, ভীতি, আসুক ব্যর্থতা, পরাজয়—
সর্ব্ব বন্ধ বিস্মরিয়া ধ্বনি' তোলো অসীমের জয়—
কণ্ঠে ধরি' বিধাতার জ্বালামাখা রক্ত মালাগাছি,
বলো "মাভৈঃ, আমি আসিয়াছি।"

—আব্দুল কাদির

মাতৃভূমি

সুজলা সুফলা মাটির উপরে বহু যুগ-সঞ্চিত
পরাধীনতার আবর্জ্জনা গ্লানি
আজ ভেঙে পড়ে, দেখো জাগে ঐ আলোহাওয়া-বঞ্চিত
মাটিতে তৃণের নবীন আশার বাণী।
জেগে ওঠে দেশ পূর্ব্বাচলের দীপ্ত সূর্য্যালোকে
ছুটে আসে কোটি শিশু-যুবা নরনারী ;
জাতীয় পতাকা উড়ায় সকলে নিজগৃহচূড়া হতে—
পরম লগ্ন—ছাব্বিশে জানুয়ারি !

তারপর এলো ৯ই আগষ্ট বুকের রক্তে রাঙা,
মরণের ভয় দূরে গেল চিরতরে ;
শত বরষের জীর্ণ শিকল এত দিনে হ'ল ভাঙা
জেগে ওঠে দেশ আপনার নির্ভরে।
আজাদী সেনার অমর কীর্ত্তি রচে নব ইতিহাস—
শহরের পথে বিজয়ী কিশোর বীর
ছিন্ন করেছে নবীন ভারতে পরাধীনতার ফাঁস,
ভারতমাতার মুছায়েছে আঁখিনীর।
বন্দি তোমারে আজিকে জননী, হে মোর মাতৃভূমি,
রক্ত-কমল দিনু পদে উপহার ;
জীবন-মরণে নিবিড় পুলকে ও-পদযুগল চুমি—
বরাভয়-করে জাগো দেবী আর বার।

—শ্রীপ্রভাত বসু

সবার সেরা আমার দেশ

আমার দেশের ধূলো নিয়ে
হেলাফেলা সইব না (সইব না),
নিন্দা তা'কে করলে ত কেউ
নীরব হয়ে রইব না (রইব না)।
এই যে মাটি, এই যে আলো,
সেই ত প্রাণের গান শিখাল,
তা'র অপমান চোরের মতো
নত শিরে বইব না (বইব না)॥
দেশ যে আমার সবার সেরা
জেনেছি তা অনেক দিন (অনেক দিন),
নটরাজের নাচের সভায়
সেই ত কেবল বাজায় বীণ (বাজায় বীণ) !

সে অধিকার কা'র বা আছে ?
পিণাকপাণির জীবন-নাচে
সঙ্গিনী যে, নিন্দা তা'কে
করলে ত কেউ সইব না (সইব না) ॥
আমার দেশ ত আমারি নয়—
আমার এ দেশ দেশ সবার (দেশ সবার),
মাতৃমন্ত্রী সবাই আনে
অর্ঘ্য নানান্ দেউলে তার (দেউলে তার) ।
সবার সেরা মুকুট শিরে
আমার এ দেশ তুচ্ছ কিরে ?
হিমাদ্রি যার শিরোভূষণ
স্তুতি কি তা'র গাইব না (গাইব না) ॥
আঁচলে তা'র সাগর বাঁধা—
প্রাণ-মাতানো পাগোল ঢেউ (পাগোল ঢেউ),
বুকে জ্বলে নানান মাণিক
এর তুলনা পায় কি কেউ (পায় কি কেউ) ?
বিশ্বপ্রেমের সুর এখানে,
শান্তি জানে—ক্ষান্তি আনে—
সবার সেরা আমার দেশের
অবহেলা সইব না (সইব না) ॥

—শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার বিশ্বাস

আত্মবিলাপ

এ দেশের দুখে কার না সরে চোখের জল
নিদ্রায় নিঝুম তবু আমরা সকল।
উঠ জাগ সকলেতে, সজীব কর ভারতে,
ভাই ভাই মিলে সব হও এক দল।
ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই, কত কাল রবে,
বিনা মিলে কোন কাজ হয় কি সফল?

—নবগোপাল মিত্র

মাতৃপূজা

ওই দেখ আজ জ্বলছে কেমন মায়ের মুখখানি
মূর্ত্তি বরাভয়করা দাঁড়িয়ে সিংহবাহিনী।
কর সফল জনম,
গেয়ে 'বন্দে মাতরম্' ;
মায়ের সেবা কর নিজ ধরম করম,
হৃদয়-বনের রক্তজবা,
মায়ের ঐ চরণে দে আনি।
(সব সন্তানে মিলি)
এই জাহ্নবী-তটে
নব আনন্দমঠে,
দশভুজার কর পূজা এ দুঃখ সঙ্কটে,
ওই শোন আজ মায়ের মুখে—
"মাভৈঃ মাভৈঃ" অভয়বাণী।
ওগো বঙ্গললনা!
কর মাতৃসাধনা ;
মঙ্গল-দীপ হাতে লয়ে কর নীরাজনা,

মায়ের ঘরের শাঁখা-শাড়ী
তোমরা পরলে সাজবে রাজরাণী,
(মায়ের মোটা সাজেতে)
তোমরা সাজবে যেন রাজরাণী !
কর মায়ের জয়গান,
সব হিন্দু-মুসলমান,
রুদ্রবলে কর সদা হৃদয় বলীয়ান,
রক্ত আঁখি রক্ত শাসন,
বাঁধন ঘাতন না মানি,
(চলো মায়ের কাজে যাই !)
ওদের বাঁধন ঘাতন না মানি !

—প্রমথনাথ দত্ত

কে আলো জ্বালিবে ?

আঁধার ভারতে আলো কে আর জ্বালিবে রে ?
আলোকিতে ছিল যারা, একে একে গেছে তারা,
ত্যজি যায় সুখতারা, যেমন প্রভাতে রে।
বিদেশী চাতক আসি, পিয়িতেছে জল রে।
দুখে ভারতজননী, করিছে রোদনধ্বনি
হারাইল মণিফণী, যেমন বিষাদ রে।
আর কি চকোর হাসি, পিয়িবে রে সুখরাশি,
পূরবে ভারতশশী যেমন উদিলে রে।
ভারত-বিহগগণ, গাবে কি মধুর গান,
তারা পূরবে যেমন, গাইত উল্লাসে রে।
সে সুখের দিন হায়, আসিবে কি পুনরায়,
পলাবে কি দুরালয়, ভারতের মসী রে।
আঁধার ভারতে আলো কে আর জ্বালিবে রে ॥

—অবিনাশচন্দ্র মিত্র

নীতি

নীতির বন্ধন করো না লঙ্ঘন, রাজশক্তি সার প্রজার রঞ্জন।
হইয়ে রক্ষক হয়ো না ভক্ষক, অবিচারে রাজ্য থাকে না কখন।
করেছ কলুষে এ রাজ্য অর্জ্জন, কলুষ কল্মাষে করো না শাসন,
অবাধে হবে না দুর্ব্বল দমন, দুর্ব্বলেরি বল নিত্য নিরঞ্জন।
ধ্বংস কংসাসুর—যদুবংশ দল, চন্দ্র-সূর্য্য বংশ গেছে রসাতল,
গৌরববিহীন পাঠান মোগল, হয় পাপপথে সবারি পতন।
কাল জলধিতে জলবিম্ব প্রায়, উঠে কত শক্তি কত মিশে যায়,
তোমরা কি ছিলে উঠেছ কোথায়, আবার পতনে লাগে কত ক্ষণ।

—হেমচন্দ্র সেন

আমাদের দেশ

(মহারাজ প্রতাপাদিত্যের রাজত্বকালে শঙ্কর নামে এক ব্রাহ্মণযুবক হিন্দু সাম্রাজ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠাকল্পে নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া লোককে উত্তেজিত করিতেন। সেই প্রবাদ অবলম্বনে নিম্নলিখিত কবিতাটি লিখিত হইল)

অভাগা মোদের দেশে * এখনও পূরবাকাশে
ওঠে ওই রবি হেসে সোনার বরণ,
না সাধিয়া নিজ কাজ, কখন কি দিনরাজ
আপন আবাসে ফিরি করিছে গমন।
এখন প্রভাত বায়, সমভাবে বয়ে যায়
পরশিয়া একি তন্ত্রী হৃদয়-বীণার।
বিহঙ্গের গানগুলি একি পুরাতন বুলি
কানের মাঝারে গিয়ে দেয় গো ঝঙ্কার।
আজিও নদীর জল চল্ চল্ ছল্ ছল্
সাগর উদ্দেশ্যে ওই করিছে প্রয়াণ।

অসীম সাগরবারি এখন এ দেশে ঘিরি
উত্তাল উন্মত্ত ভাবে করিছে গর্জ্জন।
এখনও অদ্রিরাজ ভুলে নাই নিজ কাজ
ভারতের শিরে ঐ আছে দাঁড়াইয়া,
ভারতের সুখদুঃখ সহিয়াছে ওই বুক
এখন তাহার হৃদি যায় নি ভাঙ্গিয়া।
কত শত বজ্রাঘাত ভাব হেয় পদাঘাত
সহিয়াছে ওই বুকে অম্লান বদনে,
যবনের পদভরে যায় নি ভারত ছেড়ে
কালের অতল গর্ভে নিজ নিকেতনে।
দেখাতে পার কি তুমি, ভারতে সূচ্যগ্র ভূমি
নাই যার অতীতের পুরাতন কথা ;
আমাদের এই দেশ, যদিও মলিন বেশ,
তবু এক অতীতের ইন্দ্রজালে গাথা।
এমন অতীত যার কেন এই দশা তার
অবোধ মানব আমি পাই না খুঁজিয়া।
আর্য্যের সন্তান যারা পরপদানত তারা
অভাগা এ দেশ কেন গেল না ডুবিয়া।
কবে কোন্ দিন হায় গুণে কি গো বলা যায়
আমাদের পোড়া দেশ হয়েছে পতিত,
জান কি তাদের নাম যাহারা ভারত নাম
করিয়াছে নভোতলে লাঞ্ছিত ঘৃণিত ?
কলঙ্কিনী কেন মাতা জন্মদাতা কে বা পিতা
জান কি তাহার নাম কাতরে শুধাই ;
ভারতের শত্রু তারা পেটে ধরেছিল যারা
হতভাগা সৃষ্টিছাড়া কুপুত্র বালাই।
কখন একী শিরায় আর্য্যরক্ত বয়ে যায়
আর্য্যের স্বাধীনতা আজিকে কোথায় ?

জগতের জাতিগুলি আর্য্যের সন্তান বলি
এখনও কি পদতলে মস্তক নোয়ায় ?
জানি না কেমনে হায় আর্য্যজাতি ঘুম যায়
দাসত্ব-অঙ্কুশ যবে রয়েছে বিঁধিয়া,
একটু সরম নাই একটু বেদনা নাই
মরার অধিক হার রয়েছে পড়িয়া।
ক্ষুদ্র ওই কত জাতি জাতীয় উল্লাসে মাতি
ধরাতলে নিজ শত্রু করিছে সংহার ;
তাহাদের আছে ঘৃণা আছে স্বাধীনতা জানা
প্রিয় এই দাসবৃত্তি অসহ্য তাহার।
অগণিত শত্রু সনে যুঝে বিশ ত্রিশ জনে
তাহাদের নাহি ভয় করিবারে রণ,
হয় স্বাধীনতা রবে নয় মৃত্যুমুখে যাবে
এমনি কঠিন স্থির প্রতিজ্ঞা ভীষণ।
তোমরা ত নহ দুটি হবে বিশ ত্রিশ কোটি
কেন গো নিশ্চিন্ত তবু রয়েছ বসিয়া।
ক্ষুদ্র ও বিদেশী দল বল যার শুধু ছিল
হুঙ্কারের আগে যারা করে পলায়ন।
তারে কেন এত ভয় তার কিগো সাধ্য হয়
সোনার ভারতে রাখে নিজ বলে আঁটি,
একবার চোখ মেলি দাও দেখি করতালি
তাহাদের লৌহ অঙ্গ হয় কিনা মাটি।
হায় রে পতিত জাতি তাহাতেও নাহি মতি
ষাট কোটি বাহু দিয়ে কি কাজ সাধিবে,
কাটি মাংসপিণ্ডগুলি দাও না সাগরে ফেলি
সাগর কলঙ্ক-চিহ্ন লুকাতে পারিবে।
আর শুন প্রেতজাতি সাহসে কুলায় যদি
বিষপানে অস্ত্রাঘাতে সম্ভবে যেমনে,

মৃত্যুর কোমল কোলে নীরবে যাওগো চলে
দাসত্বের চেয়ে সেও শ্রেষ্ঠ শত গুণে।
সে নয় তোদের কর্ম্ম সেও বীরের ধর্ম্ম
তা যদি পারিবে তবে আছিল কি ভয় ;
তা হলে আবার আর্য্য জগতে হইত পূজ্য
ভারতে আবার হত সুদিন উদয়।

—উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

ডাক ভগবান

এ ঘোর দুর্দ্দিনে জাগ সর্ব্ব জনে জাতীয় জীবনে হবে সুখোদয়।
একতা বন্ধনে ডাক নারায়ণে প্রাণে প্রাণে প্রাণে হও রে তন্ময় ॥
কত কাল আর অলসে অবশে, রহিবে ভারত মজিয়া কুরসে।
পড়ে নাকি মনে ভারত-গগনে সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি অন্তপ্রায় ॥
যাহা ছিল ভাই ধর্ম্ম-কর্ম্ম-জ্ঞান, হারাবি কি তোরা হয়ে হতজ্ঞান,
রহিবি কি তোরা হয়ে হতমান, রয়ে যাবে কিরে পাপেরই প্রশ্রয় ॥
অস্ত্রহীন রণে জীবনেরই পণে জাগিলে জগৎ জাগিলে জীবনে।
কার সাধ্য আর রাখে শুভক্ষণে, আসিবে আসিবে আসিবে সময় ॥
হয়েছি একদিন যাইবে জীবন, একদিন হয় জীবনে মরণ।
যে ভাবে মরিব যেখানে যখন, নিয়তি টানিয়া সেইখানে লয় ॥
বিশ্বাসী না হলে কে পায় বিশ্বাসে অবিশ্বাসী তাই নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে,
ভুলে আছি মোরা কুহক আশ্বাসে বিশ্বাসে পাইবে অবিশ্বাসে নয়।
সুধা বলে ভাই হিন্দু-মুসলমান, জাগরিত হও মিলি এক প্রাণ,
ডাক রে কাতরে খোদা ভগবান্ যে ভাবে যে পার হও রে তন্ময় ॥

—সুধা দেব

বাসনা

কঠোর কর্ত্তব্য ভাই ! করেছ সাধনা,
নৈলে মাতৃপূজা ভাই ! হবে না হবে না।
মাতৃপূজা মহাযাগ, দেবগণ পান ভাগ,
চাই ভক্তি-অনুরাগ—নহেক কল্পনা।
এই যজ্ঞে কর মন ! আত্মবলিদানে পণ,
পাবে বল অনুক্ষণ বিপত্তি আর রবে না।
প্রাতঃ-সন্ধ্যা তুই বেলা, কর পূজা জপমালা,
ঘুচিবে সকল জ্বালা, মনের বেদনা।
সুখশয্যা পরিহরি কণ্টকে কুসুম হেরি',
এস ভাই ! ত্বরা করি' বিলম্ব আর ক'রো না,
বঙ্গের সৌভাগ্য-রবি, অদূরে সুন্দর ছবি,
পুলকিত করে বঙ্গে, দেখ না দেখ না।
ফেলে দাও বীণাযন্ত্র, অন্য যত তন্ত্রমন্ত্র,
গভীর বিষাণ নাদে কর রে উদ্দীপনা।
বীর সাজে সাজ ভাই, কর্ত্তব্য করিতে চাই,
দেশের উদ্ধার চাই, মনের বাসনা।

—ভুবনমোহন বসু

জাগ জননী

জাগ রে জাগ ভাই-ভগ্নীগণ,
আর থেকো না ঘুমে হ'য়ে অচেতন
গেল সব গেল, ভ্রাতৃবিচ্ছেদ হ'ল,
সাজে আর কিরে ঘুমান এমন ॥

স্বাধীনতা যারে বলে সভ্যজনে,
সে স্বাধীনের আশা না করি স্বপনে,
এই মাত্র চাই, দেশের জিনিষ খাই,
দেশের বস্ত্রে লজ্জা করি নিবারণ ॥
সময় থাকিতে সময় এসেছে,
সময় থাকিতে বাংলা জেগেছে,
সমগ্র ভারত আছে তার পিছে,
এ সুযোগ ভাইরে ছাড়ে কি কখন ?
প্রতিজ্ঞা করেছ রাখিবে কেমনে,
এ ভাবনা যেন সদা থাকে মনে,
কৌপীন পরিব, মুনিবৃত্তি লব,
মুখের কথা কাজে (তবু) করিব সাধন
লক্ষ ধনী দেশে, আছে ধনবল,
ছিল না কেবল হৃদয়ের বল,
সে বল এসেছে, আলস্য ঘুচেছে,
স্বকার্য্য এখন কর রে সাধন ॥
এ সুযোগ যদি না ছাড় সকলে,
ছেয়ে যাবে দেশ কাপড়-সূতার কলে,
তাঁতি জোলার সব, ঘুচ্‌বে হাহারব,
দেশের দুর্গতি হবে রে মোচন ॥
জাগ মা জননি, জাগ রে ভগিনি,
জাগ গো গৃহিণি, শকতি-রূপিণি,
তোমরা জাগিলে, তোমাদেরই বলে,
যা করেছি পণ, করিব সাধন ॥
শক্তিরূপে তুমি আছ গৃহে জায়া,
মন-প্রাণ এক ভিন্নমাত্র কায়া,
তব শক্তি পেলে আমরা সকলে,
কিনা বল পারি করিতে সাধন ?

ছেলেরা খেপেছে, মা-রা যদি খেপে,
উল, চুড়ি ছাড়া সহজে সম্ভবে,
মাঞ্চেষ্টার-বসন, লিভারপুল-লবণ,
বাজারে তা'হলে রবে কত ক্ষণ ?

—অঘোরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মাতৃপূজা

আর আমরা পরের মাকে, মা বলে ডাকব না।
জয় জননী জন্মভূমি তোমার চরণ ছাড়ব না॥
ফিরব না আর দ্বারে দ্বারে ভাসব না আর নয়ন নীরে ;
কি সুধা তোর হৃদয়-ক্ষীরে জীবনে মা ভুলব না।
কি করুণা কি মহিমা কি অতুল মধুরিমা ;
সুজলা সুফলা শ্যামা এমন মা আর পাব না॥

— ভূষণ দাস (মাতৃপূজা)

জাগো মা আমার

না হইতে মাগো বোধন তোমার ভেঙেছে রাক্ষস মঙ্গলঘট,
জাগো রণচণ্ডি ! জাগো মা আমার ! আবার পূজিব চরণতট।
অগুরু-চন্দন ধূলায় ধূসর ভূমিতে লুটায় চামর-চাঁচর
মঙ্গলশিখা গিয়াছে নিভিয়া হল না বুঝি মা পূজন তোমার ?
ভেঙেছে রাক্ষস মঙ্গলঘট।
ঐ গঙ্গাজল রয়েছে পড়িয়া জবা-বিল্বদল গেল শুকাইয়া,
পূজার সময় যায় যে বহিয়া—জাগো মা আমার ! সময় নিকট
দৈত্যতেজ নাহি করি পরাভব বিজয়-শঙ্খ কেন মা নীরব ?

হুঙ্কারে বিনাশ প্রচণ্ড দানব, অট্ট অট্ট হাসে হাস মা বিকট।
এস রণচণ্ডি ! এস রণসাজে, এস মা, নাচিয়া সন্তানের মাঝে ;
মহাশক্তি হৃদে করিয়া প্রচার, শিখাও জননি ! সমর উৎকট।
নরমুণ্ড ছিঁড়ে পরাইব গলে, সর্ব্বাঙ্গেতে তোমায় সাজাব কঙ্কালে
রক্তাম্বুধি আজ করিয়া মন্থন তুলিয়া আনিব 'স্বাধীনতা' ধন।
জাগো রণচণ্ডি ! জাগো মা আমার পূজিব আবার চরণতট ॥

—ক্ষীরোদ গঙ্গোপাধ্যায়

দেশসেবা

বেলা গেল রে, ডুব্‌লো তপন, নিশার আঁধার, এলো ছেয়ে যে গগন।
আয় তোরা আয়, ঐ শোনা যায়, দেশের বিলাপ করুণ রোদন ॥
উঠিছে ভেদি, সুদূর গগন, (তার) ক্ষোভ, অপমান,
সে দারুণ, ভীষণ ॥
শত অশ্রুধার, বয় দেহে তার, জীর্ণা, শীর্ণা কায়, বিবর্ণা বসন ॥
শত শত যুগ, হয়ে রে বিরূপ, ভুলেছিস্ তোরা দেশের সেবা ॥
তার রূপ ধ্যান, তার মন্ত্র-জ্ঞান, তার মূর্ত্তি গড়ি তার চরণ পূজা ॥
সে দুঃখে হায়, (তার) বিদরে হৃদয়, তনয়ের কুমতি প্রাণে কি সয় ?
স্নেহবারি ঢালি, ধন-ধান্যে পালি, প্রাণের সে তনয়
(যদি) অনাদরে মায় ॥
বৃথা রে জনম, বৃথা রে করম, ধন পরিজন বৃথা আসা এ ধরায়।
মিছে গৃহ, ধর্ম্ম, ব্যর্থ দান, পুণ্য জনমি দেশের কোলে।
যদি না পূজিলি দেশমাতায় ॥

—অক্ষয়কুমার রায়

নূতনের ডাক

আজি নূতন প্রাণে নূতন টানে চালাও তরণী।
মোদের "মরা গাঙে বান এসেছে"—চল্‌ছে উজান পানি।
সাগর-পারের তুফান দেখে আর কি মোরা ডরি?
বল পেয়েছি মায়ের নামে, কসে চালাও তরী,
বম্ বম, বম্, ঝম্ ঝমাঝম্ কাঁপায়ে মেদিনী।
"বন্দে মাতরম্" বলে, জোরে মার টান,
আপদ বালাই ঠেলে তরী ছুটিবে উজান,
এখন চিনেছি পথ—গেছে বিপদ, কুল দেবে জননী।

—গোবিন্দচন্দ্র দে

সাধের মরণ*

এক বীণা গাহিছে কি গান! আকাশ ছাপায়ে দেছে তান,
এ গান শুনিতে হায়! লক্ষ তারা কেন চায়!
শিহরি উঠিছে কেন এ নির্জীব প্রাণ?
জননী জনম-ভূমি! শুনিছ কি গান তুমি,
যে গীতি ঢালিছে তব স্নেহের সন্তান?
ওই শুন—
মরণের বায়ু বয়ে যায়, কে তোরা মরিতে যাবি আয়!
ওই দেখ! ঘরে ঘরে—কত কে কাঁদিয়া মরে,
অনেক কাঁদিছে ওরা অসহ্য জ্বালায়
নীরবে কাঁদিবে যারা, বিজনে কাঁদুক তারা,
আয়! কে ডুবিতে যাবি সাগর-তলায়?

* 'সাধের মরণ', 'স্মরণে', 'বঙ্গজননী', 'অয়ি বঙ্গজননি' ও 'ভারতের প্রতি'—এই পাঁচটি কবিতা বহু পরে প্রাপ্ত হওয়ায় জন্ম-তারিখ অনুসারে ঐগুলি প্রদত্ত হইল না।

মরিবার সাধ কার আছে?
মায়ের নয়ন জল, ভাই-বোন হতবল
খেতে না পাইয়া শিশু ভূমে পড়ি আছে;
মুখেতে তুলিতে গ্রাস মরমে জনমে ত্রাস,
আগে তো মরিব আমি তোরা আয় পাছে!

-মানকুমারী বসু

স্মরণে

কর দেখি অতীত স্মরণ, তোমাদেরি অধীন মরণ,
'সপ্তসিন্ধুময়ী ধরা' ছিল যার কীর্ত্তি ভরা
সেই পুণ্য আদিকুলে তোদের জনম!
আজি রে মরণ তরে, কত জন কেঁপে মরে,
সেই মৃত্যু ছিল তাঁর প্রিয় আভরণ!
ওই দেখ! জীবন-বেলায়
এ ক্ষুদ্র বালুকা-কণা এ স্রোতে কি ডুবিবে না
রাখিবি এ পরমায়ু বেঁধে কি ভেলায়?
জানে না অবোধ হায়! তবুও ফিরিতে চায়।
কি জানি কিসের নেশা এতই ভুলায়!

—মানকুমারী বসু

বঙ্গজননী

আমার জন্মভূমি, অভাগিনী মাগো !
আর ঘুমায়োনা তুমি, জাগো স্নেহে জাগো !
শত কবি গান গায় অর্ঘ্য দেয় তব পায়
আজন্ম দিতেছি ভরি অঞ্জলি অঞ্জলি
সেই স্তব-স্তুতি বিফল সকলি ?
দুঃখিনী জননী, ওগো বিষাদ-প্রতিমা,
ভাসাবে কি অশ্রুজলে তোমার মহিমা ?
চারিদিকে শুন সব আনন্দ উৎসাহ-রব,
তুমি একা বসে আছ, ধূলি বিমলিনা,
হে আমার জন্মভূমি, অভাগিনী দীনা।
হে আমার জন্মভূমি পতিতা, তাপিতা
মুখে তব অন্ন নাই, বুকে জ্বলে চিতা
ঘরে ঘরে, মা তোমার, ওঠে শুধু হাহাকার
তুমি হাসিতেছ বসি, চির উদাসীনা।
তাই মা, তোমার লাগি বাজে না এ বীণা !
তাই ত ধিক্কার উঠে হৃদয় মাঝার,
মা যাহারে ছেড়ে আছে মিছে গর্ব্ব তার !
তাই ছিন্ন হীনবল তোমার সন্তানদল
নাই শক্তি ভক্তি, নাই মান-অপমান,
আছে শুধু সভ্যতার লক্ষ কোটি ভাণ !

—সুরমাসুন্দরী ঘোষ

অয়ি বঙ্গজননী

চিরশোভাময়ী স্নেহময়ী তুমি অয়ি বঙ্গজননী !
সুখদে, শুভদে, সারদে, বরদে ! অকূল বিপদে তারিণী !
ভাণ্ডার আজি কেন মা শূন্য, অন্নপূর্ণা ! বিতর অন্ন
দিয়ে গো স্তন্য ঘুচাও দৈন্য, ধন্য পুণ্যশালিনী !
পীযূষপ্রবাহ ধরিয়া বক্ষে ক্ষুধিত জীবন কর মা রক্ষে,
নহ ত ভিখারী, রাজরাজেশ্বরী সন্তানে সুখপালিনী !
ক্ষুধিত তৃষিত পতিত এ দীনে অভয়-শান্তি-দায়িনী !

—উমাপ্রমোদিনী বসু

ভারতের প্রতি

ও মা ! রত্নগর্ভে ! ভারত-জননী, বীর প্রসবিনী স্বরূপ কও।
প্রভাত শশাঙ্ক-সম প্রভাহীনা, হইয়া এখন কেন মা রও ?
বীরের জননী বলিয়া তখন, আদর করিয়া ডাকিত সবে।
তার পরিবর্ত্তে এবে দাস-মাতা এ দুঃখ কেমনে পরাণে সবে।
দীন, হীন, ক্ষীণ, অসংখ্য অসংখ্য এখন তোমার তনয় যত।
দাসের পশরা, বহিয়া মস্তকে, করিছে দুর্ল্লভ জীবন গত।
তাঁর প্রিয় কার্য্য সাধিতে যতনে, শিখাও তোমার সন্তানগণে।
তব পদে পদে তরিবে বিপদে পাবে স্বাধীনতা হারাণ ধনে।

—বিরাজমোহিনী দাসী

মাতৃ-বিলাপ

আমি, দিবস-রজনী, হ'য়ে বিষাদিনী,
নয়ন আসারে যেতেছি ভাসিয়ে।
আমি, ছিন্ন অঙ্গ হ'য়ে, রুধিরের ধারে,
ভাসিতেছি কেহ দেখে না ত চেয়ে॥
আমি, জ্ঞানের আলোকে, সদা আলোকিত,
অসংখ্য সন্তান-জননী হইয়ে।
আমি, ভিখারিণী বেশে, সর্ব্বস্ব হারায়ে,
পরের চরণে রয়েছি লুটায়ে॥
আমি, নিজ-বক্ষ চিরি, তার রক্তধারে,
জীবের জীবন শস্য জনমিয়ে।
আমি, বরষে বরষে, দুরভিক্ষ হত
সুতশোকে কাঁদি আকুল হইয়ে॥
আমি, হাসি হাসি মুখে, পরহাতে তুলি,
দিতেছি কাঞ্চন কাচ বিনিময়ে।
আমি, বিপদ সলিলে, ভেসে ভেসে ভেসে,
অবশেষে বুঝি যাইগো ডুবিয়ে॥
আমি, সুধাধারা ভ্রমে, গরলের রাশি,
পান করি শেষে মরি গো জ্বলিয়ে।
আমি, নির্ম্মল-সলিলা, স্রোতস্বিনী ছাড়ি,
মরীচিকা পানে যেতেছি ধাইয়ে॥
ওরে, অবোধ সন্তান, জননীর পানে,
জ্ঞান-আঁখি মেলি' দেখ রে চাহিয়ে।
তোরা, সকলে মিলিয়ে, এক প্রাণ হ'য়ে
জননীর অশ্রু দেরে মুছাইয়ে॥

—গোপালচরণ (?)

উপনয়ন

আজি তব ভগ্ন দেবালয়ে হোমানল
ভাল করি জ্বাল, ওগো তাপস মহান্ !
বাজাও তোমার শঙ্খ, বাজাও বিষাণ,
তার স্বরে কর উচ্চারণ অনর্গল
বীজমন্ত্র তব। এসেছি আমরা আজ
ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, বাল-বৃদ্ধ. যুবা-নারী
তব ভক্তদল ;—দাও দীক্ষা, দাও সাজ
বৈরাগ্যের পবিত্র গৈরিক, ব্রহ্মচারী
আজি হ'তে মোরা ; লভি নবজীবনের
দ্বিজত্ব নবীন ! শূদ্র বিপ্রে স্ত্রীপুরুষে,
দাও কণ্ঠে যজ্ঞ-উপবীত সকলের
নির্ব্বিচারে। আজি এই মঙ্গল প্রত্যূষে
তব যজ্ঞকুণ্ড হ'তে যজ্ঞানল লয়ে
গৃহে ফিরি যাই সবে অগ্নিহোত্রী হ'য়ে !

স্থ—

ভারতভূমি*

(এই কবিতাটি এক চতুর্দ্দশ বর্ষীয় বালকের রচিত বলিয়া আমরা গ্রহণ করিয়াছি। কোন কোন স্থানে অল্পমাত্র সংশোধন করিয়াছি এবং কোন কোন অংশ পরিত্যাগ করিয়াছি। বং সম্পাদক)

মনে করি একদিন আমাদের তরে
সৃজিয়াছিলেন ধাতা, ভুবনে ভারতমাতা
প্রাণভয়ে দিনু তাঁরে, যবনের করে।
ডুবিল হিন্দুর নাম কলঙ্ক-সাগরে ॥

* বঙ্গদর্শন, দ্বিতীয় বর্ষ, নবম সংখ্যা (১২৮০ বঙ্গাব্দ) হইতে উদ্ধৃত।

পড়িলেক ইরম্মদ কালমেঘ হতে।
ভাঙ্গিয়া ভারতমুণ্ড, জ্বলি এ অনলকুণ্ড,
দহিল মায়ের দেহ, অতুল্য জগতে।
অস্থি ভস্ম ভিন্ন আছে কি আর ভারতে ॥
সেই দিন উদিলেক ম্লান শশধর।
সেই দিন নিশীথিনী, জ্যোৎসাসত্ত্বে তমস্বিনী,
সেই দিন হতে দুখে ভাসয়ে অন্তর।
সেই দিন ছারখার ভারত সুন্দর ॥
কত দিবা অস্তে যায়, কত রাত্র আসে,
এ রাত্র কি না পোহাবে, এমনি রহিয়া যাবে,
হবে না কি সূর্য্যোদয় ভারত-আকাশে ?
অন্ধকার রহিবে কি ভারত-আবাসে ?
কি লাগিয়ে রত্নভূমি দুখের আগার ?
জাগো ভারতস্থ জন, মিথ্যা ঘুমে অচেতন,
আলস্য-মূর্খতা দোষে দিবসে আঁধার।
জ্ঞানেতে করিয়া বল সত্য কর সার।
সম্মুখেতে দেখ সবে অত্যুচ্চ ভূধর,
যাহার শিখরদেশ, চক্ষে নাহি পড়ে লেশ,
উহাতে উঠিতে যত্ন করে যত নর।
বহু যত্ন সাধ্য হয় ঐ গিরিবর।
কেহ বা উঠিয়ে শৃঙ্গে হতেছে পতন।
তুঙ্গ শৃঙ্গ পানে চায়, আবার উঠিতে ধায়,
আবার শিখরদেশে, করে আরোহণ।
ভারতবাসীরা কেন না করে তেমন ॥
একবার উঠেছিলে এ শিখর শিরে।
আজি কেন বসি তলে ? হুঙ্কারি উঠহ বলে,
গাইয়ে ভারত জয়, আরোহ গিরিরে।
বাখানিবে এ ভুবনে নব হিন্দু বীরে ॥

ঐ শুন মৃদু মন্দ হয় বংশীধ্বনি।
পর্ব্বত শিখরোপর, বলে "হে ভারত নর
গিরির উপরে সবে আইস এখনি।"
ঐ শুন পর্ব্বতেতে হয় বংশীধ্বনি॥
শুন বংশী প্রতিধ্বনি গভীর কন্দরে;
শুন প্রস্রবণ ঝরে, কল কল নাদ করে,
"চক্ষু মেল" বলি ডাকে ভারতের নরে।
ঐ শুন কল্লোলিয়া প্রস্রবণ ঝরে॥
তথাপি ভারতবাসী ঘুমে অচেতন?
কাদম্বিনী ডাকে ঘন, ঘন ডাকে গিরিগণ,
ঘন ঘন ঘন ডাকে বংশীর নিস্বন।
জন্মমত ভারত কি ঘুমাবে এখন?

স্বদেশের প্রতি*

হে মোর স্বদেশ!
খুলিয়া দিয়াছ আজ আমাদের কল্যাণসম্পদ;
তোমার কুটিরদ্বারে হেরিতেছি জ্যোতির্ম্ময় রথ;
মিলিয়াছে বহু যাত্রী আত্মবলে পুষ্ট বলীয়ান,
সুখের হিতের শত উপায়নে পরিপূর্ণ প্রাণ;
তাঁদের নিশ্বাসে আজ দিগন্তে উড়িয়া গেছে
বাঙ্গালীর ধূলিময় বহু জীর্ণ বেশ!
নমি তোমা, হে বরেণ্য, হে মোর স্বদেশ!

---

* গঙ্গাচরণ দাশগুপ্ত রচিত। ১৩১২ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যা, 'ভারতী' পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত।

যুগান্ত পবনে

দিগন্তে করাল মেঘ বিস্তারিছে অন্ধকার ছায়া ;
সংখ্যাতীত প্রেতযোনি প্রসারিছে শত ভীতি মায়া ;
চমকে দামিনীদীপ্তি শিহরিছে হৃদয় তরাসে,
উলঙ্গ কৃপাণ লয়ে ছিন্নমস্তা নাচিছে আকাশে ;
এ দুর্দ্দিনে হে স্বদেশ ! মঙ্গল ইঙ্গিতে তব,
যুগান্তের ভস্ম হ'তে কুটির অঙ্গনে,
হোমাগ্নি উঠেছে জ্বলি যুগান্ত পবনে !

আজ বাঙ্গালার

সাত কোটি হৃদয়ের স্নেহ প্রেম শতাব্দী-সঞ্চিত,
এক ধ্রুব কেন্দ্রমুখে ছুটিতেছে ক্ষুব্ধ তরঙ্গিত ;—
প্রতি বঙ্গগৃহে বসি' অপ্রমত্ত নরনারীগণ,
হইতেছে আত্মদীপ, আত্মাশ্রয়া, অনন্য শরণ ,—
ঘাতকের কর হ'তে স্খলিত হয়েছে যেই
শত ঘৃণ্যতম স্বার্থে শাণিত কুঠার,
দেবতানির্ম্মাল্য তাহা আজ বাঙ্গালার !

জাগরণ গান

ফেনহাস্যে উঠিতেছে কোটিমুখে প্রশান্ত সাগরে,
সদ্যোজাগরণরক্ত এসিয়ার নয়নের পরে
ভাসিতেছে লক্ষ আশা, কল্যাণের অগণিত ব্রত,
দীপ্তিমান হইতেছে লুপ্তপ্রায় শত মুক্তি-পথ ;
দূর পূর্ব্বাকাশতীরে উষালোকে ধীরে ধীরে
খুলিয়াছে জীবনের আদর্শ মহান্,
তাই আজি কোটি কণ্ঠে জাগরণ গান !

ওগো পৌরজন !

ভয় নাই—ভয় নাই—বিধাতার দুর্জ্জেয় বিধানে,
ভেঙ্গেছে মোদের ঘুম, দৈববাণী জাগিয়াছে প্রাণে ;
আজি হ'তে যার যাহা মুষ্টিমেয় রয়েছে সম্বল,

সবিনয়ে প্রাণপণে জননীরে দাও দূর্ব্বাদল ;
প্রাণদীপে আজি হ'তে রাখ উজলিয়া সবে
চির সৌম্যা জননীর গৃহের প্রাঙ্গণ,
ভয় নাই—ভয় নাই—ওগো পৌরজন !
আসিয়াছে বল ;
পূর্ব্বাকাশ রশ্মিপথে এ উষায় দেবকন্যাগণ,
চকিতে মোদের নেত্রে লেপিয়াছে নির্ম্মল অঞ্জন ;
আজ হেরিতেছি তাই—চারিদিকে, অন্তরে বাহিরে,
রাজার প্রাসাদশিরে দরিদ্রের বিজন কুটিরে,
অন্নপূর্ণা জননীর অভয় মঙ্গলরাশি
ধনধান্যে পরিপূর্ণ—প্রাঙ্গণ শ্যামল ;
প্রাণে প্রাণে তাই এত আসিয়াছে বল !
জননী আমার !
তব শিবতারা মূর্ত্তি প্রাণে প্রাণে উঠিয়াছে জাগি ;
কাঁদিছে কাঁদিছে আজি পুত্রকন্যা তব স্তন্য লাগি ;
তোমারি কুটিরদ্বারে ফিরিয়াছে সন্তান সকল,
হে মোর তাপসী দেবি ! বিছাইয়া শ্যামল অঞ্চল
মোদের লইয়া বুকে, প্রাণের ধমনী শত
পূর্ণ কর, পুষ্ট কর দিয়ে স্তন্যধার ;
হে অভয়া, হে শঙ্করি ! জননী আমার !
আজি হ'তে প্রাণপদ্ম তব পদে দিনু পুষ্পাঞ্জলি ;
তুমিই জননী ধাত্রী কাম্যপথে তুমিই সকলি।

স্বাধীনতা

সোনার ভারত আজ যবনাধিকারে।
ভারত-সন্তানবক্ষঃ ভাসে অশ্রুনীরে।
জ্ঞানরত্নাদির খনি, সভ্যতার শিরোমণি,
আজি সেই পুণ্যভূমি, ডোবে গভীর আঁধারে।
যার ধমনীপ্রবাহে, আর্য্যের শোণিত বহে,
সে কি রে কখন সহে, এ ভীষণ অত্যাচারে ?
সে বংশে যে জন্মে থাক, জাতির সম্মান রাখ,
যবনের রক্তে আঁক, আর্য্যকীর্ত্তি চরাচরে।
পুরুষেরা অস্ত্র ধর, যুদ্ধে যেয়ে মেরে মর,
অনলে প্রবেশ কর, যত রমণীনিকরে।
ভারত শ্মশান হোক্, মরু হয়ে পড়ে রোক
তবু অধীনতা বেড়ি, রেখ নারে পায়ে ধরে।

—বীরবতী নাটক

দেশমাতা

দেখিলাম এক নারী নগেন্দ্র-কন্দরে বসি।
রাহু ভয়ে শশী যেন, ভূতলে পড়িছে খসি।
আলুলায়িত কেশা, ছিন্নভিন্ন মলিন বেশা।
আহা মরি কি দুর্দ্দশা, স্বর্ণবর্ণ যেন মসী।
বলে ধনী হা বিধাত ! হয়ে ভারত বীরেন্দ্র
মাতা, বিজাতি বিপক্ষ হাতে হইলাম লাঞ্ছিত ;
(হায়) পুত্র হয়ে মাতৃদুঃখ কেন না নাশিছে আসি।
অতঃপর জানিলাম, তিনি সাধারণের জননী ;
ভারত-স্বাধীনতা ধনী, অশ্রুমুখী দিবানিশি।

—ভারত-যবন নাটক

আহ্বান

আসি ভারতভূমে, একবার দেখে যাও আর্য্যগণ,
কোথা ব্যাস-বশিষ্ঠ-বাল্মীকি আদি জনক-সনক-সনাতন।
বুক ফাটে কি বলিব আর, ভারত-ভূমি চেনা ভার,
নাই আচার, নাই অধিকার, আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন।
পাপেতে পূরেছে রাজ্য, লোপ হয়েছে বৈধকার্য্য,
হারাইয়ে বলবীর্য্য, হলো দাসত্ব অবলম্বন।
ছিল যে গৌরব কত, সকলি হইল গত,
কীর্ত্তি হত, বৃত্তি হত, এবে হত হয় জীবন।
ধন-ধান্য রত্নভার, সব যায় সিন্ধুপার,
উঠিয়াছে হাহাকার কেহ না করে শ্রবণ।
রেখে গিয়াছিলে যেই, শাস্ত্ররূপ শস্ত্র এই,
আজও রক্ষা পায় সেই কোনরূপে ধর্ম্মধন।
ভ্রাতৃভাব আর নাই দেশে, দগ্ধ হয় দেখ দ্বেষে দ্বেষে,
আর একবার সদুপদেশে কর সব দুঃখ মোচন।

—হিন্দুমেলা (১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে গীত)

স্বদেশ-ব্রত

হে বঙ্গজননি, স্বর্ণ-প্রসবিনী,
আর মাগো তুমি কেঁদো না কেঁদো না।
ভাই ভাই মিলে, আমরা সকলে,
শিখেছি দেখাতে সমবেদনা।
কাঞ্চনে ফেলিয়ে, কাচে গের দিয়ে,
পাইয়ে অশেষ অন্তর-যাতনা।
মাগো তোর তরে, আজি ঘরে ঘরে,
শিখেছে সবাই করিতে ভাবনা।

বিলাতি বসনে, বিলাতি ভূষণে,
বিলাতি পোষাকে আর সাজিব না।
বিলাতি আহার, বিলাতি আচার,
ত্যজিতে করিব নীরব সাধনা।

—কলিকাতার ছাত্র-সমাজ (১৯০৬ খৃষ্টাব্দে গীত)

প্রতিজ্ঞা

সবে আয় রে আয়, জীবন উৎসর্গ করি মায়ের সেবায়।
হল বঙ্গ লণ্ডভণ্ড, তাকে কেটে করলে তুই খণ্ড,
থাকবো মোরা একই খণ্ড, সোনার বাঙ্গলায়।
আয় রে যাই ঘরে ঘরে, বলি রে মিনতি করে,
জাগ রে ভাই সত্বরে, সময় বয়ে যায়।
পরব না আর বিলাতী কাপড, মায়ের দ্রব্যে করব আদর,
পরব মোটা ধুতি-চাদর, দিবেন যাহা মায়।
কর্‌ব দেশে বাণিজ্য বিস্তার, ঘুচিবে দুর্দ্দশা এবার,
হবে পূর্ণ ধনভাণ্ডার, সন্দেহ কি তায়।
আয় রে করি স্বার্থ বলিদান, হইবে এ দেশের কল্যাণ,
চাহিয়ে দেখ ঐ জাপান, যে আছ যথায়।
স্বদেশের উন্নতি তবে, থাক রে আত্মনির্ভরে
কাজ নাই আর ভিক্ষা করে, অপমান ভিক্ষায়।
নিজের ভাল পরের কাছে চায়, সে এ-কূল ও-কূল দুকূল হারায়,
তাহার দুর্গতি না যায়, মরে দুরাশায়।
কর্‌ব ধন্য মানব-জীবন, পূজা করি মায়ের চরণ,
হবে না কখন মরণ, বিদিত ধরায়।
আয় রে বন্দে মাতরম্ বলে, মায়ের নাম গাই সকলে,
বলা হব নব বলে, সিদ্ধ সাধনায়।

—য্যান্টিপার্টিশন প্রোসেসন পার্টি (১৯০৭ খৃষ্টাব্দে গীত

স্বভাব

ধরেছে যে রোগে কত কাল ভুগে
যাবে কত যুগে কে জানে কেমনে।
স্বাধীনতা-ধন অমূল্য রতন নাহি চাহে আজ বঙ্গবাসিগণে।
ব্যবসা-বাণিজ্যে দিয়ে বিসর্জ্জন
চাকরি করিতে সদা আকিঞ্চন
পরের পাতুকা করিতে বহন সদা ব্যস্ত মন শয়নে স্বপনে।
আমাদের দেশে আসিয়া ইংরাজ
বাণিজ্যের গুণে রাজা তারা আজ
আমরা করে মরি কেরাণীর কাজ মহাজন তারা আমাদেরি ধনে ॥
অসভ্য পাঠান মেওয়া বেচে খায়
ঘাটে মাঠে থাকে গাছের তলায়
কেবা জানে তারা খায় কি না খায় (তবু)
নাহি যায় কভু চাকরির স্থানে ॥

—বালী স্বদেশ সমিতি (১৯০৭ খৃষ্টাব্দে গীত)

মাতৃপূজা

গুরুগম্ভীর রণ ঝন ঝন বাজিছেরে ঘন রণভেরী,
ভাঙ্গিব মোহের মূলে আছে 'কারার' লৌহ কবাট সাজিব
আজিকে নাশিতে অরি।
অরুণ কিরণে উঠিবে ঝলসি সন্তান-করে খর তরবার,
হব আগুয়ান তুচ্ছ করিয়া কুটিল ভ্রূকুটি ভীম করকার ॥
বজ্রবিজয়ী কণ্ঠে বলিব "বন্দে মাতরম্" বাণী,
গাহিব উচ্চে জয় মুরারি, জয় মা জগত-জননী ॥

ছুটিব দলিয়া সমর-সাগর চূর্ণ করিয়া হিমানী শির,
বিদীর্ণ করিয়া নীল নভো বুক, উড়াব পতাকা করেছি স্থির।
না হয় ঘুমাব অসি উপাধানে রক্ত রঙ্গীন সে রণক্ষেত্রে।
মরিয়া অমর হইব আমরা হেরিবে বিশ্ব মুগ্ধ নেত্রে॥
বলিয়া "বন্দে মাতরম্" আর মায়ের চরণ স্মরিয়া
ঝাঁপায়ে পড়িব রণ-সমুদ্রে জয় মুরারি গাহিয়া॥
সন্তান মোরা জননী মোদের দনুজদলনী দশভুজা।
সাধনা মোদের হৃদয় রক্ত ঢালিয়া করিব মা'র পূজা॥
রুদ্রের তালে নাচিব আমরা তাথিয়া, তাথিয়া, থিয়া, থিয়া,
বীর পদভরে কাঁপিবে বসুধা জয় হুঙ্কারে শত্রু হিয়া॥
দুন্দুভি নাদে এ রণ-বারতা বিঘোষিত আজি জগতময়
শিহরি উঠিবে মুগ্ধ জগত, গাহিবে পুলকে মায়েরি জয়॥
জয়, জয়, জয়, জয়; জয়, জয়, জয়, জয়; জয়, জয়, জয়, জয়॥*

মন্ত্রসাধন

"বন্দে মাতরম্" মন্ত্র গ্রহণে শ্মশান-সাধনে চল চল চল!
পিশাচ-তাণ্ডবে ভ্রূকুটি-ভৈরবে যায় প্রাণ যাবে, হবে না বিফল।
ভূত-প্রেত-দানা দিবে নানা হানা ভারত-শ্মশানে কঠোর সাধনা,
শুনি হিলি কিলি, যাদুকর বুলি দিলে আঁখি খুলি যাবে রসাতল।
রহ শবাসনে ভারত-শ্মশানে নিযত নির্ভয়ে শ্যামার ধেয়ানে;
পাবে যুগে যুগে দাস-দশা ভুগে রাজরাজেশ্বরী-চরণ-কমল।

—যুগান্তর দল

* স্ত্রী-ভূমিকাবর্জ্জিত "সন্তান" নাটক হইতে ইহা উদ্ধৃত। এই নাটকখানি ১৯২৪ কি ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে বরিশাল জেলার বানারিপাড়া গ্রামে জাতীয় বিদ্যালয়ে শারদোৎসব উপলক্ষে অভিনীত হয়।

নব ভারতের বারতা

জাগে নব ভারতের জনতা !
এক জাতি এক প্রাণ একতা ॥
একই স্বপনে পাওয়া নূতন পথে,
এক সুখে দুখে ধাওয়া নূতন রথে,
আসে নব ভারতের আত্মার সারথি এ কংগ্রেস,
নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে আলোড়িয়া শত প্রাণ শত দেশ,
মুক্তির একতারে বাজে সেই বারতা ।
এক জাতি এক প্রাণ একতা ॥
আমার চলার পথে বাঁশি দিল যে,
আমার আঁধার ঘরে বাতি দিল যে,
ভূভারত অধিরাজ চিনিয়াছি তোমারে যে কংগ্রেস,
নিজেরেও চিনিয়াছি, ঘুচাইলে মনোমাঝে মোহাবেশ,
ধনী দীন মাঝে তুমি আনিয়াছ সমতা ।
এক জাতি এক প্রাণ একতা ॥
তুমি স্তবধ্বনি শত দেব দেউলের,
শুভ্র মমতা তুমি তাজমহলের,
মহাভারতের তুমি নব হিমালয়,
গঙ্গার ধারা তুমি কলগীতিময়,
জাগ্রত জনগণ গৌরবে জানিয়াছে সে কথা,
এক জাতি এক প্রাণ একতা ॥
হিন্দু-মুসলমান-অস্থির বজ্র এ কংগ্রেস,
নব যুগ সাধিকার চিত্তের শঙ্খ এ কংগ্রেস,
শঙ্কা ও শৃঙ্খল অন্তরে ভাঙিল যে কংগ্রেস,
নব সুরে নব রঙে কোটি প্রাণ রাঙিল যে কংগ্রেস,
চেতনার স্পন্দনে ভাঙিয়াছে জড়তা,
এক জাতি এক প্রাণ একতা ॥

—অভ্যুদয়

করিব অথবা মরিব

বন্ধন-ভয় তুচ্ছ করেছি উচ্চে তুলেছি মাথা,
আর কেহ নয় জেনেছি মোরাই মোদের পরিত্রাতা
করিব অথবা মরিব—এ পণ
ভরিয়া তুলেছে ভারত-ভুবন,
স্বপ্নের মাঝে শুনিতেছি যেন স্বাধীন-ভারতগাথা।
জয় জয় জয়, ভারতের জয়, জয়তু ভারতমাতা ॥
শুনিতেছ না কি শৃঙ্খল ওই ভাঙিতেছে খান খান,
মুক্তি-কেতন উড়িছে আকাশে তারি বন্দনা-গান,
করিব অথবা মরিব—এ পণ
ভরিয়া তুলেছে ভারত-ভুবন,
লক্ষ প্রাণের বলি বেদীমূলে নূতন আসন পাতা
জয় জয় জয়, ভারতের জয়, জয়তু ভারতমাতা ॥
বন্দে মাতরম. বন্দে মাতরম্, বন্দে মাতরম্।

—অভ্যুদয

শহীদ তর্পণ

তাহাদের রেখ স্মরণে
যারা নিঃশেষে, প্রাণ দিল হেসে,
অমর যাহারা মরণে।
এ মাটির প্রতি ধূলি-কণিকায়—
লিখে রেখে গেল শোণিত-লিখায়-
মুক্তির বাণী যারা ;

হে ভারতবাসী ভুল না তাদের
অমৃত-পুত্র তারা।
তাহাদের স্মৃতি, মনে রেখ নিতি
প্রণাম জানায়ো চরণে ॥
তোমাদের লাগি আপনি তাহারা—
নিয়েছে দুঃখব্রত
হে ভারতবাসী, কৃতজ্ঞতায়
কর আজ মাথা নত।
জীবনে তাদের কর নাই দান—
কোন ফুলমালা, কোন সম্মান,
মরণের পারে শান্তি তাদের
মাগিও অভয় স্মরণে ॥

—জাতীয় শিল্পী পরিষদ্

দেবতা

চরণে চরণে কণ্টক যারা গেল দলি,—
আহা তারা কি দেবতা সকল দুঃখাতীত,
মরণের পথে হাসিমুখে যারা গেল চলি'—
আহা তারা কি দেবতা শঙ্কারোহিত চিত!
দুর্যোগ-ঘন সঙ্কটময় দিনে—
তিমির আঁধারে পথ নিল তারা চিনে,
দুঃখের মাঝে জ্বালিল আশার শিখা—
আহা তারা কি দেবতা যুগ যুগ নন্দিত!
সংশয়-ভয় তুচ্ছ তাদের কাছে,
মুক্তির লাগি' বন্ধন যারা যাচে,
যাদের পরশে পুণ্য পাষাণ-কারা—
আহা তারা কি দেবতা চির-মহিমান্বিত ॥

—জাতীয় শিল্পী পরিষদ্

আত্মদান

নিশান রাখ উঁচু, তাতে যায় যদি যাক্ প্রাণ ;
পেতেই হবে মুক্তি দেশের, রাখতে হবে মান।
সুবর্ণ ভূমি আঁধার আজিকে শ্মশান বহ্নিধূমে--
চল্লিশ কোটি প্রাণ কি রহিবে অচেতন মোহ-ঘুমে ?
ছুটে আয়, ওরে কে আছ কোথায়, এসেছে যে আহ্বান—
দিতে হবে প্রাণ, দিতে হবে প্রাণ, দিতে হবে আজ প্রাণ।
ভয় কিরে তোর, ভাবনা কেন, শঙ্কা কিসের ওরে ?
বাজাও জয়শঙ্খ ওরে বাজাও আজি জোরে ; উচ্চে গাহ গান—
যায় যদি যাক্ প্রাণ, যাক্ প্রাণ, যাক্ প্রাণ।
পথ জানা নাই, নাই থাক্ তবু চল্‌তে হবে আগে,
ছেড়ে যাবে যারা, ছেড়ে যাক্, তবু থাক্ তোরা পুরোভাগে ;
সামনের বাধা ভেঙে ফেল, কর তারে খান্ খান্,
যায় যদি যাক্ প্রাণ, যায় যদি যাক্ প্রাণ, যায় যদি যাক্ প্রাণ॥

— জাতীয় শিল্পী পরিষদ্

সংগ্রামের আহ্বান

এসেছে ডাক, বেজেছে শাঁখ,
কে যাবি আয় আয় ;
বেলা যে বহে' যায়।
কোর' না দেরী কোর' না দেরী,
শোন' নি কানে ভেরী ;
ডেকেছে গুরু, খেলা যে সুরু—
বাহির আঙিনায়॥

আয় রে তোরা কে দিবি প্রাণ,
কে আজ সব করিবি দান ;
মায়ের লাজ, ঘুচাবি আজ--
সতেজ দৃপ্ততায় ॥

—জাতীয় শিল্পী পরিষদ্

মায়েরে চিনেছি

আপন মায়েরে চিনেছি এবার,
লভেছি বিরাম স্থান জুড়াবার.
"মা" বলে ডাকিতে হৃদয়ের দ্বার
চকিতে গিয়াছে খুলিয়া ;
দূরে গেছে ভয় ভাবনা-দীনতা,
ঘুচে গেছে লাজ দারুণ হীনতা,
প্রাণের আবেগে দেহের ক্ষীণতা
গিয়াছি সকলে ভুলিয়া।
আপনার দেশে, আপনার ঘরে,
পরবাসী হ'য়ে সঙ্কোচের ভরে,
ছিনু এত কাল মরমেতে ম'রে
সুদিন এবার এসেছে ;
ভেদাভেদ আজ ভুলেছি সকলে,
জুটিয়াছি সবে দলে দলে দলে—
অচেনা ভা'য়েরে সবে ভাই ব'লে
প্রাণে প্রাণে ভাল বেসেছে
লভেছি জনম কোন্ মহাকুলে,
এত কাল মোরা গিয়াছিনু ভুলে,
উৎসাহে উল্লাসে তাই মাথা তুলে
দাঁড়াতে ছিল না শকতি ;

এক সূত্রে আজি বাঁধা শত প্রাণ,
শত বলে মোরা আজি বলীয়ান্,
হৃদয়ের তেজে স্ফুরিত নয়ান
"মা" নামে গভীর ভকতি।
পরের গরবে গর্ব্বিত যে যত,
ছিল এত দিন, তা'রি মাথা তত,
লাজে অপমানে আজি অবনত
সন্তাপে হৃদয় দহিছে ;
উদ্দীপিত প্রাণ দৃঢ় প্রতিজ্ঞায়,
চিনেছি সে আজ আপনার মায়,
সঁপিয়া হৃদয় জননীর পায়
অত্যাচার শত সহিছে।
ভস্মাকার যত তুষের আগুন,
ধক্ ধক্ আজ জ্বলিছে দ্বিগুণ,
যাতুকর যেন করিয়াছে গুণ
প্রাণে প্রাণে এক করিয়া।
কেটে গেছে মোহ, নাহি অবসাদ,
গগনে ধ্বনিছে শুভ-শঙ্খনাদ,
শতধারে আজি দেব-আশীর্ব্বাদ
মস্তকে পড়িছে ঝরিয়া!

—অজ্ঞাত

বিদায় দাও মা

একবার বিদায় দাও মা ঘুরে আসি
হাসি হাসি পরবো ফাঁসি
দেখবে ভারতবাসী ॥
ওমা, কলের বোমা তৈরী করে,
দাঁড়িয়েছিলাম লাইনের ধারে
মাগো, বড়লাটকে মারতে গিয়া
মারলাম ভারতবাসী ॥
শনিবার দিন দু'টোর সময়,
হাইকোর্টে মা লোক ধরে না,
মাগো, জজ-ম্যাজিস্ট্রেট বিচার করলো,
হুকুম হলো ফাঁসি ॥
মঙ্গলবার দিন ভোরবেলাতে
ফাঁসি কাষ্ঠে তুলে দিবে।
মাগো, অভিরামের দ্বীপ চালান মা
ক্ষুদিরামের ফাঁসি।
দশ মাস দশ দিন পরে
তোর ক্ষুদিরাম আসবে ফিরে,
চিনতে যদি না পারিস্ মা,
দেখ্‌বি গলায় ফাঁসি ॥
কাচের বাসন কাচের চুড়ি
পরো না মা বিলাতী শাড়ী,
ওমা, মনের দুঃখ মনেই রইল
হ'ল না আমার স্বদেশী ॥

—অজ্ঞাত

প্রভাত-ফেরী

গৃহে গৃহে আজি দীপমালা জ্বালো
নিশান উড়ালে হাঁক দিয়ে বল,
মুক্তি চাই, মুক্তি চাই, মুক্তি ভিন্ন লক্ষ্য নাই,
জয় গাহ আজি দেশমাতার
জয় গাহ আজি স্বাধীনতার
জ্বালাও মুক্তি কামনার আলো
হৃদয়ে জ্বালাও সুর দিয়ে বল,
কাম্য মোদের স্বাধীনতাই
জোর করে বল আপোষ নাই, আপোষ নাই
কাম্য মোদের স্বাধীনতাই
মৃত্যুপণ জীবনপণ হয় বিজয় নয় মরণ
দিগ্ দিগন্তে ঝড়-তুফানে অন্ধ আঁধার ঘনায় ঐ
বল মাভৈঃ বল মাভৈঃ হে সৈনিক, নিশান কৈ।

—অজ্ঞাত

To India—My Native Land*

My country ! in thy day of glory past
A beauteous halo circled round thy brow,
And worshipped as a deity thou wast,
Where is thy glory, where that reverence now ?
Thy eagle pinion is chained down at last,
And grovelling in the lowly dust art thou :
Thy minstrel hath no wreath to weave for thee
Save the sad story of thy misery !
Well—let me dive into the depths of the time,
And bring from out the ages that have rolled
A few small fragments of those wrecks sublime,
Which human eye may never more behold ;
And let the guerdon of my labour be
My fallen country ! one kind wish from thee !

1827 *Henry Louis Vivian Derozio.*

From
"Poems of Henry Louis Vivian Derozio"—
by F. B. Bradley-Birt.
London—1923.

---

*"স্বদেশ" নামে এই কবিতাটির বঙ্গানুবাদ ৩১ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইয়াছে

আকর গ্রন্থ

গ্রন্থের নাম		কবি ও সঙ্কলয়িতা	প্রকাশ-কাল খৃষ্টাব্দ	প্রকাশনের স্থান
জাতীয় সঙ্গীত	...	দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়	১৮৭৬	ক্যানিং লাইব্রেরী ৫৫ কলেজ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।
ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী	...	নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়	১৮৮৫	৪২, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।
স্বরলিপি গীতিকা	...	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৮৯৭	জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ী, কলিকাতা।
শতগান	...	সরলা দেবী	১৯০০	২৬, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলিকাতা।
সঙ্গীতসার সংগ্রহ	...	হরিমোহন মুখোপাধ্যায়	১৯০১	বঙ্গবাসী কার্য্যালয়, কলিকাতা।
বাংলার গান	...	উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী	১৯০৫	গ্রন্থাগার, কলিকাতা।
জাতীয় রাখী সঙ্গীত	...	নব্যভারত সমিতি	১৯০৫	১৪/৪, জেলিয়াটোলা ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।
বন্দে মাতরম্	...	যোগীন্দ্রনাথ সরকার	১৯০৬	সিটি বুক সোসাইটি, ৬৪/৪ কলেজ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।
বাঙ্গালীর গান	...	দুর্গাদাস লাহিড়ী	১৯০৬	হিতবাদী কার্য্যালয়, কলিকাতা।
জাতীয় সঙ্গীত	...	উপেন্দ্রনাথ দাস	১৯০৬	য়্যান্টি সার্কুলার সোসাইটি, ৪/১ কলেজ স্কোয়ার, [কলি।
স্বদেশগাথা	...	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	১৯০৬	ঢাকা।
সোনার বাংলা	...	সান্ন্যাল এ্যাণ্ড কোং	১৯০৬	২৫, রায়বাগান ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।
মাতৃগাথা (১ম ভাগ)	..	হেমচন্দ্র সেন	১৯০	৬, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।
স্বদেশী সঙ্গীত	...	নরেন্দ্রকুমার শীল	১৯০৭	১১১, আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।
স্বদেশ সঙ্গীত (৩য় সংস্করণ)	...	যোগেন্দ্রনাথ শর্ম্মা	১৯০৭	১৬৩, কালীঘাট রোড, কলিকাতা।
বন্দনা	...	নলিনীরঞ্জন সরকার	১৯০৮	৩৬/৬, বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।
স্বদেশের ধূলি (আদিপর্ব্ব)	...	পরেশচন্দ্র চৌধুরী	১৯১৯	কলিকাতা।
আবাহন	...	বিজয়লক্ষ্মী দেবী	১৯২০	কুড়িগ্রাম, রংপুর।

গ্রন্থের নাম		কবি ও সঙ্কলয়িতা	প্রকাশ-কাল খৃষ্টাব্দ	প্রকাশনের স্থান
স্বদেশী সঙ্গীত	…	বিপিনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	১৯২১	ভোলা, বরিশাল।
স্বরাজ সঙ্গীত	…	সুখা দেব	১৯২১	নওগাঁ, আসাম।
উপেন্দ্র সঙ্গীত	…	উপেন্দ্রমোহন ঘোষাল	১৯২১	তাজপুর, বিক্রমপুর, ঢাকা।
জাতীয় সঙ্গীত	…	সরোজিনী দেবী	১৯২১	পোনাবালিয়া, বরিশাল।
জাতীয় সঙ্গীত	…	বেণুপ্রভা দেবী	১৯২২	রমনা, ঢাকা।
জাতীয় সঙ্গীত	…	বিজয়কুমার চক্রবর্ত্তী	১৯২৩	মডেল লাইব্রেরী, ৭৬ কলেজ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।
মুক্তিবাণী	…	অমরেশ কাঞ্জিলাল	১৯২৩	৯০/১ এ, বহুবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।
জাতীয় সঙ্গীত	…	অক্ষয়কুমার রায়	১৯৩৮	ষ্ট্যাণ্ডার্ড বুক সোসাইটি, ৬৯ হ্যারিসন রোড, কলিঃ।
স্বদেশী কবিতা	…	শ্রীপ্রভাত বসু	১৯৪০	ওরিয়েণ্ট বুক কোঃ, ৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট্, কলিঃ।
মুক্তির গান	…	শ্রীসতীশচন্দ্র সামন্ত	১৯৪০	ঐ
জাতীয় শিল্পী পরিষদ	…	শ্রীঅরুণ সরকার	১৯৪২	—
অভ্যুদয়	…	কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ	১৯৪৬	২৫/২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা।
স্বদেশ সঙ্গীত	…	শ্রীমুরারি দে	১৯৪৯	২১, হলধর বর্দ্ধন লেন, কলিকাতা।
মাতৃমন্ত্র	…	শ্রীকালীচরণ ঘোষ	১৯৬৩	৮সি. রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা-৯।

জাতীয় সঙ্গীতের নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি ইণ্ডিয়া লাইব্রেরীতে আছে ; কিন্তু উহা দেখিবার সুযোগ আমার হয় নাই—

জাতীয় গাথা	.	জগদীশচন্দ্র সেনগুপ্ত	১৯০৬	ঢাকা
জাতীয় সঙ্গীত	.	—	১৯০৭	ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ত্রিপুরা।
স্বদেশ গাথা	..	বিহারীলাল রায়	১৯০৯	কলিকাতা।
জাতীয় দীক্ষা	…	যোগেন্দ্রনাথ দে	১৯২৪	কলিকাতা।

কবি-পরিচয়

অঘোরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—২৪ পরগণা জেলার বারাসাত মহকুমার অন্তর্গত খোড়াগাছি গ্রামে জন্ম। ইনি ১২৮৩ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে 'ইন্দুমতী' নামে একখানি নাটক কবিরাজ শ্রীকালিদাস রায়ের নামে উৎসর্গ করেন। ইনি বহু স্বদেশী সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। তাঁহার অপর দুইখানি মুদ্রিত পুস্তকের নাম 'অশ্রুমালা' ও 'কংগ্রেস'।

অতুলপ্রসাদ সেন—ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণায় ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে জন্ম ও ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের ২৭শে আগষ্ট মৃত্যু। পিতা ডাঃ রামপ্রসাদ সেন। ইনি ঢাকা ও কলিকাতায় পাঠ শেষ করিয়া ইংলণ্ড গমন করিয়া ব্যারিষ্টার হইয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। পরে কলিকাতায় কয়েক বৎসর ব্যারিষ্টারী করিবার পর ইনি লক্ষ্ণৌ গমন করেন। তথায় তিনি শ্রেষ্ঠ ব্যবহারজীবিরূপে পরিগণিত হন। তিনি যুক্তপ্রদেশের লিবারেল দলের নেতা ছিলেন। তিনি ইংলণ্ড হইতে দেশে ফিরিয়া গীত রচনা আরম্ভ করেন। প্রথম প্রথম তিনি প্রেমগীতি রচনা করিতেন। পরে স্বদেশাত্মক গান রচনা করিয়া তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেন। ইঁহার রচিত কতকগুলি গান অতি বিখ্যাত। বহু দিন ইনি প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের মুখপত্র 'উত্তরা' পত্রিকার সম্পাদনা ও পরিচালনা করিয়াছেন। উত্তর জীবনে ইনি সঙ্গীতজ্ঞরূপে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। 'গীতিকুঞ্জ', 'কাকলি', 'কয়েকটি গান' ইত্যাদি পুস্তক তাঁহার রচিত।

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়—উড়িষ্যার অন্তর্গত ঢেন্‌কানল রাজ্যে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ্চ জন্ম। তিনি ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি. এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত আই. সি. এস পরীক্ষায় প্রথম হইয়া অন্যান্য বিষয় শিক্ষার জন্য ইংলণ্ড গমন করেন। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে জেলা জজ নিযুক্ত হন। ইহার পর ইনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিচার বিভাগের সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া শান্তিনিকেতনে বাস করিতেছেন। 'পথে প্রবাসে', 'সত্যাসত্য', 'বিনুর বই', 'ইসারা', 'আগুন নিয়ে খেলা', 'জীবনশিল্পী', 'রাঙা ধানের খৈ', 'উড়কি ধানের মুড়কি' প্রভৃতি তাঁহার শ্রেষ্ঠ পুস্তক।

অমৃতলাল বসু—১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের ১৭ই এপ্রিল রামনবমীর দিন কলিকাতায় জন্ম ও ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ২রা জুলাই মৃত্যু। পিতা কৈলাসচন্দ্র বসু। কম্বুলিয়াটোলার বঙ্গ বিদ্যালয়ে তাঁহার প্রথম শিক্ষা আরম্ভ হয়। পরে তিনি ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ১৬ বৎসর বয়সে কলিকাতার জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনষ্টিটিউট হইতে এনট্রান্স পাশ করিয়া লোকনাথ মৈত্রের নিকট হোমিওপ্যাথি পড়িতে আরম্ভ করেন। ডাক্তারী পড়িবার পূর্ব্বে কিছুকাল তিনি শ্যামবাজার এ. ভি. স্কুলে শিক্ষকতাও করেন। অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী নাট্যজীবনে তাঁহার গুরু ছিলেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর তিনি ন্যাশানাল থিয়েটারে যোগদান করেন। পরে 'গ্রেট্ ন্যাশানাল', 'বেঙ্গল', 'ষ্টার', 'মিনার্ভা' প্রভৃতি থিয়েটারের সহিত তিনি বিশেষ জড়িত হন। তিনি ব্যঙ্গ কবিতা ও নাট্য-রচনায় নিপুণ ছিলেন। কিছুকাল তিনি পুলিশ বিভাগেও চাকরী করেন। পরে উহা পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় নাট্যজগতে ফিরিয়া আসেন। তাঁহার রচিত প্রথম নাটকের নাম 'হীরকচূর্ণ'। স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়া বহু গান রচনা করেন। হাস্যরসাত্মক রচনার জন্য তিনি 'রসরাজ' উপাধি পান। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে 'জগত্তারিণী' স্বর্ণপদক দান করেন। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতিও নির্ব্বাচিত হন। তাহার রচিত বহু নাটক ও প্রহসনের মধ্যে কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য—'বিজয়বসন্ত', 'হরিশ্চন্দ্র', 'বিবাহ-বিভ্রাট', 'খাস-দখল', 'অবতার', 'তরুবালা', 'যাজ্ঞসেনী', 'ব্যাপিকা বিদায়' প্রভৃতি।

অরবিন্দ ঘোষ—১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট কলিকাতায় জন্ম এবং ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের ৫ই নভেম্বর মৃত্যু। পিতা ডাঃ কে. ডি ঘোষ। ১৭ বৎসর বয়সে ইংলণ্ড গমন করিয়া ১৮ বৎসর বয়সে কৃতিত্বের সহিত সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বরোদা কলেজের সহঃ-অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় তিনি ইহা ত্যাগ করেন এবং 'বন্দে মাতরম্' নামক পত্রিকার সম্পাদনা করেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে বিপ্লববাদী বলিয়া তাঁহাকে অভিযুক্ত করা হয় এবং বিচারে তাঁহার মুক্তি হয়। এই সময় তিনি 'কর্ম্মযোগিন্' পত্রিকার সম্পাদনা করেন। তখন জীবনের পরিবর্ত্তন আসায় তিনি অধ্যাত্ম সাধনার জন্য 'পণ্ডিচেরী'তে আশ্রম স্থাপন করিয়া 'আর্য্য' নামক পত্রিকার সম্পাদনা করেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থসমূহ—The Hero and the Nymph, Urvasie Songs to Myrtilla and other Poems, The Life Divine, 'গীতার ভাষ্য'।

অশ্বিনীকুমার দত্ত—বরিশাল জেলার বাটাজোড় গ্রামে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ২০শে জানুয়ারী জন্ম এবং ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বর মৃত্যু। পিতা—ব্রজমোহন দত্ত। কৃতিত্বের সহিত এম. এ ও আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কিছুকাল বরিশালে ওকালতী করিবার পর তাঁহারই স্থাপিত ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কার্য্য করেন। পরে উক্ত বিদ্যালয় তাঁহার চেষ্টায় কলেজে পরিণত হয়। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগদানের ফলে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রতি দ্বীপান্তরের আদেশ প্রদত্ত হয়। দ্বীপান্তর হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তিনি জনসেবা ও লোকশিক্ষার কার্য্যে বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি একজন সাহিত্যিক, দেশনেতা ও বাগ্মী ছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থ 'ভক্তিযোগ', 'জ্ঞানযোগ', 'কর্ম্মযোগ', 'প্রেম', 'দুর্গোৎসবতত্ত্ব' প্রভৃতি।

অক্ষয়কুমার বড়াল—কলিকাতার চোরবাগানে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে জন্ম এবং ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ১৯শে জুন মৃত্যু। আদি নিবাস ফরাসডাঙ্গায়। পিতা—কালীচরণ বড়াল। কিছুদিন হেয়ার স্কুলে পড়িবার পর সওদাগরী অফিসে কার্য্য আরম্ভ করেন। পাঠ্যাবস্থায় কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া অল্প কালের মধ্যেই কবিতা রচনায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। ১২৮৯ বঙ্গাব্দের আষাঢ়-সংখ্যা 'ভারতী'তে তাঁহার 'পুনর্মিলনে' নামক প্রথম কবিতাটি প্রকাশিত হয়। ইহার পর হইতে তৎকালের বিখ্যাত পত্র-পত্রিকাগুলিতে তাঁহার কবিতাসমূহ প্রকাশিত হইতে থাকে। 'প্রদীপ', 'কনকাঞ্জলি', 'ভুল', 'শঙ্খ', 'এষা' প্রভৃতি তাঁহার রচিত কাব্যগ্রন্থ। পরলোকগতা পত্নীর উদ্দেশে তাঁহার 'এষা' কাব্যগ্রন্থ রচিত হয়।

আনন্দচন্দ্র মিত্র—ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের অন্তর্গত বজ্রযোগিনী গ্রামে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে জন্ম এবং ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু। পিতা—বঙ্গচন্দ্র মিত্র। তিনি দীর্ঘ কাল শিক্ষকতা কার্য্য করিবার পর শেষ জীবনে কলিকাতা কর্পোরেশনের চাকরীতে যোগদান করেন। তিনি কয়েকখানি নাটক, উপন্যাস ও পাঠ্যপুস্তক রচনা করিয়াছেন। 'ভারতমঙ্গল' 'সঙ্গীতলীলা', 'মিত্রকাব্য', 'হেলেনা কাব্য' প্রভৃতি তাঁহার রচিত কাব্যগ্রন্থ।

আব্দুল কাদির—ত্রিপুরা জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমা অন্তর্গত আড়াইসীধা গ্রামে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ১লা জুন জন্ম। পিতা—হাজি আফসার-উদ্দীন আহ্মদ। ইনি ঢাকার জগন্নাথ কলেজে বি. এ পর্য্যন্ত শিক্ষা লাভ করেন। ১৩৩৭ বঙ্গাব্দে 'জয়তী' নামে একখানি মাসিক পত্র কলিকাতা

হইতে সম্পাদনা করেন। ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ হইতে "মাহে নও" নামক পত্রিকার সম্পাদনা করিতেছেন এবং উহা পূর্ব্ব পাকিস্তানের ঢাকা হইতে প্রকাশিত হইতেছে। ইনি বর্ত্তমানে পূর্ব্ব পাকিস্তানে বাস করিতেছেন। ইঁহার রচিত গ্রন্থাদি—'দিলরুবা', 'বাঙলা কাব্যের ইতিহাস', 'বাঙলার প্রতিভা', 'অজানিতের সন্ধানে', 'অমর জীবন'; সম্পাদিত গ্রন্থাদি—'কাব্য-মালঞ্চ', 'মুসলিম সাহিত্যের সেরা গল্প', 'নজরুল-রচনা-সম্ভার', 'নজরুল-পরিচিতি', 'পূর্ব্ববঙ্গের লোকগীতিকা'।

ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী—বিজাপুরের অন্তর্গত কালাৎগীতে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ২৯শে ডিসেম্বর জন্ম ও ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু। পিতা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ইনি সিমলার অকল্যাণ্ড স্কুলে ৭ বৎসর বয়সে শিক্ষা আরম্ভ করেন। পরে লরেটো ও লা মার্টিনিয়ারে লেখাপড়া করিতে থাকেন। বি. এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া তিনি 'পদ্মাবতী' পদক প্রাপ্ত হন। তাঁহার বিবাহ হয় প্রমথ চৌধুরীর (বীরবল) সহিত। তিনি রবীন্দ্র-সঙ্গীত, পাশ্চাত্ত্য-সঙ্গীত ও হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে বিশেষ নিপুণ ছিলেন। 'সবুজপত্রে'র মাধ্যমেই তাঁহার সাহিত্য-জীবন আরম্ভ হয়। সাহিত্যে পারদর্শিতার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে 'ভুবনমোহিনী' পদক দান করেন। 'নারীর উক্তি' তাঁহার প্রকাশিত একমাত্র কাব্যগ্রন্থ।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত—২৪ পরগণা জিলার কাঁচরাপাড়ায় ১২১৮ বঙ্গাব্দের (ইং ১৮১২) ২৫শে ফাল্গুন জন্ম ও ১২৬৫ বঙ্গাব্দের (ইং ১৮৫৯) ১২ই মাঘ মৃত্যু। পিতার নাম হরিনারায়ণ গুপ্ত ও মাতার নাম শ্রীমতী দেবী। বাল্যকালে ইঁহার লেখাপড়ায় বিশেষ আগ্রহ না থাকিলেও ইনি অত্যন্ত তীক্ষ্ণধী ও স্মৃতি-শক্তিশালী ছিলেন। মাতার মৃত্যুর পর ইঁহার অবশিষ্ট জীবন জোড়াসাঁকো মাতুলালয়ে অতিবাহিত হয়। তিনি জোড়াসাঁকো ঠাকুর-বাড়ীর যোগেন্দ্র-মোহন ঠাকুরের সহায়তায় ১২৩৭ বঙ্গাব্দে (ইং ১৮৩১) সাপ্তাহিক 'সংবাদ-প্রভাকর' প্রকাশ করেন। দুই বৎসর পরে উহার প্রকাশ বন্ধ হয়। পরে তিনি কানাইলাল ঠাকুরের সহায়তায় ১২৪৩ বঙ্গাব্দে (ইং ১৮৩৭) 'সংবাদ-প্রভাকর'কে সপ্তাহে তিনবার প্রকাশ করেন। ১২৪৬ বঙ্গাব্দে (ইং ১৮৪০) উহা দৈনিকরূপে প্রকাশিত হয়। 'সংবাদ-রত্নাবলী' ও 'পাষণ্ডপীড়ন' প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকাও তাঁহার সম্পাদনায় বাহির হয়। তিনি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও দীনবন্ধু মিত্রের সাহিত্য-গুরু ছিলেন। ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ প্রভৃতি প্রাচীন কবিদিগের জীবনী ও তাঁহাদের বহু অপ্রকাশিত কবিতা

ইঁহার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। 'প্রবোধ প্রভাকর', 'হিত প্রভাকর', 'বোধেন্দুবিকাশ', 'সাধুরঞ্জন', 'কলিনাটক' ও 'শকুন্তলা' প্রভৃতি তাঁহার রচিত গ্রন্থ।

উপেন্দ্রনাথ দাস—কলিকাতার বহুবাজার অঞ্চলের শ্রীনাথ দাস লেনে ১২৫৫ বঙ্গাব্দে জন্ম এবং ১৩০২ বঙ্গাব্দের ২২শে শ্রাবণ মৃত্যু। পিতা হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীনাথ দাস। ইনি বি. এ. পাশ করিয়া বঙ্গরঙ্গমঞ্চের উন্নতি কল্পে 'ন্যাশনাল থিয়েটারে'র অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। 'নাটকে অশ্লীলতা প্রদর্শনে'র অভিযোগে তাঁহাকে বিচারালয়ে অভিযুক্ত করা হয়। হাইকোর্টের বিচারে মুক্তিলাভ করিবার পর ব্যারিষ্টারী পড়িবার জন্য ইংলণ্ডে গমন করেন। পরে ব্যারিষ্টার হইয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। 'জাতীয় সঙ্গীত' নামে স্বদেশী গানের একখানি পুস্তক রচনা করেন। 'শরৎ সরোজিনী', 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' 'দাদা ও আমি' তাহার রচিত নাটক। 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' নাটকাভিনয় সরকারী নির্দ্দেশে বন্ধ হইয়া যায়। 'শরৎ সরোজিনী' নাটকখানি তিনি 'দুর্গাচরণ দাস' এই ছদ্মনামে এবং 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' নাটকখানি তিনি 'প্রকাশক' এই ছদ্মনামে রচনা করেন।

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়—নদীয়া জিলার শান্তিপুরে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ১৯শে নভেম্বর জন্ম এবং ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারী মৃত্যু। তিনি বি. এ. পাশ করিয়া ১৯০০ খৃষ্টাব্দে চাকরী জীবনে প্রবেশ করেন। এগার বৎসর বয়সে বিহারের পঞ্চকোটে অবস্থানকালে পার্ব্বত্য শোভা দেখিয়া তিনি কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন এবং মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত উহা অব্যাহত থাকে। প্রথমে তিনি স্কুলে শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। অবশেষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজের ছাত্রাবাসের পরিদর্শক নিযুক্ত হন এবং ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে উক্ত কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৩০৮ বঙ্গাব্দে তাঁহার দেশপ্রেমমূলক 'বঙ্গমঙ্গল' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তিনি ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'জগত্তারিণী' স্বর্ণপদক লাভ করেন। 'প্রসাদী', 'ঝরাফুল', 'শান্তিজল', 'ধানদূর্ব্বা', 'শতনরী', 'রবীন্দ্র-আরতি', 'গীতরঞ্জন' প্রভৃতি তাঁহার রচিত কাব্যগ্রন্থ।

কাঙ্গাল হরিনাথ (কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ)—নদীয়া জেলার অন্তর্গত কুমারখালি গ্রামে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে (শ্রাবণ মাসে) জন্ম ও ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে (অক্ষয়তৃতীয়া তিথিতে) মৃত্যু। তাঁহার প্রকৃত নাম হরিনাথ মজুমদার। পিতা হলধর মজুমদার। শৈশবে তিনি গ্রাম্য বিদ্যালয়ে লেখাপড়া

আরম্ভ করেন; কিন্তু অর্থাভাববশতঃ অধিক লেখাপড়া করিতে পারেন নাই। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহারই চেষ্টায় স্বগ্রামে একটি পাঠশালা স্থাপিত হয়। তিনি উহাতে প্রথমে অবৈতনিক শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। পরে ১৫ টাকা বেতন লইয়া উহা দরিদ্র ছাত্রদের বেতন হিসাবে দান করিতেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহারই সম্পাদনায় 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ইহার পর তিনি স্বগ্রামে একটি বাউল গানের দল গঠন করেন। তখন তাঁহার 'কাঙ্গাল' ও 'ফিকিরচাঁদ' ভণিতাযুক্ত বহু বাউল সঙ্গীত পূর্ব্ববঙ্গের নানাস্থানে গীত হইতে থাকে। সেই সময় তাঁহার নাম হয় 'কাঙ্গাল হরিনাথ' বা 'কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ'। ইনি একজন বিশিষ্ট সাধক ও সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। "হরি দিন ত গেল সন্ধ্যা হল পার কর আমারে। তুমি পারের কর্ত্তা জেনে বার্ত্তা ডাকিতে তোমারে" এই গানটি তাঁহার রচিত। তাঁহার গীতসমূহের সমগ্র পুস্তকের নাম "ফিকিরচাঁদ ফকিবের গীতাবলী"। উহা ১৬ খণ্ডে ৮ বৎসরে প্রকাশিত হয়। তাঁহার 'কাঙ্গালের ব্রহ্মাণ্ডতেজ', 'বিজয়বসন্ত', 'অক্রুর-সংবাদ', 'সাবিত্রী' ও 'চিত্তচপলা' নামে নাটক ও কাব্যগ্রন্থ এবং 'চারুচরিত্র', 'পুণ্ডবাক' ও 'কাব্যকৌমুদী' নামে বিদ্যালয়-পাঠ্য গ্রন্থ আছে।

কামনীকুমার ভট্টাচার্য্য—ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত শ্রীকাইল গ্রামে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে জন্ম ও ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে মৃত্যু। পিতা তারানাথ ভট্টাচার্য্য। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অন্নদা হাই স্কুল হইতে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে তিনি এনট্রান্স পাশ করেন। তাহার পর ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে এফ. এ ও ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ঢাকা কলেজ হইতে বি. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে কলিকাতায় আসিয়া স্কটিশ চার্চ্চ ডাফ কলেজ হইতে দর্শনশাস্ত্রে এম. এ এবং রিপণ কলেজ হইতে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে বি. এল্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পর ব্রাহ্মণবাড়িয়া কোর্টে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত ওকালতি করেন। ইনি ভাল অভিনেতা, গায়ক ও তবলাবাদক ছিলেন। ঢাকার হরি ওস্তাদ, উপেন্দ্র বসাক এবং মুরারি গুপ্তের নিকট তিনি তবলা শিক্ষা করেন। ইনি বহু স্বদেশী গান ও পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু পুলিশের অত্যাচারে তাহা নষ্ট করিয়া ফেলিতে বাধ্য হওয়ায় তাহা মুদ্রিত করিতে পারেন নাই।

কামিনী রায়—বরিশাল জেলার বাসণ্ডাগ্রামে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ১২ই অক্টোবর জন্ম এবং ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর মৃত্যু। বিখ্যাত ঐতিহাসিক চণ্ডীচরণ সেন ইঁহার পিতা। আট বৎসর বয়স হইতেই ইনি

কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার 'সুখ' কবিতাটি এন্‌ট্রান্স পাশ করিবার পূর্ব্বেই রচিত হয়। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে বি এ পাশ করিয়া বেথুন বিদ্যালয়ে শিক্ষিকারূপে যোগদান করেন। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ষ্ট্যাটুটারী সিভিলিয়ান কেদারনাথ রায়ের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ইনি সাহিত্যসেবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'জগত্তারিণী' স্বর্ণপদক লাভ করেন। তাঁহার অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত 'মহাশ্বেতা' ও 'পুণ্ডরীক' নামক কবিতা দুইটি প্রসিদ্ধ। তাঁহার রচিত কাব্যগ্রন্থগুলির নাম—'আলো ও ছায়া', 'গুঞ্জন', 'দীপ ও ধূপ', 'পৌরাণিকী', 'অশোকসঙ্গীত', 'মাল্য ও নির্ম্মাল্য', 'নির্ম্মাল্য', 'জীবন পথে' ও 'ঠাকুমার চিঠি'।

কায়কোবাদ—ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ থানার অন্তর্গত পূর্ব্বপাড়া গ্রামে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে জন্ম এবং ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু। তাহার পিতৃদত্ত নাম মোহাম্মদ কাজেম আল্‌-কোরেশী। 'কাযকোবাদ' তাঁহার কবি-নাম। পিতা নেয়ামৎ উল্লাহ্ আল্‌-কোরেশী। ইনি একজন বিখ্যাত মুসলমান কবি। ইনি ডাক-বিভাগে কার্য্য করিতেন। ১৩ বৎসব বয়সে 'বিরহবিলাপ' ও 'কুসুমকানন' নামে দুইখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। তৎকালীন সংবাদপত্রে তাঁহার কবিতাবলী প্রকাশিত হইলে তিনি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁহার রচিত কাব্যগ্রন্থসমূহের নাম—'অশ্রুমালা', 'মহাশ্মশান', 'শিবমন্দির', 'শ্মশানভস্ম'. 'অমিয়ধারা' ও 'মহরম-শরীফ'।

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ—কলিকাতার ভবানীপুরস্থ বলরাম বসু ঘাট রোডে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ৯ই জুন রবিবার জন্ম ও ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই জাপান হইতে দেশে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে জাহাজে মৃত্যু। আদিনিবাস ২৪ পরগণা জেলার ইছাপুর গ্রামে। পিতা রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথমে তিনি ভবানীপুরের চরকডাঙ্গা স্কুলে শিক্ষালাভ করেন। পরে লণ্ডন মিশনারী স্কুল হইতে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে এন্‌ট্রান্স পাশ করিয়া কলেজে ভর্ত্তি হন। পরে উহা ত্যাগ করিয়া দ্বারিকানাথ বিদ্যাভূষণের নিকট সংস্কৃত পড়িতে আরম্ভ করেন এবং তাঁহার নিকট হইতে পাঠ শেষ করিয়া তিনি 'কাব্যবিশারদ' উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৭ বৎসর বয়সে তাঁহার 'লুক্রেশিয়া' নামে ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। পরে এলাহাবাদ গিয়া 'ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন' পত্রিকার সম্পাদক হন। ইহার পর কলিকাতায় আসিয়া 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ও পরে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র সহকারী সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন। 'হিতবাদী' পত্রিকা একাদিক্রমে ১২ বৎসর তাঁহার

সম্পাদকতায় প্রকাশিত হয়। ‘এন্টি ক্রিশ্চিয়ান’ ও ‘কস্‌মোপলিটান’ পত্রিকারও তিনি সম্পাদক ছিলেন। রাজনীতিতে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার গুরু ছিলেন। রাজনীতির জন্য বহু বার তাঁহাকে নির্যাতন ভোগ করিতে হয়। তিনি বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় সুবক্তা, সুসমালোচক এবং সঙ্গীত ও কবিতা রচনায় নিপুণ ছিলেন। ‘সভ্যতা-সোপান’, ‘ধর্ম্মাবতারের কেচ্ছা’, ‘বিষাদ-প্রতিমা’, ‘চিন্তাকুসুম’, ‘দেশাচার’, ‘রুচিবিকার’, ‘মিঠে কড়া’, ‘স্বদেশ-সঙ্গীত’ ও ‘Mrs. Annie Besant in India’ প্রভৃতি পুস্তক তাঁহার রচিত।

শ্রীকালিদাস রায়—বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত কড়ুই গ্রামে ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ৯ই জুলাই জন্ম। পিতা যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়। অল্প বয়সেই তিনি কবিখ্যাতি লাভ করেন। বি. এ পাশ করিয়া কলিকাতার মিত্র ইনষ্টিটিউশনে (বাঞ্চ) শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত হন। ছাত্রাবস্থায় প্রকাশিত ‘কুন্দ’ তাঁহার প্রথম কবিতা পুস্তক। তিনি একাধারে প্রসিদ্ধ কবি, সমালোচক ও প্রবন্ধকার। ‘বঙ্গসাহিত্য পরিচয়’, ‘শরৎ সাহিত্য’ ও ‘প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য’ তাঁহার সমালোচন-সাহিত্য পুস্তক। ‘আহরণ’ ও ‘আহরণী’ ইঁহার নির্ব্বাচিত কবিতার চয়নিকা। ‘কিসলয়’, ‘পর্ণপুট’, ‘বল্লরী’, ‘ব্রজবেণু’ ‘রসকদম্ব’, ‘ঋতুমঙ্গল’, ‘লাজাঞ্জলি’, ‘ক্ষুদকুঁড়া’, ‘হৈমন্তী’, ‘চিত্তচিতা’, ‘বৈকালী’, ‘গাথাঞ্জলি’, ‘সন্ধ্যামণি’ প্রভৃতি বহু গ্রন্থ ইনি রচনা করিয়াছেন।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ—ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের অন্তর্গত ভবাকর গ্রামে ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুলাই জন্ম এবং ১৯১০ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জুলাই মৃত্যু। পিতা শিবনাথ ঘোষ। বাল্যকালে সামান্য ফার্সি ও ব্যাকরণ শিক্ষা করিয়া বরিশাল গভর্ণমেণ্ট স্কুলে দুই বৎসর পড়াশুনা করেন। পরে ঢাকায় আসিয়া সেখানকার কলেজিয়েট স্কুলে ভর্ত্তি হন এবং এনট্রান্স পর্য্যন্ত পড়াশুনা করেন। তিনি বহু বৎসর পর্য্যন্ত ভাওয়াল ষ্টেটের ম্যানেজার ছিলেন। ইনি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ‘রায় বাহাদুর’ উপাধি প্রাপ্ত হন। বাংলা, সংস্কৃত, ইংরেজী, ইতিহাস ও মনোবিজ্ঞানে তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল। ‘বান্ধব’ পত্রিকা তাঁহা দ্বারা পরিচালিত হয়। ‘প্রভাতচিন্তা’, ‘নিশীথচিন্তা’, ‘নিভৃতচিন্তা’ প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁহার রচিত।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক—বর্দ্ধমান জেলার উজানী গ্রামে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ১লা মার্চ্চ জন্ম। বাসস্থান শ্রীখণ্ড ; অধুনা কোগ্রাম, বর্দ্ধমান। পিতা—পূর্ণচন্দ্র

মল্লিক। তিনি জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে তিনি বি. এ পাশ করিয়া 'বঙ্কিমচন্দ্র' সুবর্ণপদক প্রাপ্ত হন। পরে তিনি দীর্ঘকাল বর্দ্ধমান জিলার মাথরুন উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের কাজ করিয়া অবসর গ্রহণের পরে বর্ত্তমানে নিজগ্রামে বাস করিতেছেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার কবিত্ব শক্তির বিকাশ হয়। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'শতদল' প্রকাশিত হয়। বহু পত্র-পত্রিকায় তাঁহার কবিতাসমূহ প্রকাশিত হইলে তিনি প্রভূত যশের অধিকারী হন। রবীন্দ্রোত্তরযুগে তিনি একজন শক্তিশালী কবিরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। 'অজয়', 'উজানী', 'বীথি', 'একতারা', 'নূপুর', 'বনতুলসী', 'বনমল্লিকা', 'রজনীগন্ধা', 'দ্বারাবতী', 'স্বর্ণসন্ধ্যা' প্রভৃতি তাহার রচিত কাব্যগ্রন্থ।

কুসুমকুমারী দাশ—বরিশাল জিলার সদর মহকুমায় ১২৮৯ বঙ্গাব্দের ২১শে পৌষ জন্ম এবং ১৩৫৫ বঙ্গাব্দের ১০ই পৌষ মৃত্যু। পৈতৃক নিবাস বরিশাল জিলার গৈলা গ্রামে। পিতা—চন্দ্রনাথ দাশ। তিনি কিছুদিন বরিশালে ও পরে বেথুন স্কুলে শিক্ষালাভ করেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার কবিত্বশক্তি প্রকাশ পায়। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ১৯ বৎসর বয়সে সত্যানন্দ দাশের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। বিবাহের পর তিনি শিশুদের জন্য 'কবিতামুকুল' নামে একখানি কবিতা-পুস্তক রচনা করেন। পরে 'পৌরাণিক আখ্যায়িকা' নামে একখানি গদ্য পুস্তকও রচনা করেন। 'প্রবাসী', 'ব্রহ্মবাদী' ও 'মুকুল' পত্রিকায় তাঁহার প্রবন্ধসমূহ প্রকাশিত হয়। তিনি বহু স্বদেশী কবিতা ও দেশ বিভাগ বিষয়ে বহু পদ্যও রচনা করিয়াছেন। শেষ-জীবনে তিনি অসুস্থতার জন্য কবিতা রচনা করিতে পারেন নাই। তাঁহার রচিত কোন গ্রন্থ নাই।

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার—খুলনা জেলার অন্তর্গত সেনহাটী গ্রামে ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে জন্ম ও ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু। তিনি যশোহর জেলা স্কুলের হেড পণ্ডিত ছিলেন। তিনি সংস্কৃত ও ফার্সী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত 'সংবাদ-প্রভাকর' পত্রিকায় তাঁহার বহু কবিতা প্রকাশিত হয়। তিনি ঢাকায় অবস্থানকালে হরিশ্চন্দ্র মিত্রের সহযোগিতায় একখানি কবিতা বিষয়ক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। 'ঢাকা প্রকাশ', 'বিজ্ঞাপনী', 'দ্বৈভাষিকী' প্রভৃতি পত্রিকা তাঁহার সম্পাদকতায় প্রকাশিত হয়। হাফিজের কবিতাসমূহ বঙ্গানুবাদ করিয়া তিনি 'সদ্ভাবশতক' নামে

একখানি কবিতা পুস্তক প্রকাশ করেন। তাঁহার রচিত পুস্তকসমূহের নাম—'রাসের ইতিবৃত্ত', 'মোহভোগ' ও 'কৈবল্যতত্ত্ব'।

গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর—জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে জন্ম ও ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু। পিতা—গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ইনি এন্‌ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। জোড়াসাঁকো নাট্যশালা এবং চৈত্রমেলা সংগঠনে তাঁহার বিশেষ কৃতিত্ব ছিল। ঐ চৈত্রমেলাই পরে হিন্দুমেলায় রূপান্তরিত হয়। ইনি একজন শক্তিশালী লেখক, সঙ্গীত রচনায় নিপুণ ও দেশসেবক ছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থ—'বিক্রমোর্ব্বশী নাটক' ও 'জ্ঞান ও ধর্ম্মের সামঞ্জস্য'।

গিরিজাকুমার বসু—২৪ পরগণা জেলার ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার অন্তর্গত সরিষা গ্রামে ১২৮৭ বঙ্গাব্দের সরস্বতী পূজার দিন জন্ম ও ১৩৫১ বঙ্গাব্দের ২৮শে মার্চ্চ বুধবার মৃত্যু। জন্মস্থান ৩২।৭ বাড়ন ষ্ট্রীট্ ও মৃত্যুস্থান শিবপুরস্থ বাসভবন। পিতা শিবরাম বসু। বি. এ পর্য্যন্ত পড়িয়া একাউন্ট্যান্ট জেনারেল অফিসে ৭৫ টাকা বেতনে চাকুরী আরম্ভ করিয়া শেষে ঐ অফিসে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পদে উন্নীত হন। বেতন হয় ৬০০ টাকা। তিনি ভারতী গোষ্ঠীর সহিত বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। ইঁহার কবিতাসমূহ 'সাহিত্য' ও 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তখন হইতে তাঁহার কবিখ্যাতি চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হয়। তাঁহার সম্পাদকতায় বিভিন্ন সময়ে 'বিচিত্রা', 'বাতায়ন', 'যাদুঘর', 'বেণু', 'দীপালি', 'কায়স্থ-পত্রিকা' প্রভৃতি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। তিনি জীবনে প্রায় এক হাজার কবিতা রচনা করিয়াছেন। 'ধূলি' নামে তাঁহার একখানি কাব্যগ্রন্থ আছে। শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থীর সহযোগিতায় ইনি 'নগ্নতার ইতিহাস' নামে একখানি পুস্তকও রচনা করিয়াছিলেন।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ—কলিকাতার বাগবাজার অঞ্চলের বসুপাড়ায় ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে (১২৫০, ১৫ই ফাল্গুন) জন্ম ও ১৯১২ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু। পিতা নীলকমল ঘোষ। পাঠশালায় শিক্ষালাভের পর ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী এবং পরে হেয়ার স্কুলে এন্‌ট্রান্স পর্য্যন্ত পড়িয়া উহা ত্যাগ করেন। ২২ বৎসর বয়সে 'অ্যাটকিন্‌স টিলটন' অফিসে চাকরীতে যোগ দেন। পরে 'আরজেন্সি সিলিক্সি' অফিসে এসিষ্ট্যান্ট বুক কিপার নিযুক্ত হন। প্রথমে বাগবাজারে একটি সখের থিয়েটার করেন। পরে উহা 'ন্যাশনাল থিয়েটারে' পরিণত হয়। ইহার পর তিনি অবৈতনিক অভিনেতারূপে রঙ্গমঞ্চে যোগদান করিয়া

'সধবার একাদশী' নাটকে নিমাই-এর ভূমিকায় অভিনয় করিয়া বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি 'ষ্টার', 'মিনার্ভা', 'এমারেল্ড', 'ক্লাসিক' থিয়েটারের ম্যানেজার নিযুক্ত হন। নাটক, প্রহসন, গীতিনাট্য প্রভৃতি বিষয়ে তিনি ৭৫ খানি পুস্তক রচনা করিযাছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত কয়েকখানি উপন্যাসকে তিনি নাট্যরূপ দান করেন। তাঁহার রচিত শেষ নাটকের নাম 'তপোবন'। 'জনা', 'প্রফুল্ল', 'মীরকাশিম' 'সিরাজদ্দৌলা' প্রভৃতি তাঁহার রচিত বিখ্যাত নাটক।

গিরিশচন্দ্র সেন—ঢাকা জেলার মহেশ্বরদি পরগণার অন্তর্গত পাঁচদোনা গ্রামে ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে জন্ম এবং ১৯১০ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু। পিতা—মাধবরাম সেন। গ্রাম্য বিদ্যালয়ে শিক্ষা শেষ করিবার পর জনৈক মৌলভীর নিকট পার্শী ও আরবী ভাষা শিক্ষা করেন। পরে ময়মনসিংহ গমন করিয়া জমিদারের অধীনে কিছুকাল কাজ করিবার পর উহা ত্যাগ করিয়া ময়মনসিংহ জেলা স্কুলে পণ্ডিতের কার্য্য করেন। উহা হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া দেশে ফিরিয়া নিজ গ্রামে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তিনি বহু স্বদেশী সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। 'হিতোপদেশ', 'তত্ত্বরত্নমালা', 'কোরানের বঙ্গানুবাদ', 'দরবেশী', 'সতীচরিত্র', 'চারিজন ধর্ম্মনেতা', 'মহাপুরুষ এব্রাহিমের জীবনচরিত্র' ইত্যাদি বিষয়ে ১২ খানি গ্রন্থ রচনা করেন।

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী—কলিকাতার ভবানীপুর অঞ্চলে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ১৮ই আগষ্ট জন্ম এবং ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট মৃত্যু। আদি-নিবাস ২৪ পরগণা জেলার পানিহাটি গ্রামে। পিতা—হারাণচন্দ্র মিত্র। তিনি বাল্যে ২৪ পরগণার মজিলপুরের গ্রাম্য বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। ১০ বৎসর বয়সে বহুবাজারস্থ অক্রুর দত্ত লেনের নরেশচন্দ্র দত্তের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। চিত্রাঙ্কনেও তাঁহার পারদর্শিতা ছিল। 'জাহ্নবী' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা তিনি তিন বৎসর পর্য্যন্ত পরিচালনা করেন। 'কবিতাহার' তাঁহার প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ। 'ভারতকুসুম', 'সিন্ধুগাথা', 'সন্ন্যাসিনী', 'অর্ঘ্য', 'অশ্রুকণা', 'স্বদেশিনী' প্রভৃতি তাঁহার রচিত পুস্তক।

গোবিন্দচন্দ্র দাস—ঢাকা জেলার ভাওয়ালের অন্তর্গত জয়দেবপুর গ্রামে ১২৬১ বঙ্গাব্দের (ইং ১৮৫৫) ৪ঠা মাঘ জন্ম এবং ১৩২৫ বঙ্গাব্দের (ইং ১৯১৮) ১৩ই আশ্বিন মৃত্যু। পিতা—রামনাথ দাস। প্রথমে জয়দেবপুরের

স্কুলে, পরে ঢাকা নর্ম্ম্যাল স্কুলে নবম শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়াশুনা করেন। ইনি কিছুদিন সংস্কৃত ভাষাও শিক্ষা করিয়াছিলেন। কর্ম্মজীবনের প্রথমে ব্রাহ্মণ-গ্রামের বঙ্গ বিদ্যালয়ে হেড পণ্ডিতের কার্য্য করেন। পরে ময়মনসিংহের সুসঙ্গ-দুর্গাপুরে খাজাঞ্চি ও মুক্তাগাছায় কিছুদিন নায়েবীও করিয়াছিলেন। ময়মনসিংহস্থ সেরপুরের 'চারুবার্ত্তা' নামক পত্রিকার সম্পাদক এবং কলিকাতায় 'বিভা' নামক পত্রিকা প্রকাশ তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ ঘটনা। ভাওয়াল হইতে তাঁহাকে মিথ্যা অভিযোগে বিতাড়িত করা হইলে তিনি 'মগের মুলুক' নামে একখানি ব্যঙ্গকাব্য রচনা করেন। পরে অবশ্য তাঁহাকে পুনরায় ভাওয়ালে ফিরাইয়া আনা হয়। তিনি একজন স্বভাব-কবি ছিলেন। তাহাকে আজীবন দুঃখ ও দারিদ্র্যের মধ্যে অতিবাহিত করিতে হয়। 'কুঙ্কুম', 'চন্দন', 'কস্তুরী', 'প্রেম ও ফুল', 'ফুলরেণু' প্রভৃতি তাঁহার রচিত কাব্যগ্রন্থ।

গোবিন্দচন্দ্র রায়—ফরিদপুর জেলার ইদিলপুর পরগণার অন্তর্গত দক্ষিণপাড গ্রামে ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে জন্ম ও ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু। পিতা—গৌরসুন্দর রায়। বাল্যে শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর প্রভাবে ইনি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং ফলে পিতৃগৃহ হইতে বহিষ্কৃত হন। পরে তিনি ঢাকায় আসিয়া দশম শ্রেণী পর্য্যন্ত লেখাপড়া করেন। ইহার পর বরিশালে আসিয়া কিছুদিন শিক্ষকতা করিবার পর সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত হন। পরে তিনি সেই কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া কাশীতে গমন করেন এবং সেখানে হোমিওপ্যাথী শিক্ষা করিবার পর আগ্রায় আসেন এবং সেখানে চিকিৎসা-ব্যবসায়ে তাঁহার প্রভাব-প্রতিপত্তি হয়। তিনি বহু কবিতা ও সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। 'গীতিকবিতা', 'ভিনক্-দুহিতা', 'রোমিও জুলিয়েট' প্রভৃতি তাঁহার রচিত কাব্যগ্রন্থ।

চন্দ্রনাথ দাশ—বরিশাল জেলার অন্তর্গত গৈলা গ্রামের খাজাঞ্চি-বাড়ীতে ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে জন্ম ও ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের ৩০শে আগষ্ট কৃষ্ণনগরে মৃত্যু। পিতা—ভৈরবচন্দ্র দাশ। বাল্যকালে গ্রাম্য বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিবার সময় ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দিয়া চারি বৎসরের জন্য মাসিক ৪ টাকা হিসাবে বৃত্তি পান। পরে ঢাকা সহরে গিয়া স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পর পুনরায় দেশে আসিয়া মাইনর স্কুলে শিক্ষকতা করিবার সময় বরিশাল জজ কোর্টে ২০ টাকা বেতনে চাকরি করিতে করিতে ক্রমশঃ হেড ক্লার্কের পদে উন্নীত হন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে তিনি

উক্ত কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁহার বহু কবিতা ও প্রবন্ধ 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তিনি বহু স্বদেশী গান রচনা করিয়াছেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সাময়িক চিত্র' প্রকাশিত হয়। তাঁহার রচিত অপর দুইখানি কাব্যগ্রন্থের নাম—'হাসির গান' ও 'ক্ষেপার গান'।

(স্বামী) শ্রীচণ্ডিকানন্দ—শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত বানিয়াচঙ্গ গ্রামের বিদ্যাভূষণ-পাড়ায় ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে জন্ম। ইঁহার গৃহস্থাশ্রমের নাম শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। পিতা—গিরিজাপ্রসন্ন বিশ্বাস। ইনি আই. এ শিক্ষা সমাপ্তির পর ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া বেলুড়স্থ রামকৃষ্ণ মিশনে যোগদান করেন। তখন তাঁহার নাম হয় স্বামী শ্রীচণ্ডিকা-নন্দ। প্রসিদ্ধ ভূ-পর্য্যটক রামনাথ বিশ্বাসের ইনি আপন খুল্লতাত ভ্রাতা। বহু স্বদেশাত্মক গীত ও কবিতা ইনি রচনা করিয়াছেন। 'তরুণের গান', 'পাঞ্চজন্য', 'ছেলেদের গান' 'সারদা-রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ গীতি' প্রভৃতি পুস্তক ইঁহার রচিত।

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—২৪ পরগণা জেলার বারাসাত মহকুমার অন্তর্গত নলকুঁড়া গ্রামে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে জন্ম এবং ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ৭ই পৌষ কলিকাতায় ট্রাম হইতে পতনের ফলে মৃত্যু। পিতা-রামকমল সার্ব্বভৌম। বাল্যকালেই পিতৃমাতৃ বিয়োগ হওয়ায় ইঁহার শিক্ষা অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই। ইনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনী রচনা করিয়া বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেন। বহু স্বদেশী সঙ্গীত এবং 'কমলকুমার', 'মনোরমার গৃহ', 'পাপীর নবজীবন লাভ' ইত্যাদি ইঁহার রচিত পুস্তক।

চিত্তরঞ্জন দাশ—ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত তেলিরবাগ গ্রামে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ৫ই নভেম্বর জন্ম ও ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জুন মৃত্যু। পিতা—ভুবনমোহন দাশ। ইংলণ্ড হইতে ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া দেশে ফিরিয়া আইন ব্যবসা আরম্ভ করেন। আলিপুর বোমার মামলায় শ্রীঅরবিন্দের পক্ষ সমর্থন করিয়া তিনি প্রচুর সুনাম অর্জ্জন করেন। দানে তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন। 'নারায়ণ' নামে মাসিক পত্রিকা তাঁহার পরিচালনায় ও সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। তিনি পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যা-কাণ্ড তদন্ত কমিটির একজন সদস্য নির্ব্বাচিত হন। অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করায় ১৯২১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার কারাদণ্ড হয়। তিনি স্বরাজ্য পার্টি গঠন এবং 'লিবার্টি' পরে 'ফরোয়ার্ড' পত্রিকা প্রকাশ করেন। তিনি

কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রথম মেয়র নির্ব্বাচিত হন। তিনি একজন সুকবি এবং সাহিত্যিক ছিলেন। 'সাগর-সঙ্গীত', 'মালা', 'মালঞ্চ', 'অন্তর্যামী' প্রভৃতি তাঁহার রচিত গ্রন্থ।

শ্রীজগদানন্দ বাজপেয়ী—মেদিনীপুর জেলার সদরের অন্তর্গত গড়বেতা গ্রামে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে (১৩০৩ বঙ্গাব্দের ১লা শ্রাবণ) মাতুলালয়ে জন্ম। পৈতৃক নিবাস মুর্শিদাবাদ জেলার জিয়াগঞ্জ সহরে। পিতা—নীলমণি বাজপেয়ী। বহরমপুরের কৃষ্ণনাথ কলেজিয়েট স্কুল ও কলেজে শিক্ষালাভ করেন। উক্ত কলেজে বি এ পড়িবার সময় জাতীয় আন্দোলনে যোগদান করিয়া ১২ বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করেন। পরে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সহকারী সম্পাদক হিসাবে ১৫ বৎসর কার্য্য করিবার পর অবসর গ্রহণ করেন। বর্ত্তমানে 'জনসেবক' পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে কার্য্য করিতেছেন। 'চলার পথে', 'জনজনতা','বীর সাভারকরের জীবনী', 'বিশ্বরাজনীতির ধারা', 'মণিকাঞ্চন', 'গৌরবগাথা', 'প্রতিধ্বনি', 'মায়ামুকুর' গ্রন্থ ইনি রচনা করিয়াছেন। ইনি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের 'ডিভাইডেড ইণ্ডিয়া' গ্রন্থের বাংলা অনুবাদও করিয়াছেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর—কলিকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মে জন্ম এবং ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মার্চ্চ মৃত্যু। পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে এন্‌ট্রান্স পাশ করিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে কিছুকাল শিক্ষা করেন। ইহার পর ফরাসী ভাষা আয়ত্ত করিয়া বহু ফরাসী গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করেন। 'তত্ত্ববোধিনী' ও 'সঙ্গীত-প্রকাশিকা' পত্রিকা কিছুদিন তাঁহার সম্পাদকতায় প্রকাশিত হয়। তিনি 'ভারতী' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। সঙ্গীত-রচনায় তাঁহার অত্যন্ত দক্ষতা ছিল। পাট ও নীলের ব্যবসা এবং বরিশালে স্বদেশী ষ্টীমার পরিচালনার ব্যাপারেও তিনি নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার দ্বারা বহু নাটক রচিত হইয়াছিল; তাহাদের মধ্যে কয়েকখানি সংস্কৃত এবং ফরাসী নাটকের অনুবাদও প্রসিদ্ধ। 'হিন্দুমেলা' ও 'রাখীবন্ধন উৎসবে'র তিনি একজন প্রধান উদ্‌যোক্তা ছিলেন। বহু স্বদেশী সঙ্গীত তিনি রচনা করেন। 'পুরুবিক্রম' (২য় সংস্করণ) নাটকের প্রথম অঙ্কে এই গান সম্পূর্ণ সংযুক্ত হয়। 'পুরুবিক্রম', 'সরোজিনী', 'অশ্রুমতী' প্রভৃতি তাঁহার রচিত গ্রন্থ।

ডিরোজিও, হেনরি লুই ভিভিয়ান—কলিকাতার ইণ্টালীস্থ মৌলালি দরগার নিকট কোন এক ভবনে ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল জন্ম

এবং ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর শনিবার কলিকাতায় কলেরা রোগে মৃত্যু। পিতা—ফ্রানসিস ডিরোজিও। তাঁহার শিক্ষা আরম্ভ ও শেষ হয় ড্রামণ্ড সাহেবের ধর্ম্মতলার স্কুলে। ঐ সময় তাঁহার বয়স ছিল ১৪ বৎসর। শিক্ষা-শেষে তিনি পিতার অফিসের কার্য্যে যোগদান করেন। এই সময়ে ইংরেজী পত্রিকায় তাঁহার বহু কবিতা ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে তিনি হিন্দু কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ঐ সময় তিনি ছাত্রদের স্বাধীনতার জন্য চিন্তা করিতে বলিতেন। তিন বৎসর উক্ত কার্য্য করিবার পর হিন্দুধর্ম্মের নিন্দা প্রভৃতি করিবার জন্য তাঁহাকে উক্ত পদ ত্যাগ করিতে হয়। কার্য্য পরিত্যাগ করিবার পর তিনি 'ইষ্ট ইণ্ডিয়ান' নামে একখানি ইংরেজী দৈনিক প্রকাশ করেন। হিন্দু কলেজে কার্য্য করিবার সময় তিনি 'একাডেমিক এসোসিয়েশন' স্থাপন করেন। উহাতে তৎকালীন বহু বিখ্যাত ইংরেজ কর্ম্মচারী যোগদান করিতেন। 'To India—My nativeland' নামে স্বদেশাত্মক একটি বিখ্যাত কবিতা তিনি রচনা করেন।

শ্রীদিলীপকুমার রায়—১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে জন্ম। পিতা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি. এস্. সি পাশ করিয়া ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে গণিত ও আইন শিক্ষা করিবার জন্য কেম্‌ব্রিজে গমন করেন; কিন্তু সে স্থানে উহা শিক্ষা না করিয়া সঙ্গীত-বিদ্যা শিক্ষা করিতে থাকেন। পরে তিনি ইউরোপ ও ভারতের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া সঙ্গীতে বিশেষ পারদর্শী হন। শ্রীঅরবিন্দের প্রতিষ্ঠিত পণ্ডিচেরী আশ্রমে যোগ শিক্ষা করিবার জন্য ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে তিনি উহাতে যোগদান করেন। সঙ্গীত-শাস্ত্র সম্বন্ধে 'সাঙ্গীতকী' নামে তাঁহার একখানি বিখ্যাত পুস্তক আছে। বর্ত্তমানে ইনি পুনার 'হরিকৃষ্ণ মন্দির'-এ বাস করিতেছেন। 'মনের পরশ', 'রঙের পরশ', 'তীর্থঙ্কর', 'ভ্রাম্যমাণের দিনপঞ্জী', 'অনামী', 'সূর্য্যমুখী' প্রভৃতি তাঁহার রচিত পুস্তক।

দীনবন্ধু মিত্র—নদীয়া জিলার অন্তর্গত চৌবেড়িয়া গ্রামে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে জন্ম ও ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু। পিতা কালাচাঁদ মিত্র। ইনি কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল হইতে পরীক্ষায় পাশ করিয়া বৃত্তি পান। পরে হিন্দু কলেজের চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইয়া দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়েন। ইহার পর তিনি পাটনায় পোষ্ট মাষ্টারের পদ গ্রহণ করেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে সুপরনিউমরি ইন্‌স্পেক্টিং পোষ্ট মাষ্টারের পদে উন্নীত হন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ডাক বিভাগের সর্ব্বময় কর্ত্তার পদ গ্রহণ করিয়া লুসাই গমন করেন এবং ঐ কার্য্যে যথেষ্ট সুনাম

অর্জ্জন করেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যাযের সহিত তাঁহার যথেষ্ট বন্ধুত্ব ছিল। তাঁহার সম্পাদিত 'প্রভাকর' পত্রে উঁহার বহু কবিতা প্রকাশিত হয। তাঁহার প্রথম নাটক 'নীলদর্পণ' ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ঢাকা হইতে প্রকাশিত হয। 'নবীন তপস্বিনী', 'সধবার একাদশী', 'কমলে কামিনী', 'লীলাবতী', 'জামাই বারিক', 'বিযে পাগলা বুড়ো' তাঁহার রচিত নাট্যগ্রন্থ।

. **দীনেশচরণ বসু**—১৮৫১ খৃষ্টাব্দে পূর্ণিযা জেলায জন্ম এবং ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু। (জন্ম ১২৫৭ বঙ্গাব্দ ১২ই ফাল্গুন, মৃত্যু ১৩০৫ বঙ্গাব্দ ২৪শে আশ্বিন)। ঢাকা জেলার মাণিকগঞ্জ পরগণার অন্তর্গত শ্রীবাড়ী গ্রামে তাঁহার পৈতৃক বাসস্থান। পিতার নাম অভযাচরণ বসু। ভাগলপুর হইতে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইযা কলিকাতা মেডিকেল কলেজে তিন বৎসর পর্য্যন্ত লেখাপড়া করেন। পরে উহা শেষ না করিযাই দেশে ফিরিয়া সাহিত্য-চর্চ্চায মনোনিবেশ করেন। এই সময়ে 'বঙ্গদর্শন' ও 'বান্ধব' পত্রিকায তাঁহার রচনাসমূহ প্রকাশিত হইতে থাকে। পরে 'চারুবাদ', 'ঢাকা প্রকাশ' এবং 'ঢাকাবার্ত্তা'র সম্পাদনায নিযুক্ত হন। সাহিত্য বিষযে কালীপ্রসন্ন ঘোষ তাঁহার প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন। 'কবিকাহিনী', 'মানসবিকাশ', 'মহাপ্রস্থান কাব্য', 'কুলকলঙ্কিনী', 'নিরাশ-প্রণয়' (উপন্যাস), 'মোহিনী-প্রতিমা' বা 'সরলা' উপন্যাস, 'পদ্মিনী' (উপন্যাস) প্রভৃতি তাঁহার রচিত পুস্তক।

দেবেন্দ্রনাথ সেন—১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ২৭শে নভেম্বর উত্তরপ্রদেশের গাজিপুরে জন্ম এবং ১৯২০ খৃষ্টাব্দে দেরাদুনে মৃত্যু। তাঁহার শেষ-জীবন দেরাদুনেই অতিবাহিত হয। আদিনিবাস হুগলী জিলার বলাগড় গ্রামে। পিতা লক্ষ্মীনারাযণ সেন। তিনি ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালযের অধীন পাটনা কলেজিয়েট স্কুল হইতে এন্ট্রান্স পাশ করিযা ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইংরেজী অনার্সে বি এ এবং ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয হইতে প্রাইভেটে ইংরেজীতে এম. এ পরীক্ষা দিযা ৬ষ্ঠ স্থান অধিকার করেন। ইহার পর উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি. এল পাশ করিয়া সে স্থানেই ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ওকালতি ব্যবসা আরম্ভ করেন। তিনি ১৯০০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার অধুনালুপ্ত 'শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালা' নামক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। উক্ত বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান নাম 'কমলা হাই স্কুল'। ১২৯৫ বঙ্গাব্দে 'ভারতী' মাসিক পত্রিকার কার্ত্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত 'অদ্ভুত রোদন' ও 'অদ্ভুত সুখ' নামে দুইটি কবিতা তাঁহার

প্রথম রচনা। 'ফুলবালা' তাঁহার প্রথম প্রকাশিত কাব্য-গ্রন্থ। তিনি বহু স্বদেশী সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। 'অশোকগুচ্ছ', 'শেফালীগুচ্ছ', 'পারিজাত-গুচ্ছ', 'গোলাপগুচ্ছ, 'ঊর্ম্মিলাকাব্য', 'নির্ঝরিণী', 'দগ্ধকচু', 'অপূর্ব্ব নৈবেদ্য' প্রভৃতি ২১ খানি কাব্যগ্রন্থ তিনি রচনা করেন।

দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়—ঢাকা জেলার মাগুরখণ্ড গ্রামে ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ২০শে এপ্রিল জন্ম এবং ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জুন মৃত্যু। পিতা কৃষ্ণপ্রাণ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি গ্রামের কালীপাড়া স্কুলে এনট্রান্স পর্য্যন্ত পড়াশুনা করিয়া কিছুদিন ঢাকায় শিক্ষকতা করেন। ফরিদপুর জিলার লোন-সিংহ গ্রামে শিক্ষকতা করিবার সময় তাঁহার 'অবলাবান্ধব' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পরে তিনি কলিকাতায় আসিয়া স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতা আন্দোলনে বিশেষভাবে যোগ দেন। ইনি 'হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়ে'র পণ্ডিত নিযুক্ত হন এবং উহার বিলুপ্তি ঘটিলে নিজেই 'বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়' স্থাপন করেন। ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। 'সঞ্জীবনী' পত্রিকা পরিচালনায়, ভারত সভা সংস্থাপনায় এবং জাতীয় মহাসমিতির কার্য্যে ইনি বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করেন। 'জাতীয় সঙ্গীত', 'কবিগাথা', 'কবিতামালা', 'পদ্যমালা' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ এবং 'সুরুচির কুটীর' নামক উপন্যাস তাহার রচিত।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর—জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ১১ই মার্চ্চ জন্ম ও ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ১৯শে জানুয়ারি মৃত্যু। ইনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং কবিগুরুর জ্যেষ্ঠাগ্রজ। সেণ্ট পলস্ স্কুলে দুই বৎসর শিক্ষালাভ করিবার পর হিন্দু কলেজে প্রবেশ করিয়া সে স্থানে শিক্ষা শেষ করিবার পূর্ব্বেই কলেজ ত্যাগ করেন। ২০ বৎসর বয়সে তিনি 'মেঘ-দূতে'র বাংলা অনুবাদ রচনা করেন। দর্শন-শাস্ত্রে তাহার প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল। তিনি স্বদেশী মেলার একজন প্রধান উদ্‌যোক্তা, 'ভারতী' পত্রিকার প্রথম সম্পাদক এবং 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' তাঁহার সম্পাদকতায় প্রকাশিত হয়। তিনি 'হিতবাদী' পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ইনি ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন এবং কিছুকাল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতিও হইয়াছিলেন। 'স্বপ্নপ্রয়াণ', 'কাব্যমালা', 'ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মসাধন' প্রভৃতি তাঁহার রচিত গ্রন্থ।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—নদীয়া জিলার অন্তর্গত কৃষ্ণনগরে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জুলাই জন্ম ও ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ১৭ই মে মৃত্যু। পিতার নাম দেওয়ান

কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়। ইনি ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে এন্ট্রান্স, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে এফ. এ ও ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে বি. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে এম. এ পাশ করিবার পর সরকারী বৃত্তি লইয়া কৃষিবিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য ইংলণ্ড যান এবং সেখান হইতে উহা শিক্ষা করিয়া ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে দেশে ফিরিয়া আসিয়া ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পদে নিযুক্ত হন। চাকরী উপলক্ষে তাঁহাকে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করিতে হয়। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে 'নব্যভারত' পত্রিকায় 'শ্মশান-সঙ্গীত' নামক তাহার প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। ইংলণ্ডে অবস্থানকালে তিনি ইংরেজীতে কবিতা লিখিয়া তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। তিনি কবি হইলেও নাট্যকাররূপে বিশেষ প্রসিদ্ধ লাভ করেন। তাঁহার প্রথম গীতিগ্রন্থ 'আর্য্যগাথা' (১ম খণ্ড) ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ও উহার দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইনি 'ভারতবর্ষ' নামক মাসিক পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ছিলেন। 'আষাঢ়ে', 'হাসির গান', 'আলেখ্য', 'ত্রিবেণী', 'গান', প্রভৃতি তাহার রচিত কাব্যগ্রন্থ; 'মেবার পতন', 'সাজাহান', 'পাষাণী', 'দুর্গাদাস', 'চন্দ্রগুপ্ত', 'পরপারে', 'ত্র্যহস্পর্শ' ও 'পুনর্জন্ম' প্রভৃতি তাঁহার রচিত নাটক।

নজরুল ইসলাম—বর্দ্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ২৪শে মে জন্ম। পিতা কাজী ফকির আহমদ। প্রবেশিকা শ্রেণীতে 'প্রি-টেষ্ট' দিবার পরই প্রথম মহাযুদ্ধে (১৯১৪-১৮) ৪৯ নং বাঙ্গালী রেজিমেণ্টে যোগ দিয়া করাচী, মেসোপটেমিয়া (ইরাক) ভ্রমণ করেন। পরে হাবিলদার হইয়া যুদ্ধ শেষ হইলে দেশে ফিরিয়া আসিয়া তিনি বহু কবিতা রচনা করেন। তাহা 'মোসলেম ভারত' পত্রিকা প্রকাশিত হইতে থাকিলে সাহিত্য-জগতে আলোড়ন উপস্থিত হয় এবং তিনি অল্প দিনের মধ্যেই যশস্বী হইয়া উঠেন। প্রথম যৌবনে 'বিদ্রোহী' কবিতা লিখিয়া তিনি 'বিদ্রোহী কবি' নামে পরিচিত হন। তাঁহার সম্পাদিত 'ধূমকেতু' রাজরোষে পড়িয়া অকালে বন্ধ হইয়া যায়। সঙ্গীত রচনায় তিনি প্রভূত দক্ষতা দেখান। গত কয়েক বৎসর যাবৎ তিনি পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়া জীবন্মৃত অবস্থায় বাস করিতেছেন। ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকার তাহাকে 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন; তাহাদের মধ্যে বিখ্যাত কয়েকখানির নাম—'অগ্নিবীণা', 'বিষের বাঁশি', 'দোলন চাঁপা', 'সিন্দু-হিন্দোল', 'ছায়ানট', 'সন্ধ্যা', 'নজরুল-গীতিকা', 'সর্ব্বহারা', 'ভাঙার গান', 'বুলবুল'।

শ্রীনরেন্দ্র দেব—কলিকাতায় ১২৯৫ বঙ্গাব্দের ২০শে আষাঢ় শুক্রবার জন্ম। পিতা নগেন্দ্রচন্দ্র দেব। বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ইনি কলেজের শিক্ষা সমাপ্ত করেন নাই। ইনি একজন সুকবি। 'বসুধারা', 'চারিমিল', 'খেলার পুতুল', 'যাদুঘর', 'রাজপুতের দেশে', 'সাহেব-বিবির দেশে' প্রভৃতি বহু পুস্তক রচনা করিয়াছেন। ইনি বহু দেশাত্মবোধক কবিতা রচনা করিযাছেন। অনুবাদ গ্রন্থ—'মেঘদূত' ও 'ওমর খৈয়াম'। সম্পাদনা—'পাঠশালা' ও 'সোনার কাঠি'। ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য—'আনন্দমেলা', 'অনেক দিনের অনেক কথা', 'জন্মজন্মান্তরের কাহিনী', 'পরাগ ও রেণু' ইত্যাদি, সিনেমা—'চলচ্চিত্রের ইতিহাস'।

নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য—হাওড়া জেলার অন্তর্গত আমতার নিকটবর্ত্তী নারিট গ্রামে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দেব ২২শে এপ্রিল জন্ম ও ১৯২০ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বব মৃত্যু। পিতা রাজনারাযণ তর্কবাচস্পতি। নিজ গ্রামে ছাত্রবৃত্তি বিদ্যালযে অধ্যযন কালেই বিভিন্ন সাপ্তাহিক পত্রে কবিতা লিখিতে থাকেন। ইহাব পব তিনি স্বগ্রামের বিদ্যালযে প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন। পরে উক্ত পদ পবিত্যাগ করিযা কলিকাতায আসিযা সংস্কৃত কলেজিযেট স্কুলে এন্‌ট্রান্স ক্লাসে পাঠকালে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায মহাশযের দৌহিত্র-গণেব গৃহশিক্ষকেব পদে নিযুক্ত হন। বাল্যকাল হইতেই তিনি সাহিত্যানুবাগী ছিলেন। তাহার প্রথম কবিতা 'ভারতী' পত্রিকায প্রকাশিত হইলে রবীন্দ্রনাথ উহার প্রশংসা কবেন। পরে 'সোমপ্রকাশ', 'নববিভাকর', 'এডুকেশন গেজেট', 'প্রচার' প্রভৃতি পত্রিকায় তাহার কবিতাসমূহ প্রকাশিত হইতে থাকে। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায, উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায প্রভৃতি সাহিত্যিকগণ তাঁহার বন্ধু ছিলেন। 'ছেলেখেলা', 'টুকটুকে বামাযণ', 'ছবির ছড়া' প্রভৃতি শিশুসাহিত্য পুস্তক তিনি রচনা করেন। তাঁহাব বচিত কাব্যগ্রন্থের নাম **'পুষ্পাঞ্জলি'**।

নবগোপাল মিত্র—হুগলী জেলাস্থ কোন্নগরের মিত্রবাড়ীতে জন্ম। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে কলিকাতায় মৃত্যু। পিতা—গৌরগোপাল মিত্র। মাতা—সুরথসুন্দরী দাসী। ইনি কলিকাতার শঙ্কর ঘোষ লেনে বাস করিতেন। ইঁহার কোন পুত্র ছিল না। তিনজন কন্যা ছিল। ইনি ঠাকুরবাড়ার জমিদারী সেরেস্তায় চাকরী করিতেন। নৃত্য, গীত ও ব্যায়াম শিক্ষার জন্য ১২।৩, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে "কলিকাতা ট্রেণিং স্কুল" স্থাপন করেন। বর্ত্তমানে যে স্থানে বিদ্যাসাগর কলেজ হোষ্টেল ও আর্য্যসমাজ ভবন অবস্থিত,

সেখানে তাঁহার ব্যায়ামের আখড়া ছিল। সেস্থানে ঠাকুরবাড়ীর অনেকে এবং অন্যান্য ব্যক্তিও ব্যায়াম করিতে আসিতেন। নরেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দ) ঐ ব্যায়ামের আখড়ার সম্পাদক ছিলেন। ভারতবাসীদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করিবার জন্য দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আনুকূল্যে, ইঁহার উদ্‌যোগে এবং গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অর্থানুকূল্যে বেলগাছিয়াস্থিত ডান্‌কিন সাহেবের বাগানে (এখন সেখানে ভেটারেনারী কলেজ অবস্থিত) ১২৭৩ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংক্রান্তির দিনে (১২ই এপ্রিল, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ) "চৈত্রমেলা" নামে একটি মেলা অনুষ্ঠিত হয়। পরে এই মেলার নাম হয় "হিন্দুমেলা"। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ৭ই আগষ্ট 'ন্যাশনাল পেপার' নামে একখানি ইংরেজী পত্রিকা প্রকাশ করিলে, ইনি উহার সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন। ইহার ইংরেজী প্রায় সমস্তই ভুলে পূর্ণ থাকিত। ইহাও স্বাদেশিকতার একটি লক্ষণ বলিয়া ইনি মনে করিতেন। ইনি 'এলবার্ট বিলে'র তীব্র বিরোধিতা করেন। ইনি একটি সার্কাস পার্টিও খুলিয়াছিলেন। জনসাধারণের মধ্যে ইনি 'ন্যাশনাল মিত্র' নামে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। ইঁহার রচিত কোনও পুস্তক পাওয়া যায় না।

নবীনচন্দ্র সেন—চট্টগ্রাম জেলার রাউজান থানার অন্তর্গত নোয়াপাড়া গ্রামে ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারী বুধবার জন্ম এবং ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারী মৃত্যু। পিতার নাম গোপীমোহন সেন। ইনি চট্টগ্রাম স্কুল হইতে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে এন্‌ট্রান্স, প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে এফ. এ এবং জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ কলেজ হইতে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ইংরেজীতে বি. এ পাশ করিয়া কিছুকাল হেয়ার স্কুলে শিক্ষকতা করিবার পর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন। এই সময় হইতে ইনি 'এডুকেশন গেজেট' নামক পত্রিকায় স্বরচিত কবিতাবলী প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। ৩৬ বৎসর উক্ত কার্য্য, করিবার পর ইনি অবসর গ্রহণ করেন। ইঁহার প্রকাশিত প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম 'অবকাশরঞ্জিনী।' ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ইঁহার 'পলাশীর যুদ্ধ' নামক কাব্য-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ইঁহার প্রণীত অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ যথা—'কুরুক্ষেত্র', 'রৈবতক', 'প্রভাস', 'অমিতাভ', 'অমৃতাভ', 'রঙ্গমতী'। 'গীতা' ও 'চণ্ডী'র বঙ্গানুবাদ। সরস গদ্য রচনাতেও ইনি নিপুণ ছিলেন। ইঁহার আত্মচরিত 'আমার জীবন' গ্রন্থে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। ইঁহার রচিত অন্য গদ্য পুস্তকের নাম—'প্রবাসের পত্র'।

শ্রীনিরুপমা দেবী—উত্তরপ্রদেশের হোসাঙ্গাবাদ জেলায় ১৮৯৫

খৃষ্টাব্দের ২৫শে মে জন্ম। পিতা—মতিলাল গুপ্ত। স্বামী—শ্রীশিশিরকুমার সেন। ইনি কোন স্কুল-কলেজে অধ্যাপনা না করিয়া পিতার নিকট সমস্ত লেখাপড়া শিক্ষা করেন। ইঁহার মাতা বাংলা সাহিত্যে অনুরাগিণী ছিলেন; তাঁহার প্রেরণা ও উৎসাহে বাল্যকাল হইতেই ইঁহার কবিতা রচনায় দক্ষতা জন্মে। ১৩২৫ বঙ্গাব্দে 'ধূপ' নামে ইঁহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তিনি ১৯২৩—১৯৩১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত "পরিচারিকা" পত্রিকা সম্পাদনা করেন। ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে 'গোধূলি' নামে তাঁহার অপর একখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

শ্রীনিশিকান্ত রায়চৌধুরী—কলিকাতার বাদুড়বাগান অঞ্চলে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ২৪শে মার্চ্চ জন্ম। পৈতৃক নিবাস ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত বসিরহাট মহকুমার শিবহাটি গ্রামে। পিতার নাম বিজয়শঙ্কর রায়চৌধুরী। ইনি বাল্যকাল হইতে শান্তিনিকেতনে শিক্ষালাভ করেন। পাঁচ বৎসর বয়স হইতে ইনি কবিতা রচনায় অনুপ্রাণিত হন। শিল্পাচার্য্য নন্দলাল বসুর নিকট ইনি অঙ্কনবিদ্যা শিক্ষা করিয়া পারদর্শী হন। ২৪ বৎসর বয়সে অধ্যাত্ম প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া শান্তিনিকেতন হইতে পণ্ডিচেরীস্থ শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে আগমন করেন। বর্ত্তমানে ইনি সেখানেই বাস করিতেছেন। রোগজীর্ণতায় দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হওয়ায় বর্ত্তমানে ইনি অঙ্কনবিদ্যা পরিত্যাগ করিয়াছেন। বাংলা দেশের বহু পত্র-পত্রিকায় ইঁহার কবিতাবলী প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীদিলীপকুমার রায় ও শ্রীতিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ইঁহার বহু গানের সুর স্বরযোজনা করিয়াছেন। শ্রীতিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ইঁহার গানের ৩ খানি স্বরলিপি পুস্তকও প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাদের নাম—'সুরলিপিকা' ও 'সুরদীপন'। ইঁহার রচিত কাব্যগ্রন্থগুলির নাম—'অলকানন্দা', 'দিগন্ত', 'পঁচিশ প্রদীপ', 'ভোরের পাখী', 'দিনের সূর্য্য', 'বৈজয়ন্তী', 'বন্দে মাতরম্', 'নবদীপন', 'Dream Cadences'.

পঙ্কজিনী বসু—ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত শ্রীনগর গ্রামে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে জন্ম ও ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর মৃত্যু। পিতা—নিবারণচন্দ্র গুহ মুস্তফী। বিক্রমপুরের অন্তর্গত বজ্রযোগিনী গ্রামের আশুতোষ বসুর সহিত তেরো বৎসর বয়সে ইঁহার বিবাহ হয়। পিতৃগৃহে অবস্থানকালে নিজের অধ্যবসায়ে লেখাপড়া শিক্ষা করেন। বিবাহের পরই ইঁহার কবিতা রচনাশক্তি প্রকাশ পায়। তাঁহার স্মরণশক্তি অতি তীক্ষ্ণ ছিল। পরলোকগত অধ্যাপক হরিনাথ দে ইঁহার 'সূর্য্যমুখী' নামক কবিতাটি ইংরেজীতে

অনুবাদ করেন। ইঁহার কবিতাসমূহ 'নব্যভারত' ও 'সখী' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ইঁহার রচিত কাব্যগ্রন্থের নাম—'স্মৃতিকণা'।

স্বামী প্রজ্ঞানন্দ—রংপুর জেলার সৈয়দপুরে ১২৮৮ বঙ্গাব্দে জন্ম ও কলিকাতার উদ্বোধন কার্য্যালয়ে ১৩২৫ বঙ্গাব্দের ৭ই বৈশাখ মৃত্যু। পৈতৃক বাসস্থান হুগলী জেলার হরিপাল থানার অন্তর্গত জেজুর গ্রামে। পিতা—আশুতোষ বসু। সংসারাশ্রমে ইঁহার নাম ছিল দেবব্রত বসু। ইনি বি. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া রাজনৈতিক আন্দোলনে বিশেষভাবে যোগদান করেন। কিছুদিন ইনি "সন্ধ্যা" পত্রিকার সম্পাদকও ছিলেন। মাণিকতলা বোমার মামলায় শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতির সহিত ধৃত হইয়া বিচারে মুক্তিলাভ করেন। ইহার পর ইনি আর গৃহে না ফিরিয়া বেলুড়স্থিত রামকৃষ্ণ মিশনে যোগদান করেন। তখন ইহার নাম হয় স্বামী প্রজ্ঞানন্দ। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে উত্তরপ্রদেশের মায়াবতীতে অবস্থান কালে 'প্রবুদ্ধ ভারতে'র সম্পাদক নিযুক্ত হন এবং ইনি কিছুদিন 'উদ্বোধন' পত্রিকার সম্পাদকও ছিলেন। ইহার রচিত পুস্তকের নাম—'ভারতের সাধনা।'

শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—হুগলী জিলার অন্তর্গত চুঁচুড়ার মাতুলালয় ভূদেব ভবনে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে জন্ম। পৈতৃক নিবাস হুগলী শহরে। পিতা—ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা—ইন্দিরা দেবী। শৈশব হইতে ইঁহার কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ইনি 'ম্যা ইংরেজী' পরীক্ষায় বৃত্তি পাইয়া হিন্দু স্কুলে ও পরে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি এ পাশ করিয়া বিশ্বভারতীর শিক্ষকতাকার্য্যে ব্রতী হন। বিশ্বভারতীর শিল্প ভবনে সাহিত্য ও কলাবিদ্যার চর্চ্চা করিয়া চিত্রশিল্পিরূপে খ্যাতি অর্জ্জন করেন। বর্ত্তমানে ইনি বিশ্বভারতী বিদ্যাপীঠে সাহিত্য ও কলাবিভাগে নিযুক্ত আছেন। 'এডুকেশন গেজেট', 'বামাবোধিনী পত্রিকা' ও 'ভারতী'তে ইঁহার কবিতাসমূহ প্রকাশিত হয়। ইহার পর ইনি স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করিয়া পাঁচবার কারাবরণ ও বহু নির্যাতন সহ্য করেন। ইনি বিভিন্নস্থানে বন্যা, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প এবং নোয়াখালির হত্যাকাণ্ডে বহু সেবাকার্য্য করিয়াছেন। ইহার পর ইনি একটী 'জাতীয় বিদ্যালয়' স্থাপন করিয়া দশ বৎসর পরিচালনার পর অর্থাভাবে উহা উঠাইয়া দিতে বাধ্য হন। ইঁহার রচিত কাব্যগ্রন্থ 'মুক্তিপথে' ব্রিটিশ সরকার রাজদ্রোহকর বিবেচনা করিয়া বাজেয়াপ্ত করেন। ইঁহার 'গৃহ সন্ধানে' উপন্যাস, 'অচিরা' কাব্যগ্রন্থ, 'ব্রতী' নাটিকা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত 'স্বপ্নচারণ', 'মেখলা',

'বাংলার বচন', 'বাংলার খেলা', 'পথের বাঁশী', 'দাড়িম্বের দারুলিপি' প্রভৃতি গ্রন্থ যন্ত্রস্থ।

শ্রীপ্রভাত বসু—১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ৫ই ডিসেম্বর কলিকাতায় জন্ম। পৈতৃক নিবাস হাওড়া জেলার পাঁচলা গ্রামে। পিতা—দেবেন্দ্রনাথ বসু। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে বি. এ পাশের পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজীতে এম. এ পড়িবার সময় জাতীয় আন্দোলনে যোগদান করায় এম এ পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব হয় নাই। পরে বিভিন্ন আন্দোলনে যোগদান করিয়া ইনি বহু বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করেন। ইনি বর্ত্তমানে জাতীয় বীমা প্রতিষ্ঠানে (এল. আই. সি) কার্য্যরত আছেন। ইঁহার শতাধিক স্বদেশ সঙ্গীত 'আকাশবাণী' ও 'রেকর্ডে' গীত হইয়াছে। 'গান্ধীজী গীতিনাট্য', 'গান্ধীজীর গল্প', 'সুভাষচন্দ্রের গল্প', 'জওহরলালের গল্প', 'স্বদেশী কবিতা' প্রভৃতি ১৮ খানি পুস্তক ইনি রচনা করিয়াছেন।

প্রমথনাথ রায়চৌধুরী—ময়মনসিংহ জেলার সন্তোস গ্রামে বিখ্যাত জমিদারবংশে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে জন্ম এবং ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারী মৃত্যু। পিতা—দ্বারকানাথ রায়চৌধুরী। ইনি মহারাজ প্রতাপাদিত্যের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। সন্তোসের মহারাজ মন্মথনাথ রায়চৌধুরীর ইনি জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিলেন। যৌবনকাল হইতেই ইনি সাহিত্য-রচনা করিতেন। ইনি বিদেশী আচার-ব্যবহার ও বিলাসিতার অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন এবং বহু স্বদেশাত্মক গান ও কবিতা রচনা করিয়াছেন। 'পদ্মা', 'গৌরাঙ্গ', 'গৈরিক', 'পাথার', 'পাষাণ', 'গৌরবগীতিকা' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ এবং 'ভাগ্যচক্র', 'জয় পরাজয়', 'চিতোরোদ্ধার' প্রভৃতি নাটক ইনি রচনা করিয়াছেন। ইহা ভিন্ন বহু গানও ইঁহার দ্বারা রচিত হইয়াছে। ইঁহার কাব্যগ্রন্থাবলীর তৃতীয় খণ্ডে গানগুলি স্বরলিপি সহ প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রমথনাথ দত্ত—ইনি কলিকাতার সুকিয়া ষ্ট্রীটে বাস করিতেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ইনি ভারতকে স্বাধীন করিবার জন্য 'দাউদ আলি দত্ত' নাম ধারণ করিয়া ভারত হইতে ছদ্মবেশে রাশিয়ায় পলাইয়া যান। সেখানে গিয়া নানাভাবে ভারতের স্বাধীনতার জন্য কাজ করিতে থাকেন। ইনি বহু স্বদেশী সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন।

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র—কাশীতে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। আদি-নিবাস কলিকাতায়। কলিকাতায় ও ঢাকায় শিক্ষালাভের পর প্রথম জীবনে ইনি শিক্ষকতা করেন। ১৬ বৎসর বয়সে 'পাঁক' নামে প্রথম উপন্যাস

ও পরে 'প্রথমা' নামে প্রথম কবিতার বই প্রকাশিত হয়। ইনি 'কল্লোল যুগে'র প্রবর্ত্তকদের মধ্যে অন্যতম। বহু ছোট গল্প কবিতা ও উপন্যাস লিখিয়া ইনি প্রভূত খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। চিত্র পরিচালকরূপেও ইঁহার খ্যাতি আছে। শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও মুরলীধর বসুর সহায়তায় ইনি 'কালিকলম' নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ইহার পর ইনি বিভিন্ন সময়ে 'বাংলার কথা' ও 'বঙ্গবাণী' নামক দৈনিক পত্রিকার সহকারী সম্পাদক এবং 'সংবাদ' ও 'নবশক্তি' নামক দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকরূপে কার্য্য করেন। 'উপায়ন' 'মৃত্তিকা', 'মিছিল', 'বেনামী', 'বন্দর', 'কুয়াশা', 'পুতুল ও প্রতিমা', 'নিশীথ-নগরী', 'সম্রাট ও ফেরারী ফৌজ', 'সরস ও বিরস' নাটক ইঁহার প্রসিদ্ধ পুস্তক।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—২৪ পরগণা জেলার কাঁঠালপাড়া গ্রামে ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জুন জন্ম এবং ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ৮ই এপ্রিল মৃত্যু। পিতা—যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ইঁহার ছাত্রজীবন কৃতিত্বে অত্যন্ত উজ্জ্বল। ছাত্রাবস্থা হইতেই ইঁহার সাহিত্য-জীবনের সূত্রপাত হয়। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ইঁহার প্রথম কবিতা 'সংবাদ প্রভাকর'এ প্রকাশিত হয়। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বপ্রথম বি এ পরীক্ষায় ইনি বি এ উপাধি লাভ করিবার পরেই ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে কার্য্যে যোগদান করিয়া ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে উক্ত পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ইঁহার প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হওয়ায় ইঁহার খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ইঁহার সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হইয়া বাংলা সাহিত্যে যুগান্তর আনয়ন করে। 'প্রচার' নামক একখানি পত্রিকাও ইনি কিছুদিন প্রকাশ করেন। 'দুর্গেশনন্দিনী'র পর 'কপালকুণ্ডলা', 'মৃণালিনী', বিষবৃক্ষ', 'চন্দ্রশেখর', 'কমলাকান্তের দপ্তর', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'রাজসিংহ', 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধরাণী', 'সীতারাম' প্রভৃতি ইঁহার প্রণীত উপন্যাস ক্রমশঃ প্রকাশিত হয়। ইহাতে ইনি শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকরূপে পরিগণিত হন। 'বিজ্ঞানরহস্য', 'সাম্য', 'কৃষ্ণচরিত্র', 'বিবিধ প্রবন্ধ', 'ধর্ম্মতত্ত্ব' প্রভৃতি পুস্তকেও ইঁহার অসাধারণ নৈপুণ্য প্রকাশিত হইয়াছে। সাহিত্যের বহু ক্ষেত্রে ইনি পথিকৃৎ। সাধু ও চলিত ভাষার সমন্বয় সাধন করিয়া ইনি বাংলা গদ্যকে যথেষ্ট শক্তিশালী করিয়াছেন। ইঁহার রচিত 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতটি অন্যতর জাতীয় সঙ্গীতরূপে গৃহীত হইয়াছে।

বনফুল (শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়)—পূর্ণিয়া জেলার মণিহারী গ্রামে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে জন্ম (১৩০৬ বঙ্গাব্দের ৪ঠা শ্রাবণ)। আদিনিবাস হুগলী জেলার শিযাখালা গ্রামে। পিতা—সত্যচরণ মুখোপাধ্যায়। মণিহারী ও সাহেবগঞ্জ স্কুলে পাঠ শেষ করিয়া হাজারীবাগ কলেজ হইতে আই. এস. সি পাশের পর কলিকাতা মেডিকেল কলেজে ডাক্তারী পড়িতে থাকেন। পরে পাটনায় নূতন মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে সেস্থান হইতে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে এম. বি. বি. এস পাশ করিয়া ইনি কলিকাতায় ডাক্তারী ব্যবসা আরম্ভ করেন। ইহার পর মুর্শিদাবাদ জেলার আজিমগঞ্জ হাসপাতালে মেডিকেল অফিসার নিযুক্ত হন। বর্ত্তমানে ইনি ভাগলপুরে নিজ ক্লিনিকে চিকিৎসা-ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছেন। ইনি 'মালঞ্চ', 'পরিচারিকা', 'প্রবাসী' প্রভৃতি পত্রিকায় ছোট গল্প লিখিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। ডাক্তার হইলেও ইনি একজন সুসাহিত্যিক এবং 'বনফুল' এই ছদ্মনামে বিখ্যাত। 'জঙ্গম', 'স্থাবর', 'ভূয়োদর্শন', 'বৈতরণী তীরে', 'দ্বৈরথ', 'কিছুক্ষণ', 'মন্ত্রমুগ্ধ', 'বিদ্যাসাগর' ইত্যাদি ৭০ খানি পুস্তক ইনি রচনা করিযাছেন।

বরদাচরণ মিত্র—কলিকাতা কুমারটুলির মিত্রবংশে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে জন্ম ও ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু। আদিনিবাস নদীয়া জেলার চাকদহ গ্রামে। পিতা—বেণীমাধব মিত্র। পুত্রেষ্টি যজ্ঞের ফলে ইঁহার জন্ম হয়। ২০ বৎসর বয়সে ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইংরেজী সাহিত্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া এম. এ পাশ করেন। ২৪ বৎসর বয়সে প্রতিযোগিতামূলক 'ষ্ট্যাটুটারী সিভিল সার্ভিস' পরীক্ষায় ইনি বিশেষ কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ইনি দায়রা জজের পদে উন্নীত হন। ছাত্রাবস্থায় ইনি 'প্যারীচাঁদ মিত্র' ও 'কিশোরীচাঁদ মিত্রে'র জীবনী এবং পরে 'মেঘদূতে'র বঙ্গানুবাদ এবং 'অবসর' নামক একখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন।

বিজয়চন্দ্র মজুমদার—ফরিদপুর জেলার খানাকুল গ্রামে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে জন্ম ও ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু। প্রথম জীবনে ওকালতি ব্যবসা করিয়া ইঁহার প্রভূত খ্যাতি হয়। প্রত্নতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব ও গবেষণামূলক বহু পুস্তক রচনা করিয়া ইনি বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেন। 'ভারতী' ও 'প্রবাসী' প্রভৃতি পত্রিকায় ইঁহার অনেক কবিতা ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ইনি বহু দিন সম্বলপুরে ছিলেন। পরে ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। উড়িয়া, তেলেগু, তামিল প্রভৃতি ভাষাতেও ইঁহার দক্ষতা ছিল। চক্ষু চিকিৎসার জন্য ইনি একবার ইংলণ্ড গমন করেন; কিন্তু

তাহাতে কোন ফল না হওয়ায় ইনি ওকালতি ব্যবসা ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। অন্ধ হইয়াও ইনি কাব্যচর্চ্চা বন্ধ করেন নাই। 'কালিদাস', 'জীবনবাণী', 'হেঁয়ালি', 'ছিটেফোঁটা', 'যজ্ঞভস্ম', 'খেলাধূলা', 'রুচিরা', 'থেরীগাথা', 'গীতগোবিন্দ' প্রভৃতি ইঁহার রচিত পুস্তক।

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়—নদীয়া জেলার অন্তর্গত বড় আন্দুলিয়া গ্রামে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে জন্ম। ব্রিটিশ শাসনকালে রাজদ্রোহের অপরাধে ইনি কয়েকবার কারাবরণ করেন। দৈনিক 'লোকসেবক' ও পরে 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদকরূপে ইনি বহু দিন কাজ করেন। ইনি একবার বঙ্গীয় বিধান সভার সদস্যও নির্ব্বাচিত হন। ইঁহার গ্রন্থের মধ্যে 'সব হারাদের গান' ও 'রিয়ালিষ্ট রবীন্দ্রনাথ' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বিপিনচন্দ্র পাল—শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত পৈল গ্রামে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বর জন্ম ও ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ৬ই জ্যৈষ্ঠ কলিকাতায় মৃত্যু। পিতা—রামচন্দ্র পাল। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীহট্ট হইতে এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে এফ. এ পর্য্যন্ত পড়েন। পরে ইনি ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে কটক একাডেমীতে প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। পরে উহা ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া 'পরিদর্শক' নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালোরের একটি উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া গমন করেন। পরে উহা ত্যাগ করিয়া ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ইনি লাহোরের 'ট্রিবিউন' পত্রিকায় যোগ দেন। কিছু কাল উক্ত কার্য্য করিবার পর উহা পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতা কর্পোরেশনের লাইসেন্স বিভাগের চাকরীতে যোগ দেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংস্পর্শে আসিয়া বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ইনি আদালত অবমাননার অভিযোগে ছয় মাস কারাদণ্ড ভোগ করেন। পরে 'বেঙ্গলী' পত্রিকার সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। ইনি ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড হইতে 'স্বরাজ' পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ইনি ভারতে ফিরিলে রাজদ্রোহের অভিযোগে ইঁহার এক মাস কারাদণ্ড হয়। ইনি একজন প্রসিদ্ধ দেশনেতা, অসাধারণ বাগ্মী ও সাহিত্যিক ছিলেন। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ইঁহার 'সত্য ও মিথ্যা' গল্প প্রকাশিত হয়। শেষ জীবনে ইনি 'সত্তর বৎসর' নামক একখানি আত্মজীবনী লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্তু উহা সমাপ্ত করিতে পারেন নাই।

বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়—নদীয়া জেলার মেটিরী গ্রামে ১৭৫৪

শকাব্দের ২৮শে চৈত্র জন্ম ও ১৩০৮ বঙ্গাব্দের ২৪শে ফাল্গুন মৃত্যু। ইনি মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে বাস করিতেন। শৈশবেই ইঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। ইনি বাল্যকাল হইতেই কবিতা রচনায় পারদর্শী ছিলেন। পরিণত বয়সে ইনি একজন ভক্ত ও ভাবুক কবিরূপে বিখ্যাত হন। 'রামবাল্য-লীলামৃত', 'গীতিমালা' ও 'কুলকন্যার দ্বিরাগমন' ইঁহার রচিত গ্রন্থ।

বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী—কলিকাতার নিমতলা পল্লীতে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ২১শে মে জন্ম ও ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ২৪শে মে মৃত্যু। পিতা—দীননাথ চক্রবর্ত্তী। ১০ বৎসর বয়স হইতে ১৫ বৎসর বয়সের মধ্যে কয়েক মাসের জন্য জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনষ্টিটিউসনে লেখাপড়া করেন। পরে তিন বৎসর ইনি সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করেন ও পৌরোহিত্য ব্যবসায় করিতে থাকেন। পাঠ্যাবস্থা হইতেই ইনি কবিতা রচনা আরম্ভ করেন আর বাল্যকাল হইতেই সঙ্গীত ও বাদ্যযন্ত্র-শিক্ষায় পারদর্শিতা অর্জ্জন করেন। বাংলা, সংস্কৃত ও ইংরেজী সাহিত্যে ইঁহার প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল। ইনি 'পূর্ণিমা', 'সাহিত্য-সংক্রান্তি', 'অবোধবন্ধু' প্রভৃতি কয়েকখানি পত্রিকা পরিচালনা করেন। ইনি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কাব্যগুরু ছিলেন। 'সঙ্গীতশতক', 'মায়াদেবী', 'সারদামঙ্গল', 'বঙ্গসুন্দরী' ও 'নিসর্গ সন্দর্শন' প্রভৃতি ইঁহার রচিত কাব্যগ্রন্থ।

ভুবনমোহন বসু—বরিশাল জেলার মৈশানী গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বহু স্বদেশাত্মক সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন।

ভূষণ দাস—বিখ্যাত যাত্রাদলের অধিকারী। স্বদেশী আন্দোলনের সময় ইঁহার পরিচালিত যাত্রার দল বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে যাত্রাভিনয় করিত। ইনি সম্ভবতঃ হুগলী জেলার অধিবাসী ছিলেন।

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়—কলিকাতার ভবানীপুর অঞ্চলে ১২৯৫ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে জন্ম ও ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে মৃত্যু। পিতা—অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। ইনি সাউথ সুবার্ব্বন স্কুল হইতে এনট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করিয়া ডফ কলেজ হইতে বি. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ইনি সিমলার ফিনান্স ডিপার্টমেণ্টে কার্য্য আরম্ভ করেন। পরে উক্ত কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর কলিকাতায় আসিয়া 'কান্তিক প্রেস' স্থাপন করেন। এই স্থান হইতেই 'ভারতী' পত্রিকা প্রকাশিত হইতে থাকে এবং ইনি উহার সম্পাদক নিযুক্ত হন। ইনি 'ইণ্ডিয়ান পাব্‌লিশিং হাউস'-এরও অংশীদার ছিলেন। 'ঝাঁপি' 'আলপনা' প্রভৃতি

১০ খানি ছোট গল্পের পুস্তক, 'মুক্তার মুক্তি' নামক নাটক, 'মনে মনে' ও 'ভাগ্যচক্র' উপন্যাস, 'ভূতুড়ে কাণ্ড' ও 'ভারতীয় বিদুষী' ইঁহার রচনা। ইনি বহু স্বদেশী সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। 'চালচিত্র' ও 'নাচঘর' প্রভৃতি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ইঁহার রচনাবলী প্রকাশিত হইয়াছে। ইনি প্রথমে শিশিরকুমার ভাদুড়ীর সহকর্ম্মী ছিলেন।

মনোমোহন চক্রবর্ত্তী—ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কোটালিপাড়া পরগণার বালিয়াভাঙ্গা গ্রামে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ২৬শে ডিসেম্বর জন্ম এবং ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের ৩রা অক্টোবর মৃত্যু। পিতা—মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। বাল্যকাল হইতেই ইঁহার সঙ্গীতে অনুরাগ ছিল। ইনি ঢাকা হইতে নর্ম্মাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে বরিশাল ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। একাদিক্রমে উক্ত বিদ্যালয়ে ১৮ বৎসর কার্য্য করিবার পর ১৯০১ খৃষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করিয়া ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে বরিশাল সহরেই ইনি গ্রামীণ ধর্ম্মপ্রচারকের পদে নিযুক্ত হন। ইনি জীবনে প্রায় দুই হাজার গান রচনা করিয়াছেন। ইঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর নাম—'অর্ঘ্য', 'শিক্ষা', 'সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন', 'কীর্ত্তন ও বন্দনা', 'বিবিধ সঙ্গীত'।

মনোমোহন বসু—যশোহর জেলার নিশ্চিন্তপুর গ্রামে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই জন্ম এবং ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী মৃত্যু। আদিনিবাস ২৪ পরগণা জেলার ছোট জাগুলিয়া গ্রামে। পিতার নাম দেবনারায়ণ বসু। ইনি হেয়ার স্কুল এবং জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ কলেজে অধ্যয়ন করেন। ছাত্রাবস্থায় ইনি একবার প্রবন্ধ লিখিয়া স্বর্ণপদক ও পুস্তক লাভ করেন। প্রথমে ইনি 'সংবাদ বিভাকর' নামক পত্রিকা বাহির করেন। পরে 'মধ্যস্থ' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়া কিছুদিন পরে উহাকে পাক্ষিক ও মাসিকে রূপান্তরিত করেন। ইনি বাউল, কীর্ত্তন ও যাত্রাগান রচনায় নিপুণ ছিলেন। ইঁহার রচিত নাটকাবলীর নাম—'রামাভিষেক', 'সতী', 'পার্থপরাজয়', 'আনন্দময়', 'প্রণয়পরীক্ষা', 'হরিশ্চন্দ্র', 'রাসলীলা'। 'দুলীন' নামক উপন্যাস ও 'পদ্যমালা' প্রভৃতি বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক ইঁহার রচনা।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত—যশোহর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারী জন্ম এবং ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জুন আলিপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ে মৃত্যু। পিতার নাম রাজনারায়ণ দত্ত এবং মাতার নাম জাহ্নবী। ইনি অসাধারণ প্রতিভাশালী ছাত্র ছিলেন। ছাত্রজীবনে (১৮৪৩ খৃঃ)

খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া 'মাইকেল' উপাধি ধারণ করেন। ইনি প্রথমে ইংরেজীতে কাব্যরচনা আরম্ভ করেন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজ হইতে দেশে ফিরিয়া বেলগাছিয়া নাট্যশালায় রামনারায়ণ তর্করত্নের বাংলায় 'রত্নাবলী' নাটকের অভিনয় দেখিয়া (৩১শে জুলাই, ১৮৫৮ খৃঃ) বাংলা ভাষায় নাটক রচনা আরম্ভ করেন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ইঁহার 'শর্ম্মিষ্ঠা' নাটক প্রকাশিত হয়। অমিত্রাক্ষর ছন্দ, চতুর্দ্দশপদী কবিতা এবং বিশেষ একপ্রকার গদ্যরীতির প্রবর্ত্তকরূপে বাংলা সাহিত্যে ইনি চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ইনি ইংলণ্ডে গমন করিয়া ব্যারিষ্টারী পড়িতে আরম্ভ করেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ইনি ভার্সাই নগরে যান এবং সেখানেই চতুর্দ্দশ পদাবলী কবিতা রচনা করিয়া তাহা প্রকাশের জন্য কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন। এই সময়ে ফ্রান্সে গিয়া ইনি অত্যন্ত অর্থকষ্টে পড়েন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তখন ইঁহাকে অর্থ সাহায্য করেন। পরে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ইনি পঞ্চকোটের মহারাজের আইন-উপদেষ্টা নিযুক্ত হন। ইঁহার রচিত বাংলা ও ইংরেজী পুস্তকসমূহ যথা—'একেই বলে সভ্যতা', 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ', 'পদ্মাবতী' নাটক, 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্য, 'মেঘনাদবধ' কাব্য, 'বীরাঙ্গনা' কাব্য, 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্য, 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক, 'চতুর্দ্দশপদী কবিতা', 'হেক্টরবধ', 'মায়াকানন', 'The Captive Lady', 'The Anglosaxon and the Hindu', 'Ratnavali', 'Sarmistha', 'Nildarpan or the Indigo Planting Mirror'.

মানকুমারী বসু—যশোহর জেলার শ্রীধরপুরস্থ মাতুলালয়ে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ১৩ই মাঘ রাত্রিতে জন্ম এবং ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু। পিতৃনিবাস যশোহর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামে। পিতা—আনন্দমোহন দত্ত চৌধুরী। বাল্যকাল হইতে ইনি নিজের চেষ্টায় কবিত্বশক্তি অর্জ্জন করেন। স্বামীর মৃত্যু হইলে ইনি একাগ্রমনে সাহিত্য ও সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া নিয়মিত ভাবে 'সখা' ও 'বামাবোধিনী পত্রিকা'য় লিখিতে আরম্ভ করেন। ছোট গল্প প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়া ইনি 'কুন্তলীন' পুরস্কার পান। 'বামাবোধিনী পত্রিকা'র রৌপ্যজয়ন্তী উপলক্ষে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় 'বনবাসিনী' নামক এক ক্ষুদ্র উপন্যাস লিখিয়া ইনি ত্রিশ টাকা পুরস্কার লাভ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইনি ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম 'ভুবনমোহিনী' স্বর্ণপদক ও ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে 'জগত্তারিণী' সুবর্ণপদক লাভ

করেন। 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি', 'কনকাঞ্জলি' ও 'সোনার সাথী' প্রভৃতি ইঁহার রচিত কাব্যগ্রন্থ।

মুকুন্দ দাস—ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত বানারি গ্রামে ১২৮৫ বঙ্গাব্দে জন্ম এবং ১৩৪১ বঙ্গাব্দের ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ কলিকাতায় মৃত্যু। ইঁহার পিতৃদত্ত নাম যজ্ঞেশ্বর দে। পিতা—গুণদয়াল দে, মাতা—শ্যামাসুন্দরী দে। বন্যার জলে পিতৃগৃহ ভাসাইয়া নিলে পিতামাতা বরিশালে চলিয়া আসেন। ইনি বরিশালের ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িবার পর উহা ত্যাগ করিয়া মুদীর দোকান করেন। তাহার পর ইনি 'রামানন্দ অবধূত' নামক জনৈক বৈষ্ণবের নিকট দীক্ষা নিলে তিনিই উঁহার 'মুকুন্দ দাস' এই নামকরণ করেন। পরে ইনি বরিশাল কালীবাড়ীর সোনা ঠাকুরের নিকট শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ইনি নানাস্থানে স্বদেশী গান গাহিয়া বেড়াইতে থাকেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে "আমি দশ হাজার প্রাণ"* এই গানের জন্য ইঁহার আড়াই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হইলে ইঁহাকে দিল্লী সেণ্ট্রাল জেলে পাঠান হয়। সেখানে ইঁহাকে ঘানি টানিতে হয়। মুক্তির পর ইনি বাংলার নানাস্থানে স্বদেশী গান গাহিয়া বেড়াইতে থাকেন। অশ্বিনীকুমার দত্ত ও নেতাজীর সহিত ইঁহার বিশেষ সখ্যতা ছিল। 'মাতৃপূজা' ইঁহার প্রথম প্রকাশ্য যাত্রাভিনয়। ভারতীয়দের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিবার জন্য ইনি বরিশাল সহরের উপকণ্ঠে কাশীপুর গ্রামে আনন্দময়ী আশ্রম স্থাপন করিয়া তাহাতে প্রচুর অর্থব্যয়ে এক কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ইঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর নাম—'মাতৃপূজা', 'পথ', 'সাথী', 'সমাজ', 'পল্লীসেবা', 'ব্রহ্মচারিণী' ও 'কর্ম্মক্ষেত্র।'

মোহিতলাল মজুমদার—২৪ পরগণা জেলার কাঁচরাপাড়াস্থ মাতুলালয়ে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ২৬শে অক্টোবর জন্ম ও ১৯৫২ খৃষ্টাব্দের ২৬শে

---

* সম্পূর্ণ গানটি—

"আমি দশ হাজার প্রাণ যদি পেতাম
তবে ফিরিঙ্গি বণিকের গৌরব-রবি
অতল জলে ডুবিয়ে দিতাম।
শোন সব ভাই স্বদেশী
হিন্দু-মোসলেম ভারতবাসী,
পারি কি-না ধরতে অসি
জগৎকে তা দেখাইতাম।"

জুলাই মৃত্যু। পিতৃনিবাস হুগলী জেলার বলাগড় গ্রামে। পিতা—নন্দলাল মজুমদার। ইনি বাল্যে হালিসহরে ও পরে বলাগড়ের উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় হইতে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে এনট্রান্স এবং ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর কলেজ হইতে বি. এ পাশ করিয়া কিছুকাল শিক্ষকতা করেন। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার তৃতীয় পর্য্যায়ের সম্পাদনা ও প্রকাশনা ইঁহা দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। ইনি একাধারে সুকবি ও সাহিত্য-সমালোচক ছিলেন। ইঁহার রচিত গ্রন্থ—'স্বপনপসারী', 'বিস্মরণী', 'স্মরগরল', 'হেমন্ত-গোধূলি', 'কবি শ্রীমধুসূদন', 'সাহিত্য-বিতান', 'রবি-প্রদক্ষিণ', 'আধুনিক সাহিত্য', 'বিবিধ প্রবন্ধ', 'শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র' প্রভৃতি।

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য—রাজসাহী জেলার নওগাঁ মহকুমার বলিহার গ্রামে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ২৭শে মে জন্ম। পিতা—রোহিণীপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য। ইনি স্থানীয় বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মেট্রোপলিটান কলেজে এফ. এ পর্য্যন্ত শিক্ষা করেন। ইহার পর ১৩২৫ বঙ্গাব্দের ২০শে অগ্রহায়ণ ময়মনসিংহ জেলার গৌরীপুর ষ্টেটে সদর নায়েব হিসাবে নিযুক্ত হন এবং ক্রমশঃ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট পদে উন্নীত হইয়া ১৩৬০ বঙ্গাব্দে অবসর গ্রহণ করিয়া বর্ত্তমানে কলিকাতায় বাস করিতেছেন। ছান্দসিক কবি হিসাবে ইনি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। 'মর্ম্মগাথা', 'হাসির হল্লা', 'ছায়াপথ', 'রামধনু', 'নভোরেণু', 'সংস্কৃত ছন্দের বাংলা রূপ' ইঁহার রচিত গ্রন্থাবলী।

যতীন্দ্রমোহন বাগচী—নদীয়া জেলার জমসেরপুরের বিখ্যাত জমিদারবংশে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ২৭শে নভেম্বর জন্ম ও ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারী কলিকাতায় মৃত্যু। জন্মস্থান মুর্শিদাবাদ জেলার খাগড়া গ্রামে। পিতা—হরমোহন বাগচী। বাল্যকাল হইতেই কবিতা লিখিয়া এবং তাহা 'ভারতী' ও 'সাহিত্য' প্রভৃতি বিখ্যাত মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া ইনি প্রভূত খ্যাতি অর্জ্জন করেন। কাহিনীমূলক কবিতা লিখিতে ইনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। রবীন্দ্রোত্তরযুগে ইনি একজন শক্তিশালী কবিরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। কিছুকাল ইনি 'মানসী', 'যমুনা' ও 'পূর্ব্বাচল' পত্রিকার সম্পাদকরূপে কার্য্য করেন। ইঁহার রচনায় ছন্দের বৈচিত্র্য, প্রকাশভঙ্গীর নবীনতা এবং ভাষার মাধুর্য্য দেখা যায়। 'রেখা', 'লেখা', 'নাগকেশর', 'অপরাজিতা', 'জাগরণী',

'নীহারিকা', 'মহাভারতী', 'পাঞ্চজন্য', 'কাব্যমালঞ্চ' প্রভৃতি ইঁহার রচিত কাব্যগ্রন্থ।

যোগীন্দ্রনাথ বসু—২৪ পরগণা জেলার নিতাড়া গ্রামে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে জন্ম ও ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু। বি. এ পাশ করিবার পর দেওঘর (সাঁওতাল পরগণা) হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষকরূপে কার্য্যে যোগদান করেন। পরে উহা ত্যাগ করিয়া কুমার (পরে রাজা) প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন। এই সময় হইতেই ইনি প্রকৃতভাবে সাহিত্যরচনা আরম্ভ করেন। ইনি একজন সুকবি ও সুসাহিত্যিক ছিলেন। স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়প্রমুখ মনীষিগণ ইঁহাকে 'কবিভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করেন। ইঁহার রচিত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি বিশেষ প্রসিদ্ধ—'পৃথ্বীরাজ', 'শিবাজী', 'অহল্যাবাঈ', 'তুকারাম', 'দেববালা', 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত'।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত মুলচর গ্রামে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে জন্ম। পিতা—মহেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত। ইনি বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করিয়া ময়মনসিংহ জেলার গোলকপুরের জমিদার উপেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরীর কর্ম্মচারী নিযুক্ত হন। পরে কালীপুরের জমিদার ধরণীকান্ত লাহিড়ী চৌধুরীর ষ্টেটে কার্য্য করিবার সময় ইনি 'আনারকলি' নামে একখানি নাটিকা লিখিয়া প্রশংসা অর্জ্জন করেন। পরে উক্ত জমিদারের মহীরামপুর কাছারীতে কিছুকাল নায়েবী করেন। তাহার পর উক্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ঢাকা জগন্নাথ কলেজে বাংলা ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। অধ্যাপনা কার্য্য করিবার সময় ইনি 'বিক্রমপুরের ইতিহাস' নামক পুস্তক রচনা করিয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। উক্ত কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বর্ত্তমানে ইনি কলিকাতায় বাস করিতেছেন। 'শিশুভারতী' সম্পাদনাই ইঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। 'হিমালয় অভিযান' ও 'বঙ্গের মহিলা কবি' ইঁহার রচিত উল্লেখযোগ্য পুস্তক।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—বর্দ্ধমান জেলার বাঁকুলিয়া গ্রামে ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে জন্ম এবং ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু। পিতার নাম রামনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বাল্যকাল হইতেই ইঁহার কবিতা রচনায় অনুরাগ ছিল। ইনি কয়েক বৎসর 'এডুকেশন গেজেট'-এর সহকারী সম্পাদক এবং 'রসসাগর' নামে একখানি পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ইনি প্রথমে আয়কর বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন, পরে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন।

ইনি একজন সুপণ্ডিত এবং বহু ভাষায় ইঁহার অধিকার ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় ইঁহার কবিতাসমূহ প্রকাশিত হইত। ইনি কয়েকখানি প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক পুস্তক রচনা এবং একখানি ইংরেজী কাব্যগ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেন। ইঁহার রচিত কাব্যগ্রন্থসমূহের নাম—'পদ্মিনা উপাখ্যান', 'কর্ম্মদেবী', 'কাঞ্চনকাবেরী', 'শূরসুন্দরী'।

রজনীকান্ত সেন—পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত ভাঙ্গাবাড়ী গ্রামে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জুলাই জন্ম ও ১৯১০ খৃষ্টাব্দের ১৩ই সেপ্টেম্বর কলিকাতায় মৃত্যু। পিতা—গুরুপ্রসাদ সেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে রাজসাহী স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দশ টাকা ছাত্রবৃত্তি পান। ইহার পূর্ব্বে রাজসাহী জেলার মধ্যে ইংরেজী রচনার প্রতিযোগিতায় প্রথম হইয়া মাসিক পাঁচ টাকা বৃত্তি লাভ করেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে এফ. এ, ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে সিটি কলেজ হইতে বি. এ এবং ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে উক্ত কলেজ হইতে বি এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পর ইনি রাজসাহী কোর্টেই ওকালতি করিতে থাকেন; কিন্তু বাল্যকাল হইতে সঙ্গীত ও সাহিত্যে অনুরাগ থাকায় কোনদিনই ওকালতিতে ইঁহার প্রতিপত্তি হয় নাই। ১৩০৪ বঙ্গাব্দে রাজসাহী হইতে প্রকাশিত 'উৎসাহ' পত্রিকায় ইঁহার বহু কবিতা ও সঙ্গীত প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে স্বদেশী আন্দোলনের সময় ইঁহার গানসমূহ দেশে এক অভূতপূর্ব্ব উন্মাদনার সঞ্চার করে। সুললিত সঙ্গীত ও কবিতা রচনার জন্য ইনি 'কান্তকবি' নামে পরিচিত হন। ইঁহার রচিত গ্রন্থসমূহ—'বাণী', 'কল্যাণী', 'অমৃত', 'আনন্দময়ী', 'বিশ্রাম', 'অভয়', 'সদ্ভাবকুসুম', 'শেষদান।'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ৭ই মে জন্ম ও ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ৭ই আগষ্ট মৃত্যু। পিতা—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ইনি কলেজে না পড়িলেও পিতার এবং নিজের চেষ্টায় স্বাধীনভাবে এরূপ শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন যে, দেশের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণের সমান কিংবা তদপেক্ষাও অধিক বিদ্যা ইনি আয়ত্ত করেন। বাল্যকাল হইতেই ইনি কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। ইংরেজীতে 'গীতাঞ্জলি' রচনার জন্য ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ইনি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কবি হিসাবে পরিগণিত হইয়া জগদ্বিখ্যাত 'নোবেল পুরস্কার' লাভ করেন। ইঁহার প্রতিভা ছিল সহস্রমুখী। উপন্যাস, নাটক, কবিতা, গান, প্রবন্ধ, ছোট গল্প, শিশুসাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে ইনি তিন শতাধিক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। চিত্রাঙ্কনেও শেষ-

বয়সে ইনি বিস্ময়কর প্রতিভার পরিচয় দিয়া সমগ্র পৃথিবীকে চমৎকৃত করেন। কিশোর বয়সে ইঁহার 'সন্ধ্যা-সঙ্গীত' প্রকাশিত হইলে বঙ্কিমচন্দ্র ইঁহাকে নিজের গলার মালা পরাইয়া সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। ইঁহার রচিত গানের সংখ্যা দুই হাজারেরও বেশী। একটি জীবনে প্রায় সকল বিষয়ে এত রচনা পৃথিবীতে আর কাহারও নাই। প্রাচীন ঋষিদের আশ্রমের অনুকরণে ইনি বোলপুরে পিতৃদেব প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতনে 'বিশ্বভারতী' নামক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এই বিশ্বভারতী বর্ত্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে বিশ্ববিদ্যালয়রূপে পরিগণিত হইয়াছে। ইনি বহু বিখ্যাত স্বদেশী সঙ্গীত রচনা করেন। ইঁহারই রচিত "জনগণমন অধিনায়ক" গানটি ভারতের অন্যতর জাতীয় সঙ্গীত। ইনি পৃথিবীর বহু বিখ্যাত দেশেও সম্বর্দ্ধিত হন। জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ইনি স্যর উপাধি ত্যাগ করেন। জাতিগঠনমূলক কার্য্যেও ইনি দুর্লভ দূরদৃষ্টি এবং বিস্ময়কর কর্ম্মকুশলতা ও অধ্যবসায়ের পরিচয় দেন। কুটীর শিল্প, কারিগরি-শিক্ষা, পল্লীসংগঠনমূলক শিক্ষা প্রভৃতির কেন্দ্র শ্রীনিকেতন রবীন্দ্রনাথের এক মহৎ কীর্ত্তি। ইনি জগতের সর্ব্বকালের কবিকুলের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। ইনি কেবল কবি নন, পৃথিবীর মনীষীদেরও অন্যতম।

রমণীমোহন ঘোষ—রাজসাহী জেলায় ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে জন্ম এবং ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর কলিকাতায় মৃত্যু। পাঠ্যাবস্থায় যদুনাথ সরকারের সহযোগিতায় ইডেন হিন্দু হোষ্টেল হইতে সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ করিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করেন। ইনি উত্তর জীবনে কলিকাতার ডেপুটি পোষ্টমাষ্টার জেনারেল এবং পরে দিল্লীতে গিয়া ডাক বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল পদে নিযুক্ত হন। ইনি বহু স্বদেশী সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। বহু সাময়িক পত্র-পত্রিকায় ইঁহার কবিতাসমূহ প্রকাশিত হইয়াছে। ইঁহার রচিত কাব্যগ্রন্থের নাম—'ঊর্ম্মিকা'।

রাইচরণ বিশ্বাস—বরিশাল জেলার কলসকাঠী গ্রামে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে জন্ম ও ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের বিজয়া দশমীর দিন মৃত্যু। পিতা—দুর্গাচরণ বিশ্বাস। ইনি কলসকাঠী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় হইতে এন্‌ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে কলিকাতা ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুল হইতে ডাক্তারী পাশ করিয়া সরকারী চাকরী গ্রহণ করেন; কিন্তু মাতার অসুখের জন্য ছুটি মঞ্জুর না হওয়ায় উক্ত চাকরী ত্যাগ করিয়া মাতার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত

হন। পরে বরিশাল জেলা বোর্ডের ডাক্তার নিযুক্ত হইয়া বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে ইনি সক্রিয়ভাবে যোগদান করিয়া বহু স্বদেশী গান রচনা করেন। শেষজীবনে কিছুদিন বরিশাল নলছিটি দাতব্য চিকিৎসালয়ে চাকরী করেন। পরে ঐ চাকরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বরিশালের কাউনিয়া গ্রামে বাসকালে ইঁহার শেষনিশ্বাস ত্যাগ হয়। ইনি কোন পুস্তকাদি রচনা করেন নাই।

রাজকৃষ্ণ রায়—বর্দ্ধমান জেলার মাহাতো রামচন্দ্রপুর গ্রামে ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ২১শে অক্টোবর জন্ম এবং ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ১১ই মার্চ্চ মৃত্যু। তিনি জীবিকা অর্জ্জনের জন্য প্রথমে 'বাঙ্গালা যন্ত্রে' (নিউ বেঙ্গল প্রেসে) যোগদান করেন। পরে 'আলবার্ট প্রেসে'র ম্যানেজার নিযুক্ত হন। ইঁহার রচিত পুস্তকসমূহ 'আর্য্যদর্শন' 'বঙ্গমহিলা' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ইনি 'বীণা' ও 'সমাজদর্পণ' নামে মাসিক পত্রিকা এবং 'বীণা' থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি কাব্য, নাটক, গল্প, প্রহসন ও উপন্যাস প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েরই পুস্তক রচনা করিয়াছেন। ইনি রামায়ণ (১৮৭৭-৮৫ খৃঃ) ও মহাভারতের (১৮৮৬-৯১ খৃঃ) পদ্যানুবাদ করেন। ভঙ্গ-অমিত্রাক্ষর ছন্দ ইঁহা দ্বারা উদ্ভাবিত হয়। কবিগুরুর পর এত অধিক সংখ্যক বাংলা পুস্তক আর কেহ রচনা করেন নাই। ইঁহার রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ—'পতিব্রতা', 'তরণীসেনবধ', 'দ্বাদশ গোপাল', 'বামনভিক্ষা', 'নাট্যসম্ভব', 'লয়লামজনু', 'হিরণময়ী', 'কিরণময়ী', 'শ্মশান ও জীবন', 'অবসর-সরোজিনী', 'কবিতাকৌমুদী', 'মীরাবাঈ', 'চমৎকার', 'নিভৃত-নিবাস', 'আগমনী', 'গিরি-সন্দর্শন' ইত্যাদি।

রাধানাথ মিত্র—হুগলী জেলার অন্তর্গত জেজুর গ্রামে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে জন্ম এবং ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু। ইনি কলিকাতার দর্জ্জিপাড়া অঞ্চলে বাস করিতেন। প্রথমে ইনি শীলস্ ফ্রি কলেজের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। উক্ত কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণের পর স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়ীতে কার্য্য করেন। ইনি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের শেষ-ছাত্র ছিলেন। বহু স্বদেশাত্মক গান ইনি রচনা করিয়াছেন। 'গীতিনাট্যাবলী' ইঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ। 'অপূর্ব্ব কাহিনী', 'আগমনী বিজয়া', 'আশালতা', 'উষাহরণ', 'কমলে কামিনী', 'কাণাকড়ি', 'প্রণয়-পারিজাত', 'ভাগ্যলক্ষ্মী', 'মায়াবতী', 'হুকুমচাঁদ', 'ঘরের ছবি', 'মোহিনী' প্রভৃতি বহু নাটক, উপন্যাস ও কাব্য ইনি রচনা করিয়াছেন।

রামচন্দ্র দাশগুপ্ত—বরিশাল জেলার গৌরনদী থানার অন্তর্গত মাহিলারা গ্রামে ১২৮৫ বঙ্গাব্দে জন্ম এবং ১৩২৬ বঙ্গাব্দের ৫ই শ্রাবণ, বুধবার মৃত্যু। পিতা—গোবিন্দচন্দ্র দাশগুপ্ত। তিনি বি. এম. স্কুল হইতে এন্‌ট্রান্স পাশ করিয়া ব্রজমোহন কলেজে এফ. এ পর্য্যন্ত শিক্ষালাভ করেন। ইহার পর ইনি বি. এম. স্কুলেই শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত হন। পরে রাজনৈতিক কারণে উক্ত বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া শোলক-বাটাজোড় হাই স্কুলে কার্য্যভার গ্রহণ করেন। বিদ্যালয়ে কার্য্য করিবার সময়ে ইনি স্বদেশী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগদান করিয়া বহু স্বদেশী সঙ্গীত রচনা করেন। ইনি অসাধারণ বক্তা এবং অশ্বিনীকুমার দত্তের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। 'জাগরণ', 'দীক্ষা' ও 'দৈববাণী' এই তিনখানি পুস্তক ইঁহার ১৮ বৎসর বয়সে রচিত।

রামনিধি গুপ্ত (নিধিরাম গুপ্ত)—হুগলী জেলার পাণ্ডুয়ার অন্তর্গত চাঁপতা গ্রামে ১১৪৮ বঙ্গাব্দে জন্ম ও ১২৪৫ বঙ্গাব্দের ২১শে চৈত্র মৃত্যু। পিতা—হরিনারায়ণ গুপ্ত। পিতা বর্গীর ভয়ে আদিনিবাস কলিকাতার কুমারটুলি অঞ্চল পরিত্যাগ করিয়া যান। গ্রাম্য বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শেষ করিয়া ইনি কিছুকাল কলিকাতার কোন পাদরীর নিকট অর্থকরা বিদ্যা অর্জ্জন করেন। ইহার পর দশসালা বন্দোবস্তের সময় বিহারের ছাপরা জেলায় (১৭৭৬ খৃঃ) কালেক্টরী অফিসে ১৮ বৎসর কার্য্য করেন। ঐ সময় ইনি পশ্চিমী কলাবতের নিকট হিন্দীগান শিক্ষা করিয়া বিশেষ দক্ষতা অর্জ্জন করেন। পরে পুত্রের শিক্ষার জন্য ৫৩ বৎসর বয়সে (১৭৯৪ খৃঃ) পুনরায় কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। তখন হইতেই ইঁহার সঙ্গীত-জীবন আরম্ভ হয়। ইনি বাংলাদেশে টপ্পাগানের প্রথম প্রচলনকর্ত্তা, আদি টপ্পাগায়ক ও বাংলা টপ্পা-গানের রচয়িতারূপে চিরস্মরণীয়। ৯৬ বৎসর বয়সে স্বরচিত গানের সঙ্কলনগ্রন্থ 'গীতরত্ন' স্বয়ং ভূমিকা লিখিয়া প্রকাশ করেন।

শিবনাথ শাস্ত্রী (ভট্টাচার্য্য)—২৪ পরগণা জেলার চাংড়িপোতা গ্রামে মাতুলালয়ে ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের ৩১শে জানুয়ারী জন্ম এবং ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ২৩শে সেপ্টেম্বর মৃত্যু। আদিনিবাস ২৪ পরগণার মজিলপুর গ্রামে। পিতা—হরানন্দ বিদ্যাসাগর (ভট্টাচার্য্য)। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে এফ. এ পাশ করার পর ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজ হইতে সংস্কৃতে এম. এ পাশ করিয়া 'শাস্ত্রী' উপাধি লাভ করেন। ইনি 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' নাম দিয়া নূতন একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন এবং উহার সভাপতি হন। ছাত্রাবস্থা

হইতেই ইনি সাহিত্যচর্চ্চা করিতেন। ইনি যোগ্যতার সহিত কিছুদিন 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকা সম্পাদন করেন। তাহার পর ইনি 'সমদর্শী' নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ইহার মধ্যে কলিকাতার কয়েকটি বিদ্যালয়ে যোগ্যতার সহিত শিক্ষকতাও করেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ইনি ইংলণ্ড ভ্রমণে যান। ইঁহার রচিত 'আত্মচরিত' এবং 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থ দুইখানি বঙ্গ সংস্কৃতির ইতিহাসে অসামান্য দানরূপে পরিগণিত হইয়াছে। ইঁহার রচিত গ্রন্থসমূহ—'পুষ্পমালা', 'পুষ্পাঞ্জলি', 'হিমাদ্রি', 'কুসুম', 'ছায়াময়ী', 'পরিণয়' ও 'নির্ব্বাসিতের বিলাপ', 'মেজবৌ', 'নয়নতারা', 'বিধবার ছেলে', 'যুগান্তর'। প্রবন্ধাবলী—'প্রবন্ধমালা', 'ধর্ম্মজীবন', 'গৃহধর্ম্ম'।

শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার বিশ্বাস—বরিশাল জেলার অন্তর্গত বানারিপাড়া থানার অধীন ইলুহার গ্রামে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ১২ই সেপ্টেম্বর জন্ম। জন্মস্থান—হোগলকুড়িয়া গলি, কলিকাতা। পিতা—দেবেন্দ্রলাল বিশ্বাস। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইংরেজী সাহিত্যে এম. এ পাশ করিবার পর চাকরী, শিক্ষকতা, সাংবাদিকতা, ব্যবসায, পত্রিকা-সম্পাদন, রেডিওতে কবিতা পাঠ প্রভৃতি করেন। কিছুদিন ময়মনসিংহ জেলার ভুঁইযাপুর কলেজের অধ্যক্ষও ছিলেন। 'আমরা বাঙ্গালা', 'সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান', 'Samsad Anglo Bengali Dictionary' ও 'বর্ষপঞ্জী' সম্পাদনা ইঁহার উল্লেখযোগ্য পুস্তক।

শৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য—মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরের অন্তর্গত কাশিমবাজারে ১২৯৪ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে শ্রীপঞ্চমীর দিন জন্ম ও ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দেব ২৫শে আগষ্ট ঢাকুরিযায় মৃত্যু। পিতা—রমাপতি তর্কভূষণ। পিতা কাশিমবাজার-রাজের সভাপণ্ডিত ছিলেন। ইনি বাল্যকাল হইতেই কবিতা লিখিতেন। ১৩১০ বঙ্গাব্দ হইতে ইঁহার কবিতাসমূহ বিভিন্ন মাসিক পত্রিকা ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইতে থাকে। এই সময় ইঁহার কবি-খ্যাতি চারিদিকে বিস্তৃত হয। ইনি কযেকটি স্বদেশী সঙ্গীতও রচনা করেন। ইনি একজন দক্ষ চিত্রকরও ছিলেন। বৃদ্ধবয়সে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও ভারত সরকারের নিকট হইতে ইনি মাসিক সাহিত্যবৃত্তি লাভ করেন। 'ছন্দা', 'মন্দাকিনী', 'নির্ম্মাল্য', 'পদ্মরাগ', 'বাংলাব বাঁশী' প্রভৃতি ইঁহার রচিত গ্রন্থ।

সজনীকান্ত দাস—বর্দ্ধমান জেলার বেতালবন গ্রামে ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ২৫শে আগষ্ট জন্ম ও ১৯৬২ খৃষ্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারী মৃত্যু। আদিনিবাস

বীরভূম জেলার রাইপুর গ্রামে। পিতা—হরেন্দ্রলাল দাস। ইনি ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে দিনাজপুর জেলা স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করিয়া বাঁকুড়া মিশনারী কলেজ হইতে আই এস. সি ও স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ হইতে বি এস. সি পাশ করেন। এম এস সি পড়িবার সময় 'শনিবারের চিঠি'র সহিত যুক্ত হন এবং পরে উহা ইঁহার সম্পাদকতায় প্রকাশিত হয়। কিছুকাল ইনি 'বঙ্গশ্রী' ও 'অলকা' পত্রিকার সম্পাদকতা করিবার পর 'প্রবাসী' পত্রিকার সহিত সংযুক্ত হন। ইনি বহু দিন পর্য্যন্ত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ছিলেন। ইনি একজন প্রখ্যাত সাহিত্যিক, কবি ও সমালোচক ছিলেন। ইঁহার রচিত পুস্তকসমূহ- 'অজয়', 'পথ চলতে ঘাসের ফুল', 'মনোদর্পণ', 'কেড্‌স ও স্যাণ্ডেল', 'পঁচিশে বৈশাখ', 'রাজমোহনের স্ত্রী', 'কলিকাল', 'বাংলার কবিগান', 'মৃত্যুদূত', 'ভাব ও ছন্দ', 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস', 'রাজহংস', 'মানস সরোবর'।

শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তর্গত বিন্নাফৈর গ্রামে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ৯ই আশ্বিন মাতুলালয়ে জন্ম। পৈতৃক নিবাস ঢাকা জেলার মাণিকগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত বুরুনি গ্রামে। পিতা—মুকুন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। মাণিকগঞ্জের সন্তোষ-জাহ্নবী হাই স্কুল হইতে এন্‌ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করিবার পর কলিকাতার মেট্রোপলিটান কলেজ হইতে এফ এ পাশ করেন। পরে সিটি কলেজে বি এ পর্য্যন্ত শিক্ষালাভ করেন। ইহার পর কিছুকাল সিটি কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষকতা করিবার পর কৃষ্ণকুমার মিত্রের 'সঞ্জীবনী' পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর 'হেরাল্ড' পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হইয়া তিন বৎসর উক্ত কার্য্য করেন। পরে উহা ত্যাগ করিয়া ইনি বিভিন্ন স্থানে নানা কার্য্য করেন। 'ষ্টেটসম্যান', 'বেঙ্গলী', 'নব্যভারত', 'জন্মভূমি' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রবন্ধ ও কবিতা লিখিয়া ইনি প্রভূত খ্যাতি লাভ করেন। ইনি বহু স্বদেশী সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। বর্ত্তমানে ইনি কলিকাতায় বাস করিতেছেন। ইঁহাদ্বারা কোন পুস্তক রচিত হয় নাই।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ১লা জুন জন্ম ও ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ৯ই জানুয়ারী মৃত্যু। ইনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যম পুত্র। ছাত্রাবস্থা হইতেই ইনি মাতৃভাষায় অনুরাগী ছিলেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হন। পরে ইনি ইংলণ্ড গমন করিয়া সিভিলিয়ান হন এবং ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে স্বদেশে

প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ইনি ভারতবাসীদের মধ্যে প্রথম সিভিলিয়ান। বহু দিন বোম্বাই এবং নানাস্থানে উচ্চপদে রাজকার্য্য করিবার পর অবসর গ্রহণ করিয়া বাংলায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ইনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক সাহিত্য সম্মেলনের ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। 'স্ত্রী-স্বাধীনতা', 'বোম্বাই চিত্র', 'সুশীলা-বীরসিংহ' নাটক, 'বৌদ্ধধর্ম্ম', 'নবরত্নমালা', 'আমার বাল্যকথা', 'আমার বোম্বাই প্রবাস' ইত্যাদি পুস্তক ইঁহার রচিত।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত—২৪ পরগণা জেলার নিমতা গ্রামে মাতুলালয়ে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী শনিবার জন্ম ও ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জুন শনিবার মৃত্যু। পৈতৃক নিবাস বর্দ্ধমান জেলার চুপী গ্রামে। পিতা—রজনীনাথ দত্ত। পিতা পরে দর্জ্জিপাড়াস্থ মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীটে (কলিকাতা) আসিয়া বাস করিতে থাকেন। ইনি বি এ পর্য্যন্ত পড়িয়াও কোনদিন চাকরী বা ব্যবসা করেন নাই। সাহিত্যচর্চ্চাই ইঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল। ইনি বাংলা পদ্যে অনেক নূতন ছন্দের প্রবর্ত্তন করিয়া 'ছন্দের যাদুকর' আখ্যা লাভ করেন। ১৮ বৎসর বয়সে ইঁহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সবিতা' প্রকাশিত হয়। ইনি 'জন্মদুঃখী' অনূদিত উপন্যাস. 'চীনের ধূপ' নিবন্ধ, 'রঙ্গমল্লী' অনূদিত নাটক ও 'ধূপের ধোঁয়ায়' নাটিকা ভিন্ন আরও ১৫ খানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। তাহাদের মধ্যে 'তীর্থসলিল', 'কুহু ও কেকা', 'বেণু ও বীণা', 'অভ্র-আবীর', 'হোমশিখা' 'তীর্থরেণু', 'মণিমঞ্জুষা' প্রভৃতি বিশেষ বিখ্যাত। 'ডঙ্কানিশান' নামে ইঁহার একখানি অসমাপ্ত উপন্যাস আছে। 'কাব্য-সঞ্চয়ন' গ্রন্থে ইঁহার সকল প্রকার কবিতা সঙ্কলিত হইয়াছে।

শ্রীসন্তোষকুমার বসু—নদীয়া জেলার অন্তর্গত রাণাঘাটে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারী জন্ম। ইঁহার আদিনিবাস বর্দ্ধমান জেলায়। পিতা—রাজচন্দ্র বসু। ইনি বর্ত্তমানে কলিকাতায় বাস করিতেছেন। ইনি রাণাঘাট হাই ইংলিশ স্কুল হইতে ম্যাট্রিক, সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ হইতে আই. এ, রিপণ কলেজ হইতে বি. এ, প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে ইংরেজীতে এম. এ ও ইউনিভার্সিটি ল' কলেজ হইতে বি. এল পাশ করিবার পর ইনি ১৯১২-১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নাগপুরের হিস্‌লপ কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপনা করেন। তাহার পর উহা পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতা হাইকোর্টের এডভোকেট হন। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার মেয়র, ১৯৪১-৪৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অবিভক্ত বঙ্গদেশের স্বায়ত্তশাসন মন্ত্রী, ১৯৪৮-৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পূর্ব্ব পাকিস্তানে ভারতরাষ্ট্রের

প্রথম ডেপুটী হাই কমিশনার ছিলেন। বর্ত্তমানে ইনি সুপ্রীম কোর্টের সিনিয়র এডভোকেট এবং পার্লামেণ্টের সদস্য। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ও সংবাদপত্রে ইঁহার কবিতা, প্রবন্ধ প্রভৃতি প্রকাশিত হইয়াছে।

সরলা দেবী—১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে জন্ম ও ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু। পিতা—জানকীনাথ ঘোষাল, মাতা স্বর্ণকুমারী দেবী। লাহোরের অধিবাসী রামভুজ দত্ত চৌধুরীর সহিত ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ইঁহার বিবাহ হয়। ১৩ বৎসর বয়সে ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এনট্রান্স এবং ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ১৭ বৎসর বয়সে ইনি ইংরেজীতে অনার্স সহ বি. এ পাশ করেন। অল্প বয়স হইতেই সাহিত্যে ও সঙ্গীতে ইঁহার দক্ষতা জন্মে। 'মাতৃভাণ্ডার' নামে একটি দোকান স্থাপন করিয়া ইনি যুবকদিগকে দেশের কাজের জন্য সঙ্ঘবদ্ধ করেন এবং 'বীরাষ্টমীব্রত' নামে একটি যুব-আন্দোলন পরিচালনা করিতে থাকেন। মহাকবি কালিদাসের নাটকাবলীর সমালোচনা করায় ইঁহার সুখ্যাতি হয়। ইনি কিছুকাল 'ভারতী' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। বহু দেশাত্মবোধক সঙ্গীত রচনা করায় ইঁহার খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। শেষ-জীবনে ইনি বয়স্ক মহিলাদের শিক্ষার জন্য 'ভারত স্ত্রী-মহামণ্ডল' পরিচালনা এবং 'ভারত স্ত্রী-শিল্পসদন' স্থাপন করেন। ইনি একজন বিশিষ্ট দেশকর্ম্মী ছিলেন। ১২ বৎসর বয়সের সময় 'ভারতী' পত্রিকায় ইঁহার প্রথম রচনা প্রকাশিত হয়। 'শতগান' নামক একখানি স্বরলিপির পুস্তকও ইনি প্রণয়ন করেন।

সরোজিনী দেবী—বরিশাল জেলার অন্তর্গত উজিবপুর গ্রামে ১২৮৮ বঙ্গাব্দে জন্ম ও ১৩৬৭ বঙ্গাব্দের ৫ই বৈশাখ কাশীধামে মৃত্যু। পিতা—ষষ্ঠীচরণ মুখোপাধ্যায়। ইনি বাল্যকালে ইঁহার মধ্যম ভ্রাতা সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়ের নিকট সকল প্রকার উৎসাহ ও উদ্দীপনা লাভ করেন। ইনি বাল্যকালে কোন বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন নাই। কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্বামী প্রজ্ঞানন্দের নিকট ইনি বাংলা, সংস্কৃত ও ইংরেজী অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ জ্ঞান অর্জ্জন করেন। ইনি বালবিধবা ছিলেন। ইনি ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং তখন ইঁহার নাম হয় 'ত্রিপুরাতীর্থ'; কিন্তু ইনি 'মাতাজী' নামেই বিখ্যাত ছিলেন। ইঁহার রচিত বহু স্বদেশাত্মক সঙ্গীত আছে। মুকুন্দ দাস প্রথম জীবনে ইঁহার মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের জাতীয় আন্দোলনে ইনি বিশেষভাবে অংশ গ্রহণ করেন। ইনি কোন পুস্তক রচনা করেন নাই।

সুখরঞ্জন রায়—ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ পরগণায় ১৮৮৯

খৃষ্টাব্দে জন্ম ও ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম. এ পাশ করিয়া নেত্রকোণা দত্ত হাই স্কুলের রেক্টর নিযুক্ত হন। পরে উহা পরিত্যাগ করিয়া ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন। ১৩২০ বঙ্গাব্দে ইনি 'কবি দেবেন্দ্রনাথের কাব্য' নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া সমালোচক হিসাবে খ্যাতি অর্জ্জন করেন। ইহার পূর্ব্বে ইনি 'প্রবাসী', 'নব্যভারত', 'বিচিত্রা' ও 'সাহিত্য' প্রভৃতি পত্রিকায় নিয়মিত ভাবে লিখিতেন। ইঁহার রচিত কাব্যগ্রন্থের নাম—'শুক্লা'। অপর একখানি পুস্তকের নাম—'আকাশ-প্রদীপ'।

সুন্দরীমোহন দাস—শ্রীহট্ট জেলার পৈল গ্রামে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে জন্ম এবং ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় মৃত্যু। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ডাক্তারী পরীক্ষায় পাশ করিবার পর ইনি কিছুকাল কলিকাতা কর্পোরেশনে কাজ করেন। পরে আর. জি. কর মেডিকেল কলেজে ও নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজে অধ্যাপনা করেন। ইনি একাদিক্রমে ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষতার কাজ করেন। ইনি বহু দিন পর্য্যন্ত রাজনৈতিক আন্দোলনের সহিত যুক্ত ছিলেন। বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত ইনি নিজেকে সর্ব্বদা যুক্ত রাখিতেন। ইঁহার রচিত গ্রন্থের নাম—'বৃদ্ধধাত্রীর রোজ-নামচা।'

সুনির্ম্মল বসু—হাজারিবাগ জেলার অন্তর্গত গিরিডিতে ১৩০৯ বঙ্গাব্দের ৪ঠা শ্রাবণ জন্ম ও ১৩৬২ বঙ্গাব্দের ১৩ই ফাল্গুন ঢাকুরিয়ায় মৃত্যু। পৈতৃক নিবাস ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত মালখানগর গ্রামে। পিতার নাম—পশুপতি বসু। ইনি বিখ্যাত বিপ্লবী ও সাহিত্যিক মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতার দৌহিত্র। ইনি গিরিডি হাই স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতার সেণ্ট পলস্ কলেজে অধ্যয়ন করিবার সময় গান্ধীজী পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। পরে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত ওরিয়েণ্টাল সোসাইটি অব ইণ্ডিয়ান আর্টস্-এ ইনি চিত্র-বিদ্যা শিক্ষা করেন। গিরিডির প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং সাঁওতালদের মাদল ও বাঁশী ইঁহাকে কাব্য রচনায় অনুপ্রাণিত করে। বাল্যকাল হইতেই ইনি শিশুদের কবিতা রচনায় নিপুণতা লাভ করেন। শিশুদের প্রায় পত্র-পত্রিকাতেই ইঁহার কবিতা প্রভৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। ইনি ছোটদের জন্য গল্প, উপন্যাস, নাটক-নাটিকা, ভ্রমণকাহিনী, কবিতা ও ছড়া প্রভৃতি বিষয়ে প্রায় একশত পুস্তক রচনা করিয়াছেন। শিশুদের জন্য 'ছোটদের চয়নিকা'

ও 'গল্প সঞ্চয়ন' ইঁহা দ্বারা সম্পাদিত হয়। ইনি শিশু-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ শিল্পিরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। 'ছানা বড়া', 'বেড়ে মজা', 'হৈ চৈ', 'হুলুস্থুল', 'কথা শেখা', 'মরণের ডাক', 'ছন্দের টুং টাং', 'যত হাসি তত কান্না', 'আমের আঁটি ভেঁপু' প্রভৃতি ইঁহার রচিত গ্রন্থ।

সুরমাসুন্দরী ঘোষ—ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত মালখানগর গ্রামে ১২৮১ বঙ্গাব্দের ৪ঠা ভাদ্র জন্ম। পিতা—উমেশচন্দ্র বসু। স্বগ্রামে নিজেদের বাড়ীতে একটী বালিকা বিদ্যালয় হইতে উচ্চ প্রাইমারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি বৃত্তি পান। তখন ইঁহার বয়স ছিল তেরো বৎসর। ইহার পর ইনি কিছুদিন ঢাকার ইডেন বালিকা বিদ্যালয়েও পড়িয়াছিলেন। ১২৯৩ বঙ্গাব্দের ১৯শে অগ্রহায়ণ স্বগ্রামবাসী নিশিকান্ত ঘোষ (রায় বাহাদুর) মহাশয়ের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। ইনি কলিকাতাস্থ 'পূর্ব্ববঙ্গ স্ত্রীশিক্ষা কমিটি'র বাংলা সাহিত্যের এক বিশেষ পরীক্ষা প্রদান করেন ও সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। ইঁহার কবিতাসমূহ 'প্রদীপ', 'উৎসাহ', 'প্রভাত' প্রভৃতি মাসিক পত্রে প্রকাশিত হয়। 'সঙ্গিনী' ও 'রঙ্গিণী' ইঁহার রচিত কাব্যগ্রন্থ।

স্বর্ণকুমারী দেবী—জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে জন্ম এবং ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুলাই মৃত্যু। পিতা—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১১ বৎসর বয়সে সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষালের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। পিতৃগৃহে কিছু বাংলা ও সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া ইনি ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য বোম্বাইতে ভ্রাতা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট গমন করেন। ইঁহার সম্পাদনায় 'ভারতী' পত্রিকা (বঙ্গাব্দ ১২৯১-১৩০১) প্রকাশিত হয়। ইনি বহু কবিতা এবং কয়েকখানি নাটক ও উপন্যাস রচনা করেন। ইনি বাঙ্গালী মহিলাদের মধ্যে প্রথম সাহিত্যিক। ইনি 'সখী সমিতি' নামে একটি মহিলা সমিতি ও 'মহিলা শিল্পমেলা' নামে মহিলাদের একটি শিল্পচর্চ্চার কেন্দ্র স্থাপন করেন। ১৩১৬ বঙ্গাব্দে ভবানীপুরে যে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, ইনি তাহার সভানেত্রী নির্ব্বাচিত হন। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'জগত্তারিণী' সুবর্ণপদক লাভ করেন। ইঁহার রচিত প্রথম উপন্যাস 'দীপনির্ব্বাণ।' ইঁহার রচিত পুস্তকের নাম—'স্নেহলতা', 'ছিন্নমুকুল', 'মিবাররাজ', 'কাহাকে?', 'বিচিত্রা', 'স্বপ্নবাণী', 'মিলনরাত্রি', 'বিদ্রোহ', 'ফুলের মালা' প্রভৃতি।

হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ (ভট্টাচার্য্য)—পূর্ব্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়া পরগণার অন্তর্গত উনশিয়া গ্রামে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ২৪শে অক্টোবর রবিবার জন্ম এবং ১৯৬১ খৃষ্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর সোমবার কলিকাতায় মৃত্যু। পিতা—গঙ্গাধর বিদ্যালঙ্কার (ভট্টাচার্য্য), মাতা বিধুমুখী দেবী। সম্রাট আকবরের সমসাময়িক পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমন্মধুসূদন-সরস্বতীর ইনি অধস্তন দ্বাদশ পুরুষ। ইনি প্রথমে স্বগ্রামবাসী গোবিন্দ বাচস্পতি, পরে পিতামহ কাশীচন্দ্র বাচস্পতি, পিতা গঙ্গাধর বিদ্যালঙ্কার, ফরিদপুর জেলার পশ্চিমপাড়ানিবাসী মহামহোপাধ্যায় রামনাথ সিদ্ধান্ত-পঞ্চানন, ফরিদপুর জেলার কবিরাজপুরনিবাসী আনন্দচন্দ্র বিদ্যারত্ন ও কলিকাতাস্থ পটলডাঙ্গানিবাসী জীবানন্দ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট অধ্যয়ন করেন। ১৪ বৎসর বয়সে 'কংসবধ' নামে একখানি সংস্কৃত নাটক ইঁহা দ্বারা রচিত হয়। ইনি একাদিক্রমে স্বীয় গ্রামে, খুলনা জেলার নকীপুরে এবং কলিকাতায় ৫৮ বৎসর অধ্যাপনা করেন। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে ইনি 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে ইনি মূল, স্বরচিত টীকা ও বঙ্গানুবাদ এবং পাঠান্তর সহ মহাভারতের এক বিরাট প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশ আরম্ভ করেন এবং ১৩৬৬ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে উহা ছাপা শেষ হয়। এই মহাভারত সম্পাদনার জন্য ইনি প্রচুর খ্যাতি ও সম্মান লাভ করেন এবং উক্ত কার্য্যের জন্য 'রবীন্দ্র পুরস্কার'ও প্রাপ্ত হন। ইনি ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে 'পদ্মভূষণ' উপাধি এবং ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় সরকার হইতে সংস্কৃতের জন্য বিশেষ সম্মান ও বৃত্তি এবং কলিকাতা কর্পোরেশন হইতে নাগরিক সম্বর্দ্ধনায় 'বিজয়শ্রী' উপাধি প্রাপ্ত হন। ইঁহার রচিত ও মুদ্রিত পুস্তকসমূহ—'রুক্মিণীহরণম্', 'স্মৃতিচিন্তামণি', 'বিরাজসরোজিনী', 'বৈদিকবাদমীমাংসা', 'মিবারপ্রতাপম্', 'বঙ্গীয়প্রতাপম্', 'শিবাজীচরিতম্', 'কাব্যকৌমুদী', 'সরলা', 'বিদ্যাবিত্তবিবাদম্', 'সমাজ-সংস্কার', 'বিধবার অনুকল্প', 'যুধিষ্ঠিরের সময়'। এতদ্ভিন্ন 'কাদম্বরী', 'মেঘদূতম্', 'সাহিত্যদর্পণঃ', 'নৈষধচরিতম্', 'উত্তররামচরিতম্' প্রভৃতি ১৬ খানি কাব্যগ্রন্থের টীকা ও বঙ্গানুবাদ রচনা করেন।

হরিদাস হালদার—কলিকাতার কালীঘাটের ১২ নং কালী লেনে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে জন্ম এবং ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে ঐ বাড়ীতেই মৃত্যু। পিতা—রামচন্দ্র হালদার। কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হইতে ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি কালীঘাট রোডেই চিকিৎসা-

ব্যবসায় আরম্ভ করেন। স্যর কেদারনাথ দাস, ডাঃ কার্ত্তিকচন্দ্র বসু ও ডাঃ গিরিশচন্দ্র ঘোষ ইঁহার সতীর্থ ছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ প্রতিষ্ঠিত 'নারায়ণ' পত্রিকা কিছুদিন ইঁহার সম্পাদকতায় প্রকাশিত হয়। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতির সহিত ইঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। ইনি স্বদেশী আন্দোলনের সহিত সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন এবং বহু স্বদেশী সঙ্গীত রচনা করেন। 'কর্ম্মের পথে', 'গোবর গণেশের গবেষণা', 'বক্কেশ্বরের বেয়াকুবি', 'মদন-পিয়াদা' ও 'ন্যাশনাল লাইফ অব নন-কোঅপারেশন' ইঁহার রচিত গ্রন্থ।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—হুগলী জেলার গুলটা গ্রামে ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের ১৭ই এপ্রিল জন্ম ও ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ২৪শে মে মৃত্যু। পিতা—কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথমে হিন্দু কলেজে ও পর প্রেসিডেন্সী কলেজে ইনি অধ্যয়ন করেন। ইনি ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে বি. এ. পাশ করিয়া কিছুদিন শিক্ষকতা করিবার পর বি. এল্ পাশ করিযা এক বৎসর মুন্সেফি করেন। পরে উহা ত্যাগ করিয়া ইনি কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন। ইহাতে ইঁহার প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন হয়। শেষ জীবনে অন্ধ হওয়ায় ইঁহার অর্থকষ্ট উপস্থিত হয়। এই সময় ইনি মাসিক ত্রিশ টাকা হিসাবে সরকারী বৃত্তি পান। ইঁহার রচিত 'বৃত্রসংহার' মহাকাব্য বাংলা সাহিত্যের মহাকাব্যগুলির অন্যতম। ইনি বহু জাতীয় সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। ইনি 'মেঘনাদবধ' মহাকাব্যের টীকা ও বিস্তৃত সমালোচনা করেন। ইঁহার রচিত কাব্যগ্রন্থসমূহ—'আশাকানন', 'ছাযাময়ী', 'দশমহাবিদ্যা', 'কবিতাবলী', 'চিন্তাতরঙ্গিণী', 'ভারতবিলাপ', 'বীরবাহু কাব্য'।

হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—বরিশাল জেলার রঙ্গশ্রী গ্রামে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে জন্ম ও ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে হেমাইতপুর আশ্রমে মৃত্যু। পিতা—দিনেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ইনি বরিশাল ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে এন্‌ট্রান্স শ্রেণী পর্য্যন্ত লেখাপড়া করেন। পরে নিজের অধ্যবসায়ে বাংলা, সংস্কৃত ও ইংরেজীতে প্রচুর জ্ঞান অর্জ্জন করেন। বাল্যকাল হইতেই ইঁহার কবিত্ব শক্তি স্ফুরিত হয়। নৃত্য, গীত, বাদ্য, অভিনয় ও কথকতায় ইঁহার বিশেষ দক্ষতা ছিল। অশ্বিনীকুমার দত্তের ইনি প্রিয়পাত্র ছিলেন। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়' ইঁহার বহু কবিতা ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ইনি বহু স্বদেশাত্মক কবিতা রচনা করিয়াছেন। 'কণা', 'জোয়ার' ও 'পূজা' কাব্যগ্রন্থ এবং 'উৎসব' ও 'আদর্শ' বা 'দাদাঠাকুর' নাটক ইঁহার রচিত।

হেমেন্দ্রকুমার রায়—কলিকাতার পাথুরিয়াঘাটা বাই লেনে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে জন্ম ও ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল, বৃহস্পতিবার মৃত্যু। পৈতৃক নিবাস নদীয়া জেলার কাঁচরাপাড়া গ্রামে। পিতা—রাধিকানাথ রায়। ইনি কোন বিদ্যালয়ে শিক্ষাগ্রহণ না করিয়া পিতার নিকট শিক্ষালাভ করেন এবং সেক্সপীয়র, বায়রন, কীটস্ প্রভৃতি ইংরেজকবিদিগের পুস্তক তাঁহারই নিকট অধ্যয়ন করেন। ১৪ বৎসর বয়স হইতে 'বসুধা', 'জন্মভূমি', 'নব্যভারত', 'অর্চ্চনা' প্রভৃতি পত্রিকায় ইঁহার গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ প্রভৃতি প্রকাশিত হয়। ১৬ বৎসর বয়স হইতে 'ভারতী' পত্রিকায় ইঁহার রচনা প্রকাশিত হইতে থাকে। 'নাচঘর' নামক নাট্যকলা-সম্বন্ধীয় সাপ্তাহিক পত্রিকা ইঁহার দ্বারা সম্পাদিত হয়। শ্রেষ্ঠ শিশু-সাহিত্যিক হিসাবে ইনি 'মৌচাক' পুরস্কার লাভ করেন। সঙ্গীতবিদ্যা এবং চিত্রাঙ্কনেও ইঁহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। সাহিত্য, নাটক, সঙ্গীত ও ললিতকলা বিষয়ে বহু প্রবন্ধ লিখিয়া ইনি বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেন। কবিতা, গল্প, উপন্যাস ও শিশু-সাহিত্য বিষয়ে ইনি প্রায় ১৫০ খানি পুস্তক ও সহস্রাধিক গান রচনা করিয়াছেন। ইঁহার 'শিউলি' ও 'কুসুম' নামে ছোট গল্প দুইটি জার্ম্মান ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। বাংলা সাহিত্যে শিশুদের জন্য এ্যাডভেঞ্চার-কাহিনী সম্ভবতঃ ইনিই সর্ব্বপ্রথম রচনা করেন। বাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলনে ইনি রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আসেন। নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্করকে ইনি সর্ব্বপ্রথম জনসমক্ষে পরিচিত করান। ইঁহার শেষ রচনা 'বাংলা রঙ্গালয়ের নবরূপায়ণ'। 'কালবৈশাখী', 'পায়ের ধূলো', 'মণিমালিনীর গলি', 'জলের আলপনা', 'যখের ধন', 'কিং কং', 'দেড়শো খোকার কাণ্ড' প্রভৃতি ইঁহার রচিত বিখ্যাত পুস্তক।

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ—যশোহর জেলার কপোতাক্ষ নদীর তীরবর্ত্তী চৌগাছা গ্রামে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ২৪শে সেপ্টেম্বর রবিবার জন্ম ও ১৯৬২ খৃষ্টাব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতায় মৃত্যু। পিতা—গিরীন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। বাল্যে ইঁহার গ্রাম্য পাঠশালায় এবং মাতার নিকট বাংলা ও ইংরেজী শিক্ষা আরম্ভ হয়। ইহার পর হেয়ার স্কুল হইতে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে ইংরেজীতে অনার্স সহ বি. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাহার পর ইঁহার সাংবাদিক জীবন আরম্ভ হয়। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ইঁহার সাংবাদিক-জীবনে গুরু ছিলেন। জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ইঁহার বহু পদ্য, গল্প ও প্রবন্ধ প্রকাশিত

হইয়াছে। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে ভাবতীয় সংবাদপত্রসে[illegible]তিনিধি হিসাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধেব যথার্থ বিববণ অবগত হইবাব জন্য ইনি ইংলণ্ড গমন করেন। ইনি বহু দিন পর্য্যন্ত 'দৈনিক বসুমতী'ব সম্পাদক ছিলেন। ১৩০১ বঙ্গাব্দে 'উচ্ছ্বাস' নামক ই঳হার গীতিকবিতা পুস্তক প্রথম প্রকাশিত হয। 'দগ্ধহৃদয', 'নাগপাশ', 'তুষানল', 'বিপত্নীক', 'অধঃপতন', 'কংগ্রেসেব ইতিহাস' ও 'The Famine of 1770' প্রভৃতি ইঁহাব বচিত পুস্তক।

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ—২৪ পবগণা জেলাব খডদহ গ্রামে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দেব ১২ই এপ্রিল জন্ম ও ১৯২৭ খৃষ্টাব্দেব ৪ঠা জুলাই মৃত্যু। পিতা—গুরুচবণ শিবোমণি (ভট্টাচার্য্য)। এম এ পাশ কবিবাব পব ইনি জেনাবেল অ্যাসেমব্লিজ কলেজে (স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ) বিজ্ঞানেব অধ্যাপক নিযুক্ত হন। অধ্যাপনাকালে 'ফুলশয্যা' নামে ইঁহাব প্রথম নাটক অভিনীত হয। পবে উক্ত চাকবী ত্যাগ কবিয়া ইনি নাটক বচনা ও অভিনয়ে মনোনিবেশ কবেন। পবে ম্যাডান থিয়েটাবে ৫০০ টাকা বেতনে কার্য্যে যোগদান কবেন। ইঁহাব সম্পাদকতায় 'অলৌকিক বহস্য' নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশিত হয। শেষ-জীবনে ইঁনি থিওসফি প্রচাব ও উপন্যাস বচনায় মনোনিবেশ কবেন। 'গুহামুখে', 'নিবেদিতা' ও 'পতিতাব সিদ্ধি' নামে উপন্যাস এবং 'আলিবাবা', 'সাবিত্রী', 'পদ্মিনী', 'নন্দকুমার', 'চাঁদবিবি' ও 'বঙ্গেশ্বর প্রতাপাদিত্য' প্রভৃতি বিখ্যাত নাটক ইনি বচনা কবেন।